# বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

( সমালোচনা )

শ্রীশিবানন্দ

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়
৪নং রায় মথুরানাথ চৌধুরী ষ্ট্রীট,
বরাহনগর, কলিকাতা-৩৬

প্রথম প্রকাশ
১৩৫৭
দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩৭২

৩০.৩.৭০

মুদ্রাকর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ নন্দী কর্ত্তৃক
টোয়েন প্রিণ্ট এণ্ড সাপ্লাই এজেন্সী,
২০/১ই, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
হইতে মুদ্রিত।

বাঁধাই—নন্দী ব্রাদার্স
১০, ডাঃ কার্তিক বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

# সূচীপত্র

# প্রথম নিবেদন

এই বইখানি অনেক দিন আগে লেখা হইয়াছিল, কিন্তু লেখকের অবকাশ অভাবে ছাপান হয় নাই। লেখক তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। তিনি বলেন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসমালার ঐক্যসূত্র ও বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশই তাঁহার উদ্দেশ্য—আত্ম-প্রচার নহে। ইতি

১৩৫৭ প্রকাশক।

# দ্বিতীয় নিবেদন

১৩৫৭ সনে এই গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। বইখানি সমাদৃত হওয়া সত্ত্বেও লেখকের সময় অভাবে দ্বিতীয় সংস্করণ এতদিন প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের শতবর্ষ সম্পূর্ত্তির দিনে ভগবৎ কৃপায় ইহা পুনর্মু্দ্রিত হইল। ইতি

৩০শে শ্রাবণ প্রকাশক।
১৩৭২

# ভূমিকা

ইংরাজী ১৮৬৩-৬৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী রচনা করেন এবং ১৮৯৩ সালে পরিবর্দ্ধিত রাজসিংহ প্রকাশ করিয়া ১৮৯৪ সালে স্বর্গারোহণ করেন। অতএব বঙ্কিমসাহিত্য বলিলে বঙ্গবাণীর কণ্ঠশোভা যে অম্লান শতদল-মালা বুঝায় তাহা এই একত্রিশ বৎসরের রচনা। বৎসর গণনায় একত্রিশ বৎসর বটে, কিন্তু কাহার জীবনের? কোন অবসর-বহুল ধনীর নহে, স্বল্পাবসর সরকারী কর্ম্মচারীর—দুর্লভ ছুটির দিনে ব্যতীত যাঁহাকে প্রত্যহ দিনের অধিকাংশ সময় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। অতএব অসময়ে কঠিন পরিশ্রম করিয়া, ক্লান্তদেহে রাত্রি জাগিয়া[১], যে বাণীপূজার মালা রচনা করিতে হইয়াছিল, তাহা যে হৃদয়ের রক্তচন্দনে চর্চ্চিত ছিল, দীর্ঘায়ুঃ পিতার পুত্রের কিঞ্চিদধিক পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে অকালমৃত্যুই তাহার প্রমাণ।

বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হইলেও উপন্যাসই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র কীর্ত্তি নহে। বঙ্কিম যদি কোন উপন্যাস না লিখিয়া তাঁহার অন্যান্য রচনা রাখিয়া যাইতেন তাহা হইলেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠতম

---

১ শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বঙ্কিম-কাহিনী' ২৪ পৃঃ।

সাহিত্যিক বলিয়া গণ্য হইতেন। তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব, কমলাকান্তের দপ্তর, লোক-রহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ, তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিত; শুধু তত্ত্বদর্শী লেখক বলিয়া নহে, বঙ্গভাষায় গদ্য-রচনার অভিনবরীতির প্রবর্ত্তক, সাহিত্যশিল্পী এবং রসস্রষ্টা হিসাবেও বটে। এ গ্রন্থে বঙ্কিম-সাহিত্যের সে অংশের কোন আলোচনাই নাই।

ইহাতে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির আলোচনা। সে আলোচনাও পুঙ্খানুপুঙ্খ এমন কি বিস্তৃত আলোচনাও নহে, প্রত্যেক উপন্যাসখানির মুখ্য কথার বা চরিত্রগুলির আলোচনা মাত্র। রচনার কালক্রমানুসারে সে আলোচনা করায় উপন্যাসগুলি যে ব্যক্তিত্বের ধারাবাহিক বিকাশ তাহারও উদ্‌গতিসূত্রের সন্ধান যেন মিলিয়াছে মনে হয়। যথাস্থানে পাঠক তাহার আভাস পাইবেন।

এখানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে রচনার ক্রমানুসারে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির বিভাগ যদি করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে তাহারা তিন স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরের উপন্যাস তিনখানির (অর্থাৎ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী যাহা তাঁহার সাহিত্য-জীবনের পূর্ব্বাহ্লে পঁচিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে লিখিত তাহাদের) রচনায় রূপসৃষ্টি ব্যতীত তরুণ লেখকের অপর কোন উদ্দেশ্য ছিল মনে হয় না। নবীন সাহিত্যশিল্পী নবোৎসারিত প্রতিভার প্রথম প্রবল উচ্ছ্বাসে তাহাদের দ্বারা পাঠকের চিত্তজয়ই করিতে

চাহিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি যেমন অপূর্ব্ব সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন তেমনই আত্মশক্তির উপর দৃঢ়তর বিশ্বাসও অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শোনা গিয়াছিল "তিনি ভগীরথের মত সাধনা করিয়া" টেম্‌সের বা টুইডের তরঙ্গধারা নহে পরন্তু "ভাবমন্দাকিনী অবতারণ করিয়াছিলেন"। তাঁহার তিরোধানের বার বৎসর পরেও শোনা গিয়াছিল "তিনি সাহিত্য উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে আপন ঘরে ফিরিতে বলিয়াছেন এবং সে বিষয়ে তিনি যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছেন অন্য কেহই সেরূপ হন নাই।"[১] অধুনা কিন্তু এমন বিপরীত কথা শোনা যায় যে বিদেশী বস্তু দেশী রঙ মাখাইয়া চালাইবার চেষ্টায় বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনার প্রথম যুগ অতিবাহিত হয়। স্পষ্টই বলা হইয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম উপন্যাসগুলি পাশ্চাত্য রোম্যান্‌সের ছাঁচে ঢালা "বিদেশ থেকে আমদানী" করা বস্তু। রোম্যান্‌স্ হইলেই যদি "বিদেশ থেকে আমদানী" বলা চলে তাহা হইলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যাবতীয় ছোট গল্প মোপাসাঁর অনুকরণ বলা চলিবে না কেন? ভিক্টর হুগোর উপন্যাসগুলি ত কাহারও কাহারও মতে স্কটের উপন্যাসের ("direct descendants") ঠিক উত্তর পুরুষ। তাহা হইলে সেগুলিকেই বা ফরাসী না বলিয়া ইংল্যাণ্ড হইতে আমদানী বলা চলিবে না

১ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী: 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১৩)।

কেন? প্রকৃত পক্ষে কোনটি বিদেশী কোনটি স্বদেশী কেবলমাত্র শ্রেণীগত নামের দ্বারা বা ছাঁচের দ্বারা তাহার বিচার-নিষ্পত্তি হইতে পারে না। লেখকের মূল্যবোধ (sense of values) যে রূপাবলী গ্রহণ করিয়াছে তাহা দেশীয় আদর্শসম্মত ও সংস্কৃতি অনুযায়ী কি না, সৃষ্ট চরিত্রগুলি সংস্কারে ও চিন্তায়, ভাবে ও আদর্শে, দেশীয় কি না, তাহাদের কর্ম্মে ও আচরণে যে প্রকৃতি প্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা দেশীয় বা বৈদেশিক—এই সমস্ত বিচার করিয়া তবে দেশী বা বিদেশী সে তর্কের মীমাংসা হইতে পারে। সে সকল দিক দিয়া বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের অপর কোন উপন্যাস দূরের কথা, দুর্গেশ-নন্দিনীকেও বোধ হয় "বিদেশ থেকে আমদানী" বলা যায় না। তিলোত্তমার সশঙ্ক লজ্জা, প্রেমতন্ময়তা, অবিচল নিষ্ঠা ও বিরহবিলীনতা তাহার চরিত্রে যে বিশিষ্ট মাধুর্য্য সঞ্চার করিয়াছে তাহা একেবারেই ভারতীয়। কাপালিকের নির্ম্মম ও বিকৃত শাক্তাচারের পটভূমিকায় কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে কোমল করুণা ও অসংসারী ভবানী-ভক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ "বিদেশ থেকে আমদানী" করার বস্তুই নহে। পাশ্চাত্ত্য সমালোচকও স্বীকার করেন কপালকুণ্ডলার ন্যায় উপন্যাস সেদিনও ইউরোপীয় সাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য ছিল।* তেমনই

* "The force that moves the whole with emotion, and gives to it its subtle spell, is the mystic form of Eastern thought. . . . . Outside "The Marriage de Loti", there is nothing comparable to the 'Kopala Kundala' in the history of Western fiction."—Frazer : Literary History of India (1897), p. 423.

মৃণালিনী বা মনোরমা যে প্রেমের মূর্ত্তি তাহা ভারতীয় নারীর আদর্শানুগত, ভারতেই সুলভ। অতঃপর বিস্তৃত আলোচনায় তাহা আরও সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইবে। প্রত্যুত বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্যই এই যে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি আমাদের 'স্বদেশ আত্মার' সর্ব্বোত্তম 'বাণীমূর্ত্তি'।

সে যাহা হউক, প্রথম তিনখানি উপন্যাস রচনাকালে গ্রন্থকার তাঁহার ব্যক্তিত্বের সম্যক সন্ধান পাইয়াছিলেন মনে হয় না। যে দিন হইতে আপন ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাইলেন সে দিন হইতে প্রেরণা হইল আত্মবশগা এবং আপন বাণী-বৈশিষ্ট্যও রচনাবলীতে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। স্বপ্রতিষ্ঠ শিল্পীর এই দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসগুলির সাধারণ লক্ষণ এই যে, নৈতিক মানুষের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব ও অন্তরের সমস্যা ইহাদের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। এই উপন্যাসগুলি লেখকের জীবন-মধ্যাহ্নে অর্থাৎ ত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসরের মধ্যে রচিত এবং যেমন আত্মশক্তির উপর প্রবল আস্থা সহকারে লিখিত তেমনই মানুষের পতনের ধারাপ্রদর্শন এবং আত্মজয়ের মহান সৌন্দর্য্য উদ্ভাসনই ইহাদের উদ্দেশ্য। বিষবৃক্ষে এই পর্য্যায়ের আরম্ভ, কৃষ্ণকান্তের উইলে ইহার শেষ। প্রথম সংস্করণের ইন্দিরা ও রাজসিংহ এই সময়ে লিখিত হইলেও উভয় গ্রন্থ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া গ্রন্থকার যখন পরে তাহাদের নবরূপ দান করিয়াছিলেন, এমন কি রাজসিংহের নূতন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন এই দুইখানি উপন্যাস দ্বিতীয়

পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। এ যুগের বড় উপন্যাসগুলি সাধারণতঃ 'গৃহসুখ-নিরত' বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখে ওতপ্রোত এবং একখানির ঘটনাধারা বাঙ্গলার ইতিহাসের নবাবী আমলের শেষ অধ্যায়ের সহিত শৃঙ্খলিত।

তৃতীয় স্তরের উপন্যাসগুলিতে আমরা দেখিতে পাই নৈতিক বঙ্কিম ভারতীয় সাধনায় আস্থাবান আধ্যাত্মিক বঙ্কিমে পরিণত হইয়াছেন এবং সাধন-সম্পদের সদ্‌ভাব ও অভাবের ঐশ্বর্য্য ও দৈন্য, মানুষের জীবনে কত সার্থকতার আনন্দ ও ব্যর্থতার বেদনা সৃষ্টি করে কাব্যচ্ছন্দে তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত। এই উপন্যাসগুলি তাঁহার জীবনের শেষ পনের বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ একচল্লিশ হইতে পঞ্চান্ন বৎসরের মধ্যে রচিত—যে সময় তাঁহার প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র ও ভগবদ্‌গীতা। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম ব্যতীত ইন্দিরা ও রাজসিংহের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণও এই সময়ে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম তিনখানিতে ( ১৮৮২—৮৭ ) ঋষি বঙ্কিমের মন্ত্র ও বাণী যেমন সুপ্রচারিত, তেমনই শেষ দুইখানি (১৮৯৩) অস্তাভিমুখী সাহিত্য-সূর্য্যের রক্তরাগে সমুজ্জ্বল—আর প্রায় সবগুলিই সংযম, মনোবল ও চরিত্রবলের ভিত্তিমূলে বৃহত্তর বা উচ্চতর জীবনের আনন্দ-সংবাদে সমৃদ্ধ। যাঁহারা বলেন কৃষ্ণকান্তের উইল ( ১৮৭৮ ) লেখার পরে শিল্পী ( artist ) বঙ্কিমের সন্ধান আর পাওয়া যায় না, মানুষের আধ্যাত্মিক প্রগতির মাধুর্য্য বা অধোগতির

বেদনা যাঁহারা সাহিত্য-কলার বহির্ভূত বস্তু মনে করিয়া আনন্দমঠ-প্রমুখ উপন্যাসত্রয়ীতে আনন্দের সামগ্রী খুঁজিয়া পান না, পক্ষান্তরে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের লেখনী জরাগ্রস্ত মনে করেন, তাঁহাদের উক্তির অসারতার প্রমাণ অন্ততঃ পূর্ণাবয়ব ইন্দিরা ও রাজসিংহ। বড় ইন্দিরার কৌতুকোজ্জ্বল সরসতা ও বিবর্দ্ধিত রাজসিংহের গতিবেগ ও রসবৈচিত্র্য কয়জন শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যশিল্পীর যৌবনসৃষ্টিতে এমন পরিস্ফুট ও প্রচুর ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অনুসন্ধানের যোগ্য বটে। প্রত্যুত আধ্যাত্মিক উপন্যাসত্রয়ীর লেখক বঙ্কিম আচার্য্যের ভূমিকা গ্রহণ করিলেও যেমন স্থবির শিল্পী বা হীনশক্তি রসস্রষ্টা নহেন তেমনই এই উপন্যাস তিনখানি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যমূলে লিখিত হইলেও রসাত্মক বাক্য-হিসাবে যে সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই এমন কথা বলা কঠিন। ব্যক্তিগত কারণে 'প্রচারক' বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবে যিনি যাহাই বলুন আমরা এই উপন্যাসত্রিতয়ের মহান উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হইয়াও রসাত্মক বাক্যহিসাবে তাহাদের সার্থকতার আলোচনা করিব।

বাস্তবিক বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবাদের প্রতি আধুনিক সমালোচনার যে কটাক্ষ তাহা নিতান্তই একদেশদর্শী। পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার প্রভাবে যে দৃষ্টিভঙ্গী মানুষকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে ভালবাসে বা অভ্যস্ত সম্যগ্‌দর্শী লেখকের সমগ্র মানবসত্ত্বার প্রতি শ্রদ্ধা তাহার রুচিকর হয় না। ভারতের চিরন্তন সিদ্ধান্ত মানুষের 'সত্যং

শিবং সুন্দরম্' ত্রিতয়ই উপাস্য, সে যখন 'সুন্দরম্' এর সাধনা করে তখন সে যদি 'সত্যং' ও 'শিবং'-এরও ধার ধারে তবেই কোন শাশ্বতসৃষ্টি করিতে পারে—ইহা অবশ্য আধুনিক সমালোচনার অস্বীকার্য্য। তাই যদি কোন শিল্পীর সৃজনকুশলতায় তাহার অভিন্নরূপ ফুটিয়া উঠে সে সৃষ্টির সমগ্র সৌন্দর্য্য আধুনিক সমালোচনার বিশ্লেষণ-নিপুণ একাক্ষী দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না। ফল, প্রতিচীর মন্ত্র শিষ্য যতই আবৃত্তি করুন "An ethical sympathy in an author is an unpardonable mannerism in style"*, পাশ্চাত্য সাহিত্যশিল্পীর বিশ্লেষণী বুদ্ধিপ্রসূত এই বাণী সম্যগ্‌দর্শী প্রাচী মানিতে পারে না। শিল্পকলার সিদ্ধান্তের সহিত নীতির সিদ্ধান্তের ঐক্য বা মিলন ঘটিলেই যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় এমন নববিধান স্বীকার করা দূরের কথা, সে 'কবি'র নিকট হইতে সম্যগ্‌দর্শনই দাবী করে এবং দাবী করে বলিয়াই সে পাশ্চাত্য শিল্পীর পরিচ্ছিন্ন-বুদ্ধিপ্রসূত রচনাসূত্রকে উপেক্ষা করিয়াও উদ্‌ভ্রান্ত রূপচর্চ্চার আত্মহননের যে বীভৎস রসচিত্র সেই সাহিত্যিকপ্রতিভা সৃষ্টি করিয়াছে তাহারও সমাদর করে। সে যাহা হউক রসরচনার বা অনুভবের বস্তুর আলোচনায় তর্ক বাড়াইয়া কোন লাভ নাই। আমরা ভিক্টর হুগো সম্বন্ধে ষ্টিভেন্‌সনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া যে লোকোত্তর প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয়

---

* Oscar Wilde প্রণীত 'Picture of Dorian Gray' পুস্তকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য

ও তৃতীয় স্তরের উপন্যাসগুলি সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে চাই :—

"Romance is a language in which many persons learn to speak with a certain appearance of fluency; but there are few who can ever bend it to any practical need, few who can ever be said to express themselves in it. Victor Hugo occupies a high place among those few. He has always a perfect command over his stories; and we see that they are constructed with a high regard to some ulterior purpose and that every situation is informed with moral significance and grandeur. Of no other can the same thing be said in the same degree. His romances are not to be confused with "the novel with a purpose" as familiar to the English reader: this is generally the model of incompetence; and we see the moral clumsily forced into every hole and corner of the story or thrown externally over it like a carpet over a railing. Now, the moral significance with Hugo is of the essence of the romance; it is the organising principle". [১]

"But still Hugo is too much of an artist to let himself be hampered by his dogmas; and the truth is that the artistic result seems * * * to have very little connection with the other or directly ethical result". [২]

১ R. L. Stevenson: Familiar Studies (Victor Hugo's Romances), p. 48.

২ *Ibid*, p. 34.

আমরা কেবল Victor Hugo স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র এবং 'moral' শব্দের সহিত spiritual শব্দটিও প্রয়োগ করিব।

আর বলিব, কাব্যকলার মুখ্য উদ্দেশ্য যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি সেকালের বঙ্কিম একালের কাহারও অপেক্ষা যে তাহা কম বুঝিতেন এমন নহে। দেখিতে পাই দীনবন্ধুর গ্রন্থসমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন "কাব্যকলার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। তাহা ছাড়িয়া সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়, কিন্তু নীলদর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবম্বিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।" আমাদেরও বক্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের অনেকগুলি উপন্যাস নীতি-প্রতিষ্ঠা বা প্রেমের জয়, নিষ্কামধর্ম্ম প্রচার, বা স্বদেশ সেবায় কামনা ও আসক্তি পরিহারের নীতি প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে লিখিত হইলেও গ্রন্থকারের "মোহময়ী সহানুভূতি" তাঁহার সকল সৃষ্টিকেই মাধুর্য্যময়ী করিয়া তুলিয়াছে।

আলোচনার অনেকস্থলে মূলগ্রন্থ হইতে দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। যেখানে কথোপকথনের মধ্যে কোন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে সেখানে ঐরূপ করাই প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আলোচনা যাহাতে সৃষ্টিছাড়া রকমের না হয় সেজন্যও সতর্ক হইতে হইয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাসপাঠের রেওয়াজ বা রীতি জাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ

এখনকার তরুণদের মধ্যে তত নাই। বঙ্কিমের রচনাবলীর যাঁহারা সমাদর করেন তাঁহারা অনেকেই 'পঞ্চাশতের অনেক নীচে' না হইয়া উপরে হইবারই সম্ভাবনা। কাজেই তাঁহাদের স্মৃতির উপর খুব বেশী নির্ভর করাও সঙ্গত মনে হয় নাই।

"সমালোচনার কাজ লেখককে বিশ্লেষণ করা নয়" এমন কথা সকলে স্বীকার করিবেন মনে হয় না।* কিন্তু তাহার প্রধান কাজ যে লেখককে "প্রতিফলিত করা" ইহা বোধ হয় সর্ব্বসম্মত। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রতিফলিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। তবে চন্দ্রের সহস্র কিরণ বিম্বিত করিবার যে শক্তি মহাসাগরের আছে তাহা ক্ষুদ্র সরিতের নাই এ কথা বলাই বাহুল্য। এ সামান্য প্রচেষ্টা কাহাকেও আনন্দ দিতে পারিবে কি না কে জানে, তবে ঋষিঋণ পরিশোধের চেষ্টায় লেখক যে আনন্দ লাভ করিয়াছে তাহার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

* যথা, T. S. Eliot বলেন, "Comparison and analysis . . . . are the chief tools of the critics." ( Selected Essays, pp. 32-33).

# দুর্গেশনন্দিনী

# দুর্গেশনন্দিনী

( ১৮৬৫* )

"ইংরাজীপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের * * * বিশ্বাস এই যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজী গ্রন্থের ছায়া মাত্র" ( বঙ্গদর্শন : পত্রসূচনা )।

দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস। বঙ্গ সাহিত্যে ইহা যে ভাবে বিস্ময়কর নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার নিম্নলিখিতরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

"১৮৬৪ সালে তাঁহার প্রণীত 'দুর্গেশনন্দিনী' নামক উপন্যাস মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। আমরা সেদিনের কথা ভুলিব না। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্গ সমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎপূর্ব্বে 'বিজয়-বসন্ত' 'কামিনীকুমার' প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদম্বরী ধরণের উপন্যাস, গার্হস্থ্য পুস্তক প্রচার-সভার প্রকাশিত 'হংসরূপী রাজপুত্র', 'চকমকির বাক্স' প্রভৃতি কয়েকটি ছোট

---

*"বঙ্কিমচন্দ্র যখন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে" "খুলনা হইতে বদলী হইয়া বারুইপুরে গেলেন, তখন দুর্গেশনন্দিনী লেখা শেষ হইয়াছে।" ( শচীশচন্দ্র : বঙ্কিম-জীবনী—১২৯-৩০ পৃঃ )। কেহ কেহ বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে আসিয়া দুর্গেশনন্দিনী সমাপ্ত করেন। সে যাহা হউক "বারুইপুরে অবস্থানকালে ১৮৬৫ খৃঃ দুর্গেশনন্দিনী প্রথম প্রকাশিত হয়"—( ঐ ১৩৫ পৃঃ )।

গল্প এবং ‘আরব্য উপন্যাস’ প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা গ্রন্থ আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। ‘আলালের ঘরের দুলাল’ তাহার মধ্যে একটু নূতন ভাব আনিয়াছিল। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা যাহা দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। এরূপ অদ্ভুত চিত্রণশক্তি বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। দেখিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল যেন বঙ্কিম বাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।”[১]

কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ইতিহাসে দুর্গেশনন্দিনীর স্থান যুগপ্রবর্ত্তক গ্রন্থ-হিসাবে যত গৌরবান্বিত হোক, কাহিনী-হিসাবে ইহার মৌলিকত্বে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ইহা সার ওয়াল্‌টার স্কটের আইভ্যান্‌হো উপন্যাসের অনুকরণে লিখিত। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জীবনী-লেখক শচীশচন্দ্র কিন্তু বলেন এই অভিযোগ ভিত্তিহীন, যেহেতু বঙ্কিম বলিয়াছিলেন যে দুর্গেশনন্দিনী লেখার পূর্ব্বে তিনি আইভ্যান্‌হো পড়েন নাই।[২] এ কথা প্রকৃত মনে করিবার অন্যতম যুক্তি এই মনে হয় যে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াও বঙ্কিম যখন কোন রচনা বা চরিত্র বিশেষ সম্বন্ধে স্কট্‌এর অপেক্ষা অখ্যাত লেখকের নিকটেও ঋণ স্বীকার

১ শিবনাথ শাস্ত্রী : “রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” ২৮৩ পৃষ্ঠা।

২ গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীও তাহাই বলেন (‘বঙ্কিমচন্দ্র’ ২য় ভাগ ২০ পৃঃ)।

করিতে কুণ্ঠিত হন নাই (যথা রজনীর ভূমিকায়), তখন আইভ্যান্‌হোর আদর্শে দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিলে অপরিণত বয়সে স্কটের ন্যায় সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিকের কাছে ঋণ স্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তবু তর্কস্থলে না হয় স্বীকার করা যাক "দুর্গেশনন্দিনী" লেখার পূর্ব্ব হইতে বঙ্কিমচন্দ্র আইভ্যান্‌হো উপন্যাসের সহিত পরিচিত ছিলেন কিন্তু পরিচিত থাকিলেই যে অনুকরণ করিয়াছেন নির্ব্বিচারে সে সিদ্ধান্ত করা যায় না। অতএব প্রতিপাদ্য বিষয়ে ও চরিত্রাঙ্কণে 'দুর্গেশনন্দিনী' 'আইভ্যান্‌হো'র অনুকরণ বা অনুলিপি মাত্র কিনা তাহা আলোচনার যোগ্য।

সে আলোচনার উপক্রমে দুর্গেশনন্দিনীর মুখবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাধিধারী লেখক বাংলা ভাষায় তাঁহার প্রথম উপন্যাস রচনারম্ভে আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন এমন দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া যাহাতে শুধু এদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কালবৈশাখীর রুদ্রচ্ছন্দে রূপায়িত নহে, পরন্তু মহাকালের মন্দিরদ্বার উদ্‌ঘাটিত। ভারতবর্ষ সেকালে যখন স্বাধীনতায় ও শৌর্য্যে, সভ্যতায় ও বহুমুখী সাধনায়, সাহিত্যে ও শিল্প-কলায় সমুন্নত ও অগ্রণী ছিল তখনকার মহাকবি—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ ।[১]

১ কালিদাস : রঘুবংশম্ ১।১

বলিয়া শুধু যে মহাকাব্যের মঙ্গলাচরণ করিতেন তাহা নহে, আদিরসাত্মক দৃশ্যকাব্য রচনায়ও

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশ ॥[১]

বলিয়া যবনিকা উন্মোচন করিতেন। কেন যে করিতেন ভারতীয় সাধনার মর্ম্মজ্ঞ বিদেশী পণ্ডিতও যে তাহা একেবারে না বুঝেন এমন নহে।[২] কিন্তু তাহার পরে সার্দ্ধসহস্র বৎসর

১ কালিদাস: 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' (প্রস্তাবনা) ১।১।

২ 'The worship of Shiva is one of the oldest, most profound and most terrible elements in Hinduism. Sir John Marshall reports "unmistakable evidence" of the cult of Shiva at Mahenjo-daro. . . . "Shaivaism", he concludes, "is, therefore, the most ancient living faith in the world." The name of the God is a 'euphemism', literally it means "propitious", whereas Shiva himself is viewed chiefly . . . as the manifestation of that cosmic force which destroys . . . Never has another people dared to face the impermanence of forms and the impartiality of nature so frankly or to recognise so clearly that evil balances good, that destruction goes step by step with creation, and that all birth is a capital crime punishable with death', But 'just as death is the penalty of birth, so birth is the frustration of death; and the same God who symbolises destruction represents also, for the Hindu mind, that passion and torrent of reproduction which overrides the death of the individual with the continuance of race.' (Will Durant: 'The Story of Civilisation', p. 509). শুধু ইহাই নহে ভারতীয় মতে পরিশুদ্ধ প্রেমের দেবতা হইতেছেন স্মরহর শিব ও সতী, হরপার্ব্বতী।

অতীত। ভারতের উপর দিয়া যুগে যুগে কত রাষ্ট্রীয় ঝঞ্ঝাবাত ও বৈদেশিক আক্রমণের মহাপ্লাবনই না বহিয়া গিয়াছে, কত না প্রাচীন রীতি লুপ্ত, কত না নূতন রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তবুও যদি দেখা যায় আধুনিক যুগে নবসাহিত্যের প্রবর্ত্তক রসরচনার উপক্রমে শিব-সাক্ষাতে স্বয়ম্বরের কল্পনা করিতেছেন তখন তাহার তাৎপর্য্য উপেক্ষা করিয়া 'বিদেশ থেকে আমদানী' ধারণায় দুর্গেশনন্দিনীর সূচনাটুকু 'ধান ভানিতে শিবের গীত' মনে করা কঠিন। আরও যদি দেখা যায় দুর্গেশনন্দিনী যে প্রেমের কাহিনী তাহাতে উমার ঐকান্তিক তপস্যার ছায়াপাত হইয়াছে তাহা হইলে ত ইহাকে স্থানীয় রঙে সূচনার দৃশ্যপটমাত্র আঁকা হইয়াছে বলা যায় না। ইহাতে ভাবী কাহিনীর ইঙ্গিত রহিয়াছে, এমন কি সমস্ত কাহিনীর মূল সুর বাঁধা হইয়াছে, মনে করিতে হয়। সেরূপ ধারণা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে কি না পরে দেখা যাইবে, আপাততঃ দুর্গেশনন্দিনীর সহিত তাহার কল্পিত আদর্শ আইভ্যান্‌হোর কাহিনীগত ঐক্য কতদূর আছে দেখা প্রয়োজন।

আইভ্যান্‌হো গল্পটি কি? রাজা প্রথম রিচার্ডের সময়েও যখন ইংল্যাণ্ডে বিজেতা নর্ম্যান্ ও বিজিত স্যাক্‌সন্‌দিগের মধ্যে ঐক্যস্থাপন হয় নাই, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল, তখন প্যালেষ্টিনের ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে ফেরার পথে রিচার্ড্ জার্ম্মানীতে বন্দী দশা কাটাইয়া ছদ্মভাবে ইংল্যাণ্ডে উপনীত হইলেও তাঁহার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে

তাঁহার ভ্রাতা জন্ কতকগুলি চক্রান্তকারী সামন্তবর্গকে লইয়া সিংহাসন অধিকারের অপচেষ্টা করিতেছিলেন। সেই সময় স্যাক্সন্ সামন্ত সেড্রিক্ রাজা এ্যাল্‌ফ্রেড্‌এর বংশসম্ভূত তাঁহার এক বন্ধুকন্যা রূপসী রাওএনাকে নিজ কন্যার মত পালন করিতেছিলেন। সেড্রিকের অভিপ্রায় ছিল স্যাক্সন রাজা এড্‌ওয়ার্ড দি কন্‌ফেসরের বংশধর এ্যাথেল্‌ষ্টেনের সহিত রাওএনার বিবাহ দিয়া স্যাক্সন্ রাজন্যবর্গের মধ্যে ঐক্য স্থাপন এবং ইংলণ্ডে স্যাক্সন্ রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন। রাওএনা কিন্তু এ্যাথেল্‌ষ্টেনকে ভাল না বাসিয়া হইল সেড্রিকের বীর পুত্র আইভ্যান্‌হোর অনুরাগিণী। ফলে পিতার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে রাওএনাকে ভালবাসার এবং নর্ম্ম্যান্ রাজা রিচার্ডের প্রিয় অনুচররূপে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করার অপরাধে আইভ্যান্‌হো সেড্রিকের ত্যাজ্যপুত্র ও দায়াধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। আইভ্যান্‌হো কিন্তু রাজা রিচার্ডের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে প্যালেষ্টিনে গিয়া বিশেষ বীরত্ব-খ্যাতি অর্জ্জন করে এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর এ্যাস্‌বীর দ্বন্দ্বক্ষেত্রে যে শস্ত্রপ্রতিযোগিতার ( Tournamentএর ) অনুষ্ঠান হয় তাহাতে রাজকুমার জনের পক্ষপাতী ব্রায়ান্-ডি-বয়-গিলবার্ট প্রমুখ প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাজিত করে। এই দ্বন্দ্বক্ষেত্রে রাওএনাকে সে প্রেম-সৌন্দর্য্যের রাণী ( Queen of Love and Beauty ) মনোনীত করে এবং রাওএনার করকমল হইতে বিজেতার পুরস্কারও লাভ করে, কিন্তু

গুরুতররূপে আহত হওয়ায় ইহুদী আইস্যাকের কন্যা রেবেকা আইভ্যান্‌হোকে লইয়া গিয়া সানুরাগ শুশ্রূষায় তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনে এবং ঔষধাদি দিয়া অনেকাংশে সুস্থ করিয়া তুলে। প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে পরাজিত হইলেও প্রতিপক্ষের নায়কগণ অর্থাৎ ব্রায়ান্‌-ডি-বয়গিল্‌বার্ট, ডি' ব্রেসি, এবং ফ্রাণ্ট-ডি-বোফ বিজেতৃপক্ষের প্রত্যাবর্ত্তনের পথে রাওএনার সহিত সেড্রিকের দলকে এবং রেবেকার সহিত তাহার পিতা আইস্যাক ও রুগ্ন আইভ্যান্‌হোকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া বন্দী করে। ফ্রাণ্ট-ডি-বোফের টর্কিল্‌ষ্টোন দুর্গে যখন তাহারা আবদ্ধ তখন সেখানে ডি' ব্রেসি রাওএনাকে ও বয়গিল্‌বার্ট রেবেকাকে স্ব স্ব প্রণয়ভাগিণী করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হয়। তৎপরে ছদ্মবেশী রাজা রিচার্ডের নেতৃত্বে লক্‌সলি বা দস্যু রবিন হুডের দল টর্কিলষ্টোন আক্রমণ ও ধ্বংস করিয়া রাওএনা প্রভৃতিকে উদ্ধার করিলেও, বয়গিলবার্ট রেবেকাকে লইয়া Knight-Templarদিগের টেম্‌পল্‌ষ্টো মঠে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই সময় Templar দিগের সংঘপতি সেখানে উপস্থিত হইলে তিনি ইহুদী রেবেকাকে অলৌকিক চিকিৎসার ফলে আইভ্যান্‌হোর আরোগ্য-বিধায়িনী ও ব্রায়ান্‌-ডি-বয়গিল্‌বার্টের ব্রহ্মচারী ব্রতভঙ্গকারিণী সম্মোহিনী ডাইনী অভিযোগে বিচার করিয়া দণ্ডবিধান করিলেন যে রেবেকার নির্ব্বাচিত কোন বীর ( Knight ) বয়গিলবার্টের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে যদি জয়ী হইতে না পারে, তাহা হইলে

রেবেকাকে ডাইনী প্রতিপন্ন হইয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে। রেবেকা কিন্তু সে সঙ্কটেও পুনঃ পুনঃ গিল্‌বার্টের প্রণয় নিবেদন ও অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া শেষ মুহূর্ত্তে উপনীত প্রেমাস্পদ আইভ্যান্‌হোকে তাহার পক্ষসমর্থক যোদ্ধা মনোনয়ন করে, আর আইভ্যান্‌হো তখনও সম্পূর্ণ সবল না হইলেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে দ্বিধাগ্রস্ত গিলবার্টকে পরাজিত ও নিহত করে। পরিশেষে এ্যাথেলষ্টেন রাওএনাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইলে রাজা রিচার্ডের অনুরোধে সেড্রিক্, রাওএনা ও আইভ্যান্‌হোর মিলনে সম্মত হইলেন এবং আইভ্যান্‌হো-রাওএনার বাঞ্ছিত মিলন ঘটিল। আর, রেবেকা বিফল প্রেমের বেদনায় রাওএনাকে পরিণয় উপহার দিয়া তাহার পিতার সহিত ইংল্যাণ্ড্ ত্যাগ করিয়া গেল।

অতএব আইভ্যান্‌হোর কাহিনীর সহিত দুর্গেশনন্দিনীর আখ্যান-বস্তু তুলনা করিলে দেখা যায় আইভ্যান্‌হো মুখ্যতঃ তাহার নায়কের ক্ষাত্রবীর্য্য ও ঐকান্তিক প্রীতির কাহিনী, অর্থাৎ কেমন করিয়া আইভ্যান্‌হোর রাওএনা-প্রীতি তাহার পিতার অপ্রীতি, প্যালেষ্টিন প্রবাস, প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রচেষ্টা, এমন কি রেবেকার প্রেমসমস্যা অতিক্রম করিয়া অন্তরে-বাহিরে বিজয়লাভ করিল তাহারই উপাখ্যান। রাওএনা এখানে অপরিস্ফুট চরিত্র, গল্পের নায়িকা যদি বা হয় শিল্পীর মুখ্য পরিকল্পনা নহে। কিন্তু, দুর্গেশনন্দিনী, প্রধানতঃ নায়িকা তিলোত্তমার প্রণয়-কাহিনী। কেমন করিয়া তাহার সঞ্চার

হইল, সমৃদ্ধি ঘটিল, কেমন করিয়া সঙ্কট ও উপেক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া অন্তিমে সে প্রেমনিষ্ঠা সার্থকতা লাভ করিল, তাহারই ইতিকথা। চরিত্রগুলির পরস্পর সম্পর্কসম্বন্ধও বিভিন্ন রকমের। নায়ক জগৎসিংহ আইভ্যান্‌হোর মত দুর্গেশনন্দিনীর পালকপিতার পুত্র নহেন, তিলোত্তমাও বীরেন্দ্রের পালিতা কন্যা নহেন। একত্র লালিত-বর্দ্ধিত হইয়া তাহারা পরস্পরের প্রীতিমুগ্ধ হয় নাই। পক্ষান্তরে ওস্‌মান ও আয়েষা যেমন একই আশ্রয়ে ভ্রাতা-ভগিনীর ন্যায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল রেবেকা ও ব্রায়ান্‌-ডি-বয় গিলবার্ট তাহা উঠে নাই। ধূমকেতুর মত গিল্‌বার্ট রেবেকার জীবন-কক্ষে অন্ধ আবেগেই আসিয়া পড়িয়াছিল। চরিত্রগুলির সম্বন্ধ-কল্পনায় যে শুধু এই পার্থক্য আছে তাহা নহে, চরিত্রগুলির, বিশেষতঃ মুখ্য চরিত্রগুলির, রসরূপের পরিকল্পনায় আরও বেশী বিভিন্নতা দেখা যায়।

প্রথমে উভয় গ্রন্থের নায়ক দুইটির চরিত্র তুলনা করিলে দেখিতে পাই জগৎসিংহের চরিত্র যে সকল উপাদানে গঠিত আইভ্যান্‌হোর চরিত্রে সে সকল উপাদান নাই। জগৎসিংহ বীর কিন্তু ক্ষমাশীল, আইভ্যান্‌হো বীর হইয়াও ক্ষমাহীন। এ্যাস্‌বীর দ্বন্দ্ব ( Tournament ) হইতে আইভ্যান্‌হো বয়-গিল্‌বার্টের বিরোধী শুধু নহে, হত্যায় বদ্ধপরিকর। জগৎসিংহ ওস্‌মান কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও আহত হইয়াও তাহাকে ক্ষমা করিয়া বিদায় দিলেন। স্বজাতিগৌরবে পূর্ণ হইয়াও জগৎসিংহ

পরধর্ম্মবিদ্বেষী নহেন। আইভ্যান্‌হো পিতার ন্যায় স্বজাতি প্রিয় নহে, পরন্তু পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট। জগৎসিংহ পদে পদে রাজপুত বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছেন অথচ শক্রকন্যা আয়েষার মনে আঘাত লাগে ভাষায় বা ব্যবহারে পাঠানদিগের বা মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি এমন কোন রূঢ়তা বা বিদ্বেষ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে দেখি না। পক্ষান্তরে আইভ্যান্‌হো স্বজাতিনিষ্ঠ নহে, আর রেবেকার প্রীতিময় সেবা পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়াও কথাপ্রসঙ্গে রেবেকাকেই বলিতেছে—

"Thou art no Christian Rebecca ; and to thee are unknown those high feelings which swell the bosom of a noble maiden when her love has done some deed of emprize which sanctions her flame".

পাশ্চাত্য knight বটে! প্রত্যুত আইভ্যান্‌হো ঠিকই তাহাদের স্বজাতীয় চরিত্রের মূল উপাদান নির্দ্দেশ করিয়াছে ঃ—

"The love of battle is the food upon which we live —the dust of the melèè is the breath of our nostrils. We live not—we wish not to live longer than while we are victorious and renowned".

পাশ্চাত্য সংগ্রামলিপ্সা ও জিগীষার প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু জগৎসিংহের বীরের অধিক জীবনে আমরা দেখিতে পাই জগৎসিংহ, জয়ে নহে, পরাজয়েও কত বড় মুক্তির আশান্বিত সন্ধির প্রস্তাব সমর্থন করিতে অস্বীকার করিয়া অবলীলাক্রমে 'কারাগারের শিলাশয্যাসহ' বধের নিশ্চয়

সম্ভাবনাকে বরণ করিয়া লইলেন। প্রাচীর দুর্দ্দমনীয় চরিত্র-বলের দৃষ্টান্ত। আর যিনি আদর্শের অনুরোধে মৃত্যু বরণ করিতে পারেন তাঁহার নিকট কাহারও আদর্শচ্যুতি অমার্জ্জনীয় বোধ হওয়াই সম্ভব এবং সে কারণে ভ্রান্ত ধারণায় জগৎসিংহ তাঁহার হৃদয় হইতে তিলোত্তমার 'প্রতিমা বিসর্জ্জন' সঙ্কল্প যে করিবেন ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। ফলে জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রণয়জীবনে যে অন্তরের সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কোন দিন আইভ্যান্‌হো ও রাওএনার মধ্যে উপস্থিত হয় নাই। কাজেই তাহাদের প্রণয়ের তেমন কোন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে হয় নাই জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রীতিকে যেরূপ ভ্রান্ত ধারণা ও উপেক্ষার মেঘাবরণ কাটাইয়া উঠিতে হইয়াছে। সঙ্কট ও সঙ্কটতরণ—উভয়েরই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ।

নায়িকা-চরিত্র দুইটি অর্থাৎ রাওএনা ও তিলোত্তমার সামান্য তুলনা করিলেই বা কি দেখিতে পাই? রাওএনা গ্রন্থের মুখবন্ধে, মধ্যে ও অন্তে দেখা দিলেও একটি প্রস্ফুট চরিত্র নয়। সে আইভ্যান্‌হো উপন্যাসখানির একাধিক সঙ্কট সৃষ্টি করিলেও তাহার অন্তরের সংবাদ তাহার স্রষ্টা আমাদের বেশী কিছু দেন নাই। যতদূর দিয়াছেন তাহাতে রাওএনা আদৌ তিলোত্তমার ছাঁচ বা model নহে। কোথায় গরবিনী, স্বচ্ছন্দচারিণী, আলোকে প্রকাশোন্মুখ সূর্য্যমুখী রাওএনা, আর কোথায় বিনম্র ব্রীড়ানত আত্মপ্রকাশভীরু নৈশ কুমুদিনী

তিলোত্তমা! আইভ্যান্‌হোর একপ্রকার সূচনাতেই সেড্রিকের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া রাওএনা প্যালেষ্টিনের অর্থাৎ আইভ্যান্‌হোর সংবাদ পাইবার আশায় ভোজের ঘরে অজ্ঞাত নরম্যান্‌-অতিথিদের সমক্ষে সমাগত। এ্যাস্‌বীর টুরণামেণ্টের স্থলে সে যে শুধু প্রেমসৌন্দর্য্যের রাণীরূপে বরণ-প্রয়াসী তাহা নহে, tournament বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ অন্তে আইভ্যান্‌হো সম্বন্ধে সেড্রিকের সহিত কথোপকথনে তাহার প্রণয়মুখরতার নিম্নোদ্ধৃতরূপ পরিচয় পাই—

"Let him wander his way", said he (Cedric), "let those leech his wounds for whose sake he encountered them. He is fitter to do the juggling tricks of Norman chivalry than to maintain the fame and honour of his English ancestry with the glaive and brown-bill, the good old weapons of the country".

"If, to maintain the honour of ancestry", said Rowena who was present, "it is sufficient to be wise in council and brave in execution—to be the boldest among the bold, and the gentlest among the gentle, I know no voice, save his father's—"

"Be silent, Lady Rowena"—"on this subject only I hear you not. Prepare yourself for the Prince's festival: we have been summoned thither with unwanted circumstance of honour and of courtesy, such as the haughty Normans have rarely used to our race since the fatal day of Hastings. Thither will I go, were it only to show these prouded Normans how little

the fate of a son, who could defeat their bravest, can affect a Saxon".

"Thither", said Rowena. "do I not go ; and I pray you to beware, lest what you mean for courage and obstinacy, shall be accounted hardness of heart".

"Remain at home, then, ungrateful lady," answered Cedric ; "thine is the hard heart, which can sacrifice the weal of an oppressed people to an idle and unauthorised attachment. I seek the noble Athelstane, and with him attend the banquet of John of Anjou". (Ch. XVIII.)

আর তিলোত্তমা ?

"নিকটে একটা লেখনী ও মসীপাত্র ছিল, অন্যমনে তাহা লইয়া পালঙ্কের পার্শ্বে এ ও তা 'ক' 'স' 'ম', ঘর, দ্বার, গাছ, মানুষ, ইত্যাদি লিখিতে লাগিলেন। ০ ০ ০ সর্ব্বনাশ ! আর কি লিখিয়াছেন ?

'কুমার জগৎসিংহ'

লজ্জায় তিলোত্তমার মুখ রক্ত বর্ণ হইল। নির্ব্বুদ্ধি ! ঘরে কে আছে যে লজ্জা ?

'কুমার জগৎসিংহ', তিলোত্তমা দুইবার, তিনবার, বহুবার পাঠ করিলেন ; ঘরের দ্বারের দিকে চাহেন আর পাঠ করেন ; পুনর্ব্বার চাহেন আর পাঠ করেন যেন চোর চুরি করিতেছে।"

এই যে সশঙ্ক সলজ্জ মিলনে অশ্রুময় প্রেম, বঙ্কিম ইহাকে কত যে আত্মদোষদর্শী, আত্মরক্ষায় উদাসীন, উপেক্ষায় ক্ষমাময়, অনাদরে আত্মাহুতিপরায়ণ, করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। টর্কিল্‌ষ্টোনে বন্দী হইয়া ডি'ব্রেসির

কবলে পড়ার বাহ্য সঙ্কটে ব্যতীত রাওএনাকে আর কোন সঙ্কটে পড়িতে হয় নাই। আর তিলোত্তমা, বাহিরের ও অন্তরের কোন সঙ্কটে না পড়িয়াছে এবং সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত উত্তীর্ণ না হইয়াছে ?

অথচ বন্দিনী রাওএনা দুর্দ্দিনে নবভাবে বিকশিত হওয়া দূরের কথা কি অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতার পরিচয়ই না দিয়াছে! যে বীরাঙ্গনা হইতে চায় তাহাকে বিপদে দেখি বিগলিতাশ্রু, বেপথুমতী। স্কট্ নিজেই তাঁহার নায়িকার দুর্দ্দিনের দৈন্য নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"Her haughtiness and habit of domination was, therefore, a fictitious character, induced over that which was natural to her, and it deserted her when her eyes were opened to the extent of her own danger, as well as that of her lover and her guardian : and when she found her will, the slightest expression of which was won't to command respect and attention, now placed in opposition to that of a man of a strong, fierce and determined mind, who possessed the advantage over her, and was resolved to use it, she quailed before him". (Ch. XXIII.)

স্পর্দ্ধিত চরিত্রের বিকলতার কথা ছাড়িয়া দিলেও রাওএনার প্রেমনিষ্ঠার পরিচয়ই বা দুর্দ্দিনে, বা দুর্দ্দিনের অবসানমুহূর্ত্তে, কতটা পাই ? টর্কিলষ্টোনে অবরুদ্ধ থাকার সময়ে আইভ্যান্-হোর চিন্তা কতটুকু যে রাওএনার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল তাহার বিশেষ কোন পরিচয়ই গ্রন্থে পাই না।

পক্ষান্তরে তিলোত্তমার হৃদয়, সুদিনে হোক আর দুর্দ্দিনে হোক, জগৎসিংহের চিন্তায় ভরপূর। কতলুখাঁর বন্দিনী—

"তিলোত্তমা আর ব্রীড়াবিবশা বালিকা নহে। তদ্দণ্ডে তাঁহাকে সেই ক্ষীণালোকে দেখিলে বোধ হইত যে, দশ বৎসর পরিমাণ বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে। দেহ অত্যন্ত শীর্ণ। মুখ মলিন। পরিধানে একখানি সঙ্কীর্ণায়তন বাস। অবিন্যস্ত কেশভারে ধুলিরাজি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। অঙ্গে অলঙ্কারের লেশ নাই; কেবল পূর্ব্বে যে অলঙ্কার পরিধান করিতেন তাহার চিহ্ন রহিয়াছে মাত্র।"[১]

দেশীয় আদর্শের উপাসক বঙ্কিমের স্বর্ণলেখনীর প্রথম সঞ্চালনে অশোক বনে সীতার

"মলপঙ্কধরাং দীনাং মণ্ডনার্হামমণ্ডিতাম্
প্রভাং নক্ষত্ররাজস্য কালমেঘৈরিবাবৃতাম্।*

১ দুর্গেশনন্দিনী ৩।১২।

* রামায়ণ: সুন্দরকাণ্ড ১৫শ সর্গ ৩৭ শ্লোক। ১৭শ সর্গের অনুরূপ বর্ণনা—

"চন্দ্ররেখাং পায়োদান্তে শারদাভ্রৈরিবাবৃতাম্
ক্লিষ্টরূপামসংস্পর্শাদযুক্তামিব বল্লকীম্॥
সীতাং ভর্ত্তৃহিতেযুক্তামযুক্তাং রক্ষসাং বশে
অশোকবনিকামধ্যে শোকসাগরমাপ্লুতাম্॥
তাভিঃ পরিবৃতাং তত্র সগ্রহামিব রোহিনীম্
দদর্শ হনুমাংস্তত্র লতামকুসুমামিব॥
সা মলেন চ দিগ্ধাঙ্গী বপুষা চাপ্যলঙ্কৃতা
মৃণালী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি ন বিভাতি চ॥
মলিনেন তু বস্ত্রেণ পরিক্লিষ্টেন ভামিনীম্
সংবৃতাং মৃগশাবাক্ষীং দদর্শ হনুমান্ কপিঃ॥ (২২-২৬ শ্লোক)

ছবিই ফুটিয়া উটিয়াছে। অবরুদ্ধ রাওএনার সহিত এ বন্দিনীর বাহ্যশ্রীর ত কোন সাদৃশ্যই নাই। মনের কথায়?

বিমলা মুক্তির উপায় অঙ্গুরী দিয়া গিয়াছেন,—

"বিমলা গমন করিলে পর, একাকিনী কক্ষমধ্যে বসিয়া তিলোত্তমা যে সকল চিন্তা করিতেছিলেন, তাহা সুখ দুঃখ উভয়েরই কারণ। পাপাত্মার পিঞ্জর হইতে যে আশু মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে এ কথা মুহুর্মুহুঃ মনে পড়িতে লাগিল; কিন্তু কেবল এই কথাই নহে।"..."সকল চিন্তার সমতা করিয়া আর এক চিন্তা মনোমধ্যে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। 'রাজকুমার তবে কুশলে আছেন?' (বিমলা বলিয়া গিয়াছে) 'কোথায় আছেন? কি ভাবে আছেন? তিনি কি বন্দী?' এই ভাবিতে ভাবিতে তিলোত্তমা বাষ্পাকুললোচনা হইতে লাগিলেন। 'হা অদৃষ্ট! রাজপুত্র আমার জন্যই বন্দী। তাঁহার চরণে প্রাণ দিলেও কি ইহার শোধ হইবে?'—'তিনি কি কারাগারে আছেন?'—'কেমন করিয়া তিনি মুক্ত হইবেন? আমি মুক্ত হইলে কি কার্য্য সিদ্ধ হইল? এ অঙ্গুরীয় বিমাতা কোথায় পাইলেন? তাঁহার মুক্তির জন্য এ কৌশল হয় না। এ অঙ্গুরীয় তাঁহার নিকট পাঠাইলে হয় না?' "[২]

তাহার পরে নিজের মুক্তির কথা বিস্মৃত হইয়া তিলোত্তমা প্রহরীকে অঙ্গুরীয় দেখাইয়া স্বপ্নচালিতের মত জগৎসিংহের কারাগার উদ্দেশেই চলিল। প্রেমাস্পদের দুর্ভাগ্য জন্য অনুশোচনা ও তাহার মুক্তির আগ্রহ চলিল নিদারুণ উপেক্ষার আঘাত সহিতে। অচিরে মিলনের স্বপ্ন হইল অপ্রত্যাশিত

২ : ৩।৩১।

লাঞ্ছনায় মূর্চ্ছিত, নিলীন। তারপরে আসিল সে কি তিলে তিলে মৃত্যুর দিন—অনাদৃত প্রেমের অগ্নিশিখায় পলে পলে নীরব আত্মাহুতি!

মৃণালিকাপেলবমেবমাদিভিব্র্তৈঃ স্বমঙ্গং গ্লপয়ন্ত্যহর্নিশম্।
তপঃ শরীরৈঃ কঠিনৈরুপার্জ্জিতং তপস্বিনাং দূরমধশ্চকার সা॥[১]

ঐকান্তিক প্রেমের অনির্ব্বচনীয়তা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমের পরবর্ত্তী বাঙ্গলার কবি

"কোথা তার আদি কোথা তার শেষ
কত আঁখিজল মাথা
একে সদা হায় আন বুঝে যায়
এত লাজ ভয় ঢাকা

* * * *

দেবতা আকাশে ঋষি বনবাসে
মাঝে কেন আঁখিজল?
পরবাসে পতি কেন মরে সতী
মতিগতি সেই পায়
আপন মরণে আপনি বরিয়া?
কেমনে বুঝাব তায়।"[২]

বলিয়া হাল ছাড়িয়াছেন, বঙ্কিম কিন্তু তাহারই কোমল মাধুরীতে দৃঢ়নিষ্ঠার ভাঁজ দিতে দিতে একেবারে তাপসী উমার প্রেম-

১ কালিদাস: 'কুমারসম্ভবম্' ৫।২৯।
২ অক্ষয়কুমার বড়াল: 'প্রেম কি বুঝান যায়?'

সাধনার পূর্ণশ্রী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আইভ্যান্‌হো উপন্যাসে এ চরিত্রের আদর্শ বা তুলনা কোথায়?

নায়কনায়িকাদিগের চরিত্র ত্যাগ করিয়া প্রতিনায়ক-প্রতিনায়িকাদিগের চরিত্র আলোচনা করিলে কতদূর সাদৃশ্যই বা দেখিতে পাই? ওস্‌মান কি ব্রায়ান্‌-ডি-বয় গিল্‌বার্টের অনুকৃতি? দুইজনেই সাহসী ও বীর বটে, কিন্তু ওস্‌মানের যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মহানুভবতা তাহার চরিত্রে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে বয় গিল্‌বার্টের চরিত্রে তাহার কোন সন্ধানই পাই না। আর, বয় গিল্‌বার্টের ভণ্ড ধর্ম্মধ্বজীত্ব ও কামান্ধতাই বা ওস্‌মানের চরিত্রে কোথায়? ওস্‌মানের মহানুভবতা তাহাকে করিয়াছে শত্রুর প্রতি সদয় ও নারীর প্রতি মর্য্যাদা-সম্পন্ন, বয় গিল্‌বার্টের নৃশংসতা তাহাকে করিয়াছে বৈরীর রক্তলোলুপ, নারীর প্রতি অত্যাচারী। কাজেই ওস্‌মান যে তাহার প্রেমের বিফলতার নৈরাশ্যে পরিশেষে জগৎসিংকে মারিতে বা মরিতে গিয়াছিল তাহাতে তাহার মহৎ চরিত্রের অস্বাভাবিক স্খলন দেখিয়া আমরা যেন Adam Bedeএর সৃজয়িত্রীর মত ওস্‌মানের স্রষ্টাকে অসঙ্গতি দোষে দোষী করিতে উদ্যত হই। পক্ষান্তরে অন্তর্বিরোধে শক্তিহীন বয় গিল্‌বার্ট অবশেষে তাহার অবাঞ্ছিত যুদ্ধে প্রাণ দিয়া যে রেবেকাকে বাঁচাইয়া দিল তাহাতে আমরা তাহার চরিত্রের অন্তিম স্ফুরণে স্কটের পাকা হাতের প্রশংসা না করিয়া পারি না।

তেমনই প্রতিনায়িকা আয়েষা ও রেবেকার চরিত্র। আয়েষা নবাবের কন্যা, রেবেকা নির্য্যাতিত ইহুদীর। তাই আয়েষার চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রদীপ্ত স্বাতন্ত্র্য, আঘাতে মুখর ও ভাবোচ্ছল। আর রেবেকার চরিত্রে বেদনাক্লিষ্ট সহনশীলতা, নিয়ত মূক, দুর্দ্দিনে অটল। প্রতিদান-নিরপেক্ষ প্রেমনিষ্ঠার ঐক্য উভয় চরিত্রের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিলেও একজনের প্রেম অশ্রুস্ফুরণেও তাহার আনন্দের অভিব্যক্তি, 'sunshine and rain at once',[১] অপরের প্রেম নিরুদ্ধ, প্রকাশে ব্যথার দান। যখন অবশেষে উভয়েরই প্রেমজীবন বিচ্ছেদের বেদনায় ভরিয়া উঠিল তখন একজন দাঁড়াইল তাহার নারী-চরিত্রের গৌরব ও ভাব সম্পদের উপর, অপরের আশ্রয় হইল সকল নির্য্যাতিতের নির্ভর নিখিলের স্বামী। অশ্রুবিহ্বল আয়েষা যখন জগৎসিংহকে লিখিতেছে—

> "আমি তোমার প্রেমাকাঙ্খিনী নহি। আমার যাহা দিবার তাহা দিয়াছি, তোমার নিকট প্রতিদান চাহি না। আমার স্নেহ এমন বদ্ধমূল যে তুমি স্নেহ না করিলেও আমি সুখী।"

তখনও পাঠক তাহার কথায় বিশ্বাস করিতে পারে; কারণ আয়েষা ভবিষ্যতেও জগৎসিংহের সুখদুঃখভাগিনী হইতে চায়, আত্মহত্যা করিতে চায় না—'জগৎসিংহ কি ভাবিবেন' বলিয়া—আর মৃত্যুর পরেও জগৎসিংহের প্রতি তাহার অনুরোধ-রক্ষার দাবী রাখে। ইহা সম্বন্ধত্যাগ নয়—বিরহবরণ।

১ Shakespeare : 'King Lear', IV. 3, 18.

আইভ্যান্‌হোর মিলনের দাবীই করিয়াছিল। তাহার জবাবদিহি করিতে অবশ্য বলা হইয়াছে—

"If a virtuous and self-denied character is dismissed with temporal wealth, greatness, rank or the indulgence of such a rashly formed or ill-assorted passion as that of Rebecca for Ivanhoe, the reader will be apt to say, verily virtue has had its reward. But a glance on the great picture of life will show, that the duties of self-denial and the sacrifice of passion to principle, are seldom thus remunerated ; and that the internal consciousness of their high-minded discharge of duty, produces on their own reflections a more adequate recompense, in the form of that peace which the world cannot give or take away",

(Introduction.)

কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষার "মিলনের অভাবে সুসম্পূর্ণ ও ব্যথাতেই মধুর" চরিত্র অঙ্কিত করিয়া বঙ্কিমকে সেরূপ কৈফিয়তের দায়ী হইতে হয় নাই, কারণ আয়েষার চিত্রে এমন কোন বর্ণবাহুল্য ঘটে নাই যাহাতে তিলোত্তমার চিত্র ম্লান হইতে পারে বা তিলোত্তমার আত্মাহুতির অগ্নিশিখা নিষ্প্রভ হয়। অথচ উদ্ধৃত মন্তব্যে যে অন্তরের শান্তি বা আনন্দের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা বঙ্কিমের আয়েষা যতটা উপলব্ধি করিয়াছে স্কটের রেবেকা ততটা করিতে পারে নাই। তরুণ বঙ্কিমের সামঞ্জস্য বোধশক্তির ও সৃজনকুশলতার ইহা কম পরিচয় নহে।

নায়ক-নায়িকা, প্রতিনায়ক-প্রতিনায়িকা ব্যতীত উভয় গ্রন্থেই এমন চরিত্র আরও আছে যাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য সামান্য কিছু দেখা গেলেও, পার্থক্য অনেক বেশী, যথা আল্‌রিকা ও বিমলা। আল্‌রিকা টর্কিল্‌ষ্টোন্ দুর্গ ও তাহার অধিকারী দুর্ব্বৃত্তের ধ্বংসসাধনে যেমন সহায়তা করিয়াছে, বিমলা কতলুখাঁর নিধনে ও পাঠানদিগের পরাজয়ে তেমনই সাহায্য করিয়াছে এইটুকু মিল। নতুবা চরিত্র দুইটির প্রয়োজন ও অভিব্যক্তি কত না বিভিন্ন। নিয়তির অভিশাপ ঘোষণাই আল্‌রিকার কার্য্য, পক্ষান্তরে প্রণয়ভীরু তিলোত্তমার প্রেমের খেয়াকে সকল তরঙ্গ ও আবর্ত্ত উত্তীর্ণ করিয়া নিরাপদ কূলে পৌঁছিয়া দেওয়াই বিমলার কাব্যগত দায়িত্ব। তাই প্রাচীনা আল্‌রিকা টর্কিলষ্টোন্ নরককুণ্ডের অগ্নিচয়নকারিণী প্রেতিনীরূপে আইভ্যান্‌হো উপন্যাসে সঙ্কীর্ণ স্থানই অধিকার করিয়াছে। কিন্তু পরিপূর্ণ যৌবনের লীলাচঞ্চল, সুচতুর ও সাহসিকা বিমলা দুর্গেশনন্দিনী উপাখ্যানের সর্ব্বত্র সঞ্চারিণী প্রাণশক্তির মত কোথায় না বর্ত্তমান? বিমলা নায়িকা নহে যেহেতু সে নায়কের প্রণয়িনী নহে, তাহার প্রণয়কাহিনীও গল্পের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় নহে, অথচ দুর্গেশনন্দিনীর গল্পধারাকে সে নব নব ঘটনা-সংস্থানের মধ্য দিয়া বিচিত্র ছন্দে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। সুখের হোক আর দুঃখের হোক গুরুত্বপূর্ণ যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা অনেকাংশে বিমলার বুদ্ধিতে বা ভ্রান্তিতে, বিমলার চেষ্টায় বা দুশ্চেষ্টায়।

পিতৃকুলঘ্নের অঙ্কশায়িনী, পতিহন্তার ভিক্ষোপজীবী, আল্‌রিকা নীচাশয় প্রতিহিংসার বীভৎসরসমূর্ত্তি গৃধ্রিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে। পক্ষান্তরে বিমলা দাস্য, মাধুর্য্য, সখ্য, বাৎসল্য কত না ভাবের, শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ ও বীর কত না রসের, আশ্রয়। বিচিত্রবর্ণা কলাপিনীর মত বসন্তে ও বর্ষায় সে সমভাবেই সক্রিয়। রুদ্রাণীর পরিচয়ও সে একদিন দিয়াছিল সত্য, কিন্তু বিস্তৃতফণা বিষধরকে ময়ূরীর মত মরণাহত করিয়া; শুধু তাহার স্বামিহত্যার শাস্তিবিধানের জন্য নহে, তাহার ধর্ম্ম রক্ষার আশুপ্রয়োজনেও বটে। নতুবা বিমলার চরিত্র উপচিত প্রীতির ও উচ্ছ্বসিত স্নেহের অপূর্ব্ব সমন্বয়। সে প্রীতি আবার দাস্যের, সে স্নেহ সখীত্বের ছদ্মবেশ অবলম্বন করিয়া দুর্গেশনন্দিনীর কাহিনীতে কত না সরসতা ও গতিবেগ দান করিয়াছে। অথচ যে দিন তাহার দৌত্যের অবসান হইল, তাহার কাণ্ডারীর কার্য্য ফুরাইল, সেদিন শৈলেশ্বরের মন্দিরের বা মন্দির পথের, গড় মন্দারণ দুর্গের বা কতলুখাঁর সভামণ্ডপের পরিচিত বিমলার পরিবর্ত্তে, এক ভগ্নাবশেষ অট্টালিকার জীর্ণ কক্ষের আবেষ্টনে 'ব্যাধিক্ষীণা' তিলোত্তমার রোগশয্যার সন্নিধানে, দেখিলাম 'নিরাভরণা মলিনা দীনা' বিমলা। এ দৈন্য শুধু যে তাহার আপন দুর্ভাগ্যের পরিচয় তাহা নহে, দুর্ভাগ্যদলিত তিলোত্তমার বিরহসন্তপ্ত জীবনের ব্যথার প্রতিবিম্বও বটে। তিলোত্তমার প্রতি ঐকান্তিক স্নেহ যে বিমলার জীবনসঙ্গীতের চরমসুর (diapason) এবং তাহাকে

কতটা আত্মবিস্মৃত করিতে পারে, জগৎসিংহ তিলোত্তমাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প নেপথ্যে শুনিবামাত্র বিমলার “অকস্মাৎ পূর্ব্বভাব প্রাপ্তি”র বর্ণনায় বঙ্কিম তাহার শেষ চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। প্রত্যুত বিমলা বঙ্কিমের অভিনব সৃষ্টি, স্কটএর গ্রন্থে তাহার তুলনা নাই।

উভয় গ্রন্থ এই ভাবে তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই শুধু গল্পাংশের বৈষম্য নহে, গ্রন্থ দুইখানির তুলনীয় চরিত্রগুলির উপাদানগত বিভিন্নতা এত অধিক, তাহাদের সংস্কৃতিগত পার্থক্য এত প্রবল, যে কেবল মাত্র একজন সমরকুশল বীর নায়কের প্রতি দুইজন সৌন্দর্য্যশালিনী রমণীর সফল ও বিফল অনুরাগের কাহিনী বলিয়া দুর্গেশনন্দিনীকে আইভ্যান্‌হোর নকল প্রতিপন্ন করা দুরূহ; বরং চরিত্র-সৃজনে ভারতীয় রূপ রস ও মূল্যবোধ যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে মৌলিক রচনার গৌরব দুর্গেশ-নন্দিনীর অবশ্য পাপ্য বটে।

‘পাশ্চাত্য রোমান্সের ছাঁচে ঢালা’ বঙ্কিমের এই প্রথম উপন্যাসখানি এমনই মায়াজাল বিস্তার করিয়া আছে যে ‘পাথুরে প্রমাণের’ পক্ষপাতী ঐতিহাসিকগণ আজও কতলুখাঁর বিরুদ্ধে মানসিংহের অভিযানের আলোচনা করিতে গেলে ‘দুর্গেশনন্দিনী’র কাহিনী স্মরণ না করিয়া পারেন না। ইহার মূল বর্ণনীয় বিষয়-সম্বন্ধে যদি বা ডক্টর কানুনগো বলেন ‘ইতিহাসে উল্লেখ না থাকিলেও জগৎসিংহের মত বীরের পক্ষে

ঐখানে' ( অর্থাৎ রাজা হাম্মীরের আশ্রয়ে বিষ্ণুপুরে ) 'একটি তিলোত্তমা লাভ কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে' [১], স্যর যদুনাথ সরকার বলেন 'জয়পুরের রাজপুত্র যে বঙ্গদেশের একজন জমিদারের কন্যাকে বিবাহ করিলেন এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার'[২]।

১ প্রবাসী ১৩৫১, আষাঢ় সংখ্যা ১৮৫ পৃঃ।

২ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩৫০, ৫০শ ভাগ ৩য় সংখ্যা ৬১ পৃঃ।

# কপালকুণ্ডলা

# কপালকুণ্ডলা

( ১৮৬৬ * )

(প্রকৃতি যেখানে দৃশ্যতঃ সুন্দরী হইয়াও ভয়ঙ্করী, মৃত্যুর ছন্দে লীলায়িতা বা বনকুন্তলা, নারী যেখানে জননী হইয়াও সন্তান বিসর্জ্জন করে, মানুষ সহযাত্রী হইয়াও সহানুভূতিশূন্য, এমন কি সাধক হইয়াও নির্দ্দয়, কপালকুণ্ডলাগল্প আরম্ভ তেমনই এক অকরুণ আবেষ্টনে।) সাগরযাত্রীদের নৌকা সাগরসঙ্গম হইতে ফেরার পথে অকূলে পড়িয়া কুয়াশায় দিশাহারা, এমন সময়ে নৌকারোহীদিগের মধ্যে যুবক নবকুমার সাগর বেলা ভূমির শোভা স্মরণ করিয়া মহাকবি কালিদাসের ভাষায় বলিয়া উঠিলেন—

'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমাল-তালী-বনরাজি নীলা
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্দ্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।'

কেমন করিয়া জানিবেন কূলে সেই অয়শ্চক্রসীমায় সহযাত্রিগণের পাকের ইন্ধন আহরণ করিতে গিয়া

---

* "কপালকুণ্ডলা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই প্রকাশিত হয়"—শচীশচন্দ্র 'বঙ্কিম-জীবনী'। আমাদের মনে হয় ১৮৬৬ সালের জুন মাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে ছুটী লয়েন সেই অবকাশে কপালকুণ্ডলা রচনা সম্পূর্ণ হয়।

অনতিবিলম্বে তাহাদের দ্বারাই পরিত্যক্ত হইবেন, আর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে ঊষর বালিয়াড়ি আর ভীষণ অরণ্যানী বা তদপেক্ষা ভয়ঙ্কর শবাসন কাপালিক। বাস্তবিক প্রকৃতি যেখানে ভৈরবী মূর্ত্তিতে সপ্রকাশ সেখানে কোন এক Magician Prosperoর কল্পনা না করিয়া—

'রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগাঃ
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্রস্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্'।

যাঁহাকে বলা যায়, সেই জগন্মাতার সংহারমূর্ত্তির উপাসক কাপালিকের কল্পনা যথোপযুক্ত বটে।

(কিন্তু প্রকৃতির বৈরিতার সহিত প্রকৃতিজয়ের অত্যুগ্র সাধনার ছবিকে পটভূমি হিসাবে আঁকিয়া বঙ্কিম তাঁহার কাপালিক-প্রতিপালিতা কাননবাসিনী যে নায়িকাকে লোক-লোচনের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, সে শ্বাপদভূমে হরিণীর মতই স্বচ্ছন্দচারিণী ও আয়তলোচনা হইলেও, তাহার "বিশাল-লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ম্ময়" এবং আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া ও গম্ভীরনাদী বারিধির সহিত তাহার মোহিনী শক্তি একই সুরে বাঁধা।)

কাপালিকের আশ্রয়ে দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্লে সমুদ্র-তীরে অন্য মনে কাটাইয়া সায়াহ্নে কুটীরাভিমুখী নবকুমার যখন প্রদোষতিমিরে পথহারা, তখনই 'পথিক, তুমি পথ

হারাইয়াছ ?' প্রশ্ন লইয়া ঐ মোহিনী নারীর প্রথম আবির্ভাব এবং পথ দেখাইয়া তাহার অন্তর্দ্ধান। সে দ্বিতীয়বার দেখা দিল পরদিন সন্ধ্যালোকে যখন কাপালিকের নির্দ্দেশ মত তাহার অনুসরণ করিয়া নবকুমার যাইতেছিল পূজার বা বলির ক্ষেত্রে। তখন অতর্কিতে আসিয়া নবকুমারকে বারবার কাপালিকের অনুগমন করিতে নিষেধ করিয়া পলায়নের উপদেশ শুধু দিল না, পূজার স্থল হইতে বলির খড়্গ স্থানান্তরিত করিয়া কাপালিককে তাহার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিল এবং সেই অবসরে নবকুমারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার পলায়নের পথপ্রদর্শকরূপে তাহাকে দূরস্থিত কালী-মন্দিরের সেবাধিকারীর আশ্রয়ে পৌঁছিয়া দিল। ইহাতে বিপন্ন নবকুমারের প্রতি তাহার সহজাত দয়ার যে পরিচয় আমরা পাই তাহা কাননকান্তারের অপ্রত্যাশিত ঝর্ণাধারার মতই মনোরম, কিন্তু ইহা মানুষের প্রতি মানুষের সেই স্বাভাবিক দয়া বা সহানুভূতির প্রকাশ মাত্র যে স্বভাবজ-দয়ায় মিরণ্ডা তাহার পিতাকে Tempestএর সূচনায় ঝঞ্ঝা নিবারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল,১ নতুবা, ইহা যে

---

১ 'If by your art, my dearest father, you have
Put tho wild waters in this roar, allay them.
. . . . . . . . . . . O, I have suffer'd
With those that I saw suffer !
. . . . . . . . . . . O, the cry did knock
Again my very heart ! Poor souls they perish'd !'
Tempest : A. I. Sc. II.

ফার্ডিন্যাণ্ডের প্রতি মিরণ্ডার প্রথম দর্শনে প্রণয়সঞ্চারের মত কিছু নহে অধিকারীর আশ্রয়ে নবকুমারকে রাখিয়া কপালকুণ্ডলার সমুদ্রতীরে প্রত্যাগমনের উদ্যোগেই তাহা সুস্পষ্ট। অতএব যাঁহারা সমুদ্রতীরে প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই নবকুমারের প্রতি কপালকুণ্ডলার অনুরাগ সঞ্চারের কল্পনা করিয়াছেন বা করেন বঙ্কিমের বর্ণনায় তাঁহাদের সে কল্পনার ভিত্তি নাই। আর, যাঁহারা কপালকুণ্ডলাকে Tempestএর আদর্শে রচিত গ্রন্থ মনে করেন এবং কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে মিরণ্ডার অনুকরণ দেখেন তাঁহারা যে কতদূর ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন তাহাও এখানে অনুধাবনযোগ্য। মিরণ্ডা সংস্কারে নারী, সে হৃদয় দিতে এবং নিতে চায়। কপালকুণ্ডলা সে সংস্কারশূন্য, সে আকাঙ্খামুক্ত। মিরণ্ডা আশৈশব জনহীন দ্বীপবাসিনী হইলেও তাহার পিতা যে নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে অভিজাত সম্প্রদায়ের সুমার্জ্জিত সামাজিক জীবনযাপন করিতেন এবং নিজেও সুশিক্ষিত সংস্কৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এমন পিতার পুঞ্জীভূত স্নেহ ও কোমল ব্যবহারের প্রভাবে মিরণ্ডার হৃদয় নারীহৃদয় হইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কপালকুণ্ডলা একদিকে সংহাররূপিণী প্রকৃতি লালিত, ইংরাজীতে যাহাকে বলে nursed by "nature red in tooth and claw", অন্যদিকে অত্যাশ্রমী ভৈরবী-উপাসকের ঐকান্তিক ভক্তি সহকৃত নির্ম্মম সাধনার ক্ষেত্রে পালিত,

বর্দ্ধিত[১]। অধিকারীর শিষ্যা হিসাবেও ভবানীর প্রতি ভক্তি ব্যতীত অপর কোন মধুর রসে নিষিক্ত বা অনুপ্রাণিত হইবার সুযোগ-সৌভাগ্য কোন দিন তাহার হয় নাই, কেবল কাপালিকের অতিনিষ্ঠুর আচরণের প্রতিক্রিয়ারূপে বিপন্ন মানুষের প্রতি তাহার যে সহজাত করুণার উদ্রেক হইত, সেইরূপ করুণার বশেই সে নবকুমারের জীবনরক্ষার সহায়তা করিয়াছিল, নতুবা নবকুমারের প্রতি কোন অনুরাগের প্রভাবে কাপালিকের কবল হইতে নবকুমারের উদ্ধার সাধন করে নাই।

তবে যে সে নবকুমারকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল? সে অনুরাগ বা আসক্তির জন্য নহে, বিবাহের তাৎপর্য্য বুঝিয়াও নহে, অধিকারীর অনুরোধে, আর কাপালিকের ভবিষ্যৎ ব্যবহার সম্বন্ধে যে গভীর আশঙ্কা অধিকারী তাহার মনে জাগাইয়া দিয়াছিল দেশান্তরে গিয়া সেই আশঙ্কা মুক্ত হইতে পারিবে বলিয়া। যে ভাবে কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় গ্রন্থকার তাহার নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন—

"নবকুমার শয়ন করিলে, কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। অধিকারী তাঁহার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—

---

১ অতএব কপালকুণ্ডলা চরিত্র বুঝিবার জন্য **Rousseau** বা **Wordsworth** এর বাণী উদ্ধার করা নিষ্ফল।

'যাইও না। ক্ষণেক দাঁড়াও, এক ভিক্ষা আছে'।

কপালকুণ্ডলা। 'কি'?

অধিকারী। 'তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত মা বলিয়া থাকি, দেবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতে পারি যে, মাতার অধিক তোমাকে স্নেহ করি। আমার ভিক্ষা অবহেলা করিবে না'?

কপালকুণ্ডলা। 'করিব না'।

অধিকারী—'আমার এই ভিক্ষা, তুমি আর সেখানে ফিরিয়া যাইও না'।

কপালকুণ্ডলা—'কেন'?

অধিকারী—'গেলে তোমার রক্ষা নাই'।

কপালকুণ্ডলা—'তা ত জানি'।

অধিকারী—'তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন'?

কপালকুণ্ডলা—'না গিয়া কোথায় যাইব'?

অধিকারী—'এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও'।

কপালকুণ্ডলা নীরব হইয়া রহিলেন। অধিকারী কহিলেন,—'মা, কি ভাবিতেছ?'

কপালকুণ্ডলা—'যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে যে, যুবতীর এরূপ যুবাপুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত; এখন যাইতে বল কেন'?

অধিকারী—'তখন তোমার জীবনের আশঙ্কা করি নাই, বিশেষ যে সদুপায়ের সম্ভাবনা ছিল না এখন সে সদুপায় হইতে পারিবে'।"......" 'তুমি বলিতেছ এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণসন্তান, গলাতেও যজ্ঞোপবীত আছে দেখিতেছি। এ যদি তোমাকে

বিবাহ করিয়া লইয়া যায় তবে সকল মঙ্গল। নচেৎ আমি তোমাকে ইহার সহিত যাইতে বলিতে পারি না।

"বি-বা-হ!" এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, 'বিবাহের নাম ত তোমাদের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু বিবাহ কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?'

অধিকারী ঈষন্মাত্র হাস্য করিয়া কহিলেন,—'বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান, এইজন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে, জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা'।

অধিকারী মনে করিলেন সকলই বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন সকলই বুঝিলেন। বলিলেন,—

'তাহাই হউক। কিন্তু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন।' অধিকারী—'কি জন্য প্রতিপালন করিয়াছে, তাহা জান না।' এই বলিয়া অধিকারী তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ তাহা অস্পষ্ট রকম কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কপালকুণ্ডলা তাহা কিছু বুঝিল না। কিন্তু তাহার বড় ভয় হইল। বলিল 'তবে বিবাহই হউক'।"*

উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহ একেবারেই রাগানুগ মিলন ( Love-match ) নহে। দেখিলাম যে 'বড় ভয়ে' পড়িয়া, বিবাহের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া, নবকুমারের সহিত মিলিত হইয়া

---

* ১।৮।২৩, ২৪ পৃঃ।

কপালকুণ্ডলা দেশান্তরে যাইতে সম্মত হইল। নতুবা তাহার পরিচিত বনভূমি, এমন কি প্রতিপালক কাপালিককে, ছাড়িয়া যাইতে তাহার মন সরিতেছিল না। বনের হরিণী বা মুক্তপক্ষ বিহঙ্গী সে কেন বন্ধনরজ্জু বা লৌহপিঞ্জর বরণ করিবে?

শুধু তাহাও নহে। অতীত বা বর্ত্তমানের সহিত মায়া কাটাইতে অনিচ্ছার উপরে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক নূতন আশঙ্কা উপস্থিত হইল।

"যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা কালীপ্রণামার্থ গেলেন। ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটি অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি পড়িয়া গেল।

কপালকুণ্ডলা নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা। বিল্বদল প্রতিমা-চরণচ্যুত হইল দেখিয়া ভীত হইলেন; অধিকারীকে সংবাদ দিলেন। অধিকারীও বিষণ্ণ হইলেন। কহিলেন,—

'এখন নিরুপায়। পতিমাত্র তোমার ধর্ম্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। অতএব নিঃশব্দে চল'"।[১]

কপালকুণ্ডলা নিঃশব্দে সাশ্রুনয়নে তাহার জীবনের প্রথম অধ্যায় শেষ করিল এবং নিরুৎসাহে সশঙ্কচিত্তে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। বনলক্ষ্মীর মানা না মানিয়া সে স্বামীর ঘর করিতে নগরে চলিল বটে কিন্তু সম্মুখের, অপরিচিতের, আহ্বান অপেক্ষা পশ্চাতের, পরিচিতের, আকর্ষণই বড় হইয়া রহিল।

---

[১] কপালকুণ্ডলা : ১।৯ পরিচ্ছেদ।

পরে স্বামিগৃহে যাইবার পথে গ্রন্থকারের বিস্ময়কর লিপিচাতুর্য্যে এমন একটি ঘটনা ঘটিতে দেখিলাম যাহাতে বনচারিণীর বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল। মতিবিবির প্রদত্ত সমস্ত বহুমূল্য অলঙ্কার কপালকুণ্ডলা এক ভিখারীকে সহজেই বিলাইয়া দিল [১]। ইহা কপালকুণ্ডলার দয়াপ্রবণতার পরিচয় হইলেও আভরণের এমন অনাদর লোকালয়ে লালিত-বর্দ্ধিত কোন নারীতে সম্ভব নহে। [২] কিন্তু যে নারী কাহাকেও আকর্ষণ করিতে চাহে না অলঙ্কার যে তাহার নিষ্প্রয়োজন ইহাই বর্ণিত ঘটনার ব্যঞ্জনা।

নবকুমার স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলে এবং তাহার স্বজনগণ কপালকুণ্ডলাকে সাদরে গ্রহণ করিলে পর নবকুমারের 'প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল', কিন্তু কপালকুণ্ডলার তেমন কিছু ভাবান্তর হইল না। তাহার অননুরাগ ও অনাসক্তি প্রায় পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। নবকুমারের প্রণয়নিবেদন কোন প্রতিধ্বনিই জাগাইল না, গৃহে সে আলুলায়িতকুন্তলা যোগিনী, সংসারে সে অসংসারীই, হইয়া রহিল। নবজীবনে আকর্ষণ নাই, উৎসাহ নাই—'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' নির্লিপ্ত ভাব—বরং ভবিষ্যতের আশঙ্কায় পরিম্লান। ননদ শ্যামাসুন্দরীর কথার উত্তরে 'অবরোধে অতৃপ্ত' মৃণ্ময়ী একদিন বলিতেছে—

" 'ভাল, বুঝিলাম। পরশপাথর ছুঁয়েছি, সোণা হলেম। চুল বাঁধিলাম; ভাল কাপড় পরিলাম, খোঁপায় ফুল দিলাম; কাঁকালে

১ : ২।৪ পরিচ্ছেদ।

২ আশ্রমবাসিনী শকুন্তলারও আভরণের প্রয়োজন হইয়াছিল।

চন্দ্রহার পরিলাম, কাণে দুল দুলিল ;'...'সোণার পুতলি পর্য্যন্ত হইল। মনে কর সকলই হইল। তাহা হইলেই বা কি সুখ' ?

শ্যামা—'বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ' ?

মৃণ্ময়ী—'লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি' ?

* * * *

শ্যামা—'তবে শুনি দেখি তোমার সুখ কি' ?

মৃণ্ময়ী—'বলিতে পারি না। বোধ করি সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে'।"[১]

মহাসমুদ্রের সুদূর আহ্বান, অরণ্যানীর আকর্ষণ, স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের বাসনা তখনও কত প্রবল ! অবশ্য বৎসরাধিক কাল গত হইলে নূতন পরিবেষ্টনের নিত্য প্রভাবে কপালকুণ্ডলার কিছু পরিবর্ত্তন হইল বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কেশবাসে, অঙ্গরাগে, বাহ্য ব্যাপারে। কিন্তু নবকুমারের ভালবাসার জোয়ারে কপালকুণ্ডলার মনের গতি সম্পূর্ণ ফিরিল না, তাহার ভাবের স্রোত উজানে বহিল না, অন্তরের অন্তরে সে সাগরাভিমুখী একটানাই রহিয়া গেল। নবকুমারের গৃহান্তিকের বনরেখা যেন সাগরতীরের অরণ্যভূমির আমন্ত্রণ প্রতি অবকাশেই জানাইতে লাগিল। আর, একাকী নৈশ ভ্রমণ, বনে বিচরণ, সামাজিক ব্যবহার অস্বীকার করিয়া স্বচ্ছন্দ গতিবিধি যতদূর সম্ভব চলিতে লাগিল। যতদূর সম্ভব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে গৃহস্থ হইয়া গৃহীর ব্যবহার সম্পূর্ণ উপেক্ষা, সমাজমধ্যে আসিয়া সমাজনীতির সম্পূর্ণ

১ ২।৬ পরিচ্ছেদ।

অবহেলা ত একেবারে সম্ভব নহে। কাজেই নূতন পরিবেশের প্রভাব অনিচ্ছাক্রমে কপালকুণ্ডলার যতই মানিতে হইতে লাগিল অবরোধে অপ্রীতি ততই বাড়িতে লাগিল। শেষে এই সিদ্ধান্ত হইল যে 'যদি জানিতাম স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না'।* পক্ষান্তরে নবকুমারের ভালবাসা বিনিময়-অভাবে ও ব্যর্থতার উপলব্ধিতে যে অশ্রুময় হইয়া উঠিতে লাগিল না তাহাই বা কে বলিবে? কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের গার্হস্থ্য জীবনে এই ঘনায়মান বেদনার সুদীর্ঘ বর্ণনা গ্রন্থকার না করিলেও ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট।

প্রকাশ্য মিলনের ক্ষেত্রে অন্তরের ব্যবধানজনিত এই গোপন বেদনার পরিমাণ যে কত, নবকুমারের প্রেমের গভীরতা ও গৌরবের দ্বারাই তাহার উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তাহা বুঝাইবার জন্যই মতিবিবি চরিত্রের সৃষ্টি। গ্রন্থ-মধ্যে মতিবিবির ও নবকুমারের এক প্রকার প্রথম সাক্ষাতেই† দেখিতে পাই মতিবিবির পরিপূর্ণ যৌবনের প্রখর দীপ্তি বা কুণ্ঠাহীন মার্জ্জিত মুখরতা নবকুমারের বিস্ময় জাগাইলেও তাহার কপালকুণ্ডলাপ্রীতির কোনরূপ বিপ্রকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। সে সাক্ষাৎ বরং মতিকেই অননুভূতপূর্ব্ব নূতন রসের সন্ধান দিয়া তাহার হৃদয় বিগলিত করিল। নতুবা তাহার দীর্ঘশ্বাস বা অশ্রুজল নবকুমারের

* Ibsen এর Nora অন্যভাবে এইরূপ ধারণায় উপনীত হইয়াছিল।

† ২।২ পরিচ্ছেদ।

হৃদয়মুকুরে কোন রেখাপাতই করিল না। তখন না হয় কপালকুণ্ডলার প্রতি নবানুরাগের প্রথম উচ্ছ্বাস। কিন্তু বৎসরাধিককাল পরে, সমগ্র হৃদয় দিয়া ভালবাসিয়াও কপালকুণ্ডলার মনোহরণ করা যখন সম্ভব হইল না, অথচ পুঞ্জীভূত ব্যর্থ ভালবাসায় ভারাক্রান্ত নবকুমার বসনাগ্রধৃতা লুৎফ্-উন্নিসার প্রণয় নিবেদন[১] অথবা চরণাশ্রিতা লুৎফ-উন্নিসার কাতর মিনতি[২] উপেক্ষা করিতে পারিল, তখন তাহার কপালকুণ্ডলাপ্রীতির একাগ্রতা ও গভীরতা, মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য যেমন অস্বীকার করা যায় না তেমনই যতটা স্বীকার করা যায় ততটাই তাহার মনোবেদনার পরিমাপ হইয়া দাঁড়ায়।

অথচ মতিবিবির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য্য আখ্যায়িকার এই বিশেষ প্রয়োজন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সে কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের অনুরাগের একাগ্রতা ও দৃঢ়তা পরীক্ষার উপনায়িকায় মাত্র পর্য্যবসিত হয় নাই—সম্পূর্ণ বিভিন্নবর্ণবিরঞ্জিত কপালকুণ্ডলার প্রতিযোগিচিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে, পাঠক এক অপূর্ব্ব study in contrast বা রসবৈচিত্র্য আস্বাদনের সুযোগ পাইয়াছে। কপালকুণ্ডলা

১ "ধন, সম্পদ, মান, প্রণয়, রঙ্গ, রহস্য, পৃথিবীতে যাহাকে সুখ বলে, সকলই দিব ; কিছুই তাহার প্রতিদান চাহি না ; কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরব চাহি না, কেবল দাসী"।

২ "নির্দ্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমি আমায় ত্যাগ করিও না।" (৩।৬।৬৪-৬৫ পৃঃ)।

সাগরতীরের গহনবনের বনবালা, মতিবিবি মহানগরীর বিলাসকেন্দ্রের নাগরিকা। কপালকুণ্ডলা কাপালিক ও অধিকারীর ধর্ম্মজীবনের অংশভাগিনী, একান্ত ভক্তিমতী। মতিবিবি ধর্ম্মভ্রষ্ট পিতার সঙ্করশিক্ষায় পরিমার্জ্জিতা, পারসিক, সংস্কৃত, নৃত্যগীত, রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা, সুখান্বেষী। কপালকুণ্ডলা অনন্তের সুরে অনন্যমনা, সংসারে স্বামীতেও তাহার অনাসক্তি; আর মতিবিবি পুষ্পে পুষ্পে বিহারিণী, অতএব 'বিবাহে অননুরাগিণী'। একজনে প্রমূর্ত্ত বৈরাগ্য, অপরে মূর্ত্তিমতী রিরংসা। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় নারীর অভিমান উভয়েরই কাব্যজীবনসঙ্কটে গতিপরিবর্ত্তনের সহায়তা করিল। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের অবিশ্বাস কল্পনা করিয়া গার্হস্থ্যজীবনে একেবারে বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল, আর মতিবিবি 'এক মৃণালে দু'টি কমল ফুটে না' বলিয়া বাদসাহের সিংহাসনছায়া ছাড়িয়া আসিল। জীবনের গতি পরিবর্ত্তনের মূল কারণ অবশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একজনের আসিল অবরোধে, সংশয়ে অতৃপ্তিক্ষেত্রে, অনন্তের বা বিশ্বমাতৃকার আহ্বান, অপরের জাগিল কামসুখান্বেষণের ব্যর্থতাজনিত প্রেমাকাঙ্ক্ষা। আর, এই দুর্জ্জয় বৈরাগ্য ও দুর্ব্বার অনুরাগের আবর্ত্তে পড়িয়া নবকুমার অতলে তলাইয়া গেল।

কিন্তু এইখানে প্রশ্ন উঠে কপালকুণ্ডলার অসংসারী চরিত্রে বঙ্কিম এমন কি রসপূর দিয়াছেন যাহাতে সংসারী আমাদের সহানুভূতি বরাবরই আকৃষ্ট থাকে এবং পরিণামে আমাদের

অশ্রু আকর্ষণ না করিয়াও যায় না? কপালকুণ্ডলার অনাসক্ত চরিত্রের অন্তরে বঙ্কিম এমন কি মধু নিহিত রাখিয়াছেন যাহাতে আমরা 'আদাবন্তে চ মধ্যে চ' তাহার সরসতা উপলব্ধি করি এবং চৈত্রবায়ুর প্রমত্ত আঘাতে এই বনমল্লিকার ঝরার ক্ষণেও আমাদের মনোভৃঙ্গ বেদনার বশে গুঞ্জরিয়া উঠে? আর্তের প্রতি উদার সহানুভূতি ও নারীহৃদয়সুলভ দয়াপ্রবণতাই সেই অমৃতকণা। পথহারা নবকুমারকে পথপ্রদর্শনে, বলিক্ষেত্রস্থ নবকুমারের উদ্ধারে, পথের ভিখারীকে অলঙ্কার বিতরণে, নবকুমারের বাধা না মানিয়া গভীর রাত্রে একাকিনী বনে গিয়া শ্যামাসুন্দরীর স্বামিবশীকরণের ঔষধি অন্বেষণে, লুৎফ্-উন্নিসার অনুরোধে বনবাস পুনরঙ্গীকারে, তাহার করুণাকোমল হৃদয়ের পরোপকার প্রবৃত্তির পুনঃ পুনঃ পরিচয় পাই। এমন কি তাহার জীবনের চরম দিনে যখন ভৈরবীচরণে আত্মসমর্পণের জন্য চলিয়াছে তখনও শুনি শ্মশানে নবকুমারকে কম্পিত কলেবর দেখিয়া পরদুঃখে বিগলিত রমণীকণ্ঠে শুধাইতেছে 'কাঁপিতেছ কেন? কাঁদিবে কেন?' 'গৃহে যাও,' 'আমার জন্য রোদন করিও না'। সকল অবস্থাতেই কপালকুণ্ডলার হৃদয়বীণার অন্তর্নিহিত করুণার ধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়া বঙ্কিম যেন বলিতে চাহিয়াছেন নারীহৃদয়ের সহজাত প্রবৃত্তি দয়া।

তবুও ইহা মানিতে হইবে যে এই পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত দয়ার সুর কপালকুণ্ডলাচরিত্রে যত মাধুর্য্য দান করুক না কেন, আখ্যায়িকার মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় কপালকুণ্ডলার সহজাত

সংস্কার নহে, পরন্তু পরিবেশপ্রভাবে গঠিত চরিত্র। এই 'নির্ম্মিত' চরিত্রের সূচনা যেমন অপূর্ব্ব, বিকাশ তেমনই বিস্ময়কর, অথচ কোথাও ইহার ঐক্যভঙ্গ হইতে দেখা যায় না। পরন্তু ইহার সমাপ্তি সূচনার সহিত সুসঙ্গত, এমন কি তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলিয়াই মনে হয়। অনন্ত সাগর অসীমের সুরে, অরণ্য ও সৈকত অনিয়ন্ত্রিত গতিচ্ছন্দে, কাপালিক ও অধিকারী ঐকান্তিক ভক্তিমন্ত্রে, যাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে সে যে অবরোধে অসহিষ্ণু ও বিধিনিষেধপূর্ণ সমাজজীবনে বিতৃষ্ণ হইবে, এমন কি সামাজিক ও গৃহী মানুষের সংস্পর্শে বিরক্তি বোধ করিবে এবং ব্যথা পাইলে বিশ্বমাতার বুকে ছুটিয়া যাইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। অতএব যে একদিন দয়ার বশে নবকুমারকে কাপালিকের বলিক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, সে যখন বুঝিল নবকুমারের প্রেম তাহাকে আশ্রয় করিয়া পীড়িতই হইতেছে, লুৎফ্-উন্নিসার আসক্তি, অনুরাগ বা স্বামিমিলনাকাঙ্ক্ষা তাহার অন্তরের অগোচর বস্তু, সর্ব্বোপরি তাহার শৈশবের পালক ও যৌবনের সঙ্গী উভয়েই তাহার বধের সঙ্কল্প করিতে পারিয়াছে, তখন বিশ্বমাতৃকার আহ্বানে আত্মবলি দিয়া অনন্তে মিলাইয়া যাওয়া তাহার জীবনের 'অতর্কিত' নহে, পরন্তু স্বভাবসঙ্গত ও সুসম্ভাবিত পরিসমাপ্তি।*

* অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কপালকুণ্ডলার জীবনের পরিসমাপ্তি 'অতর্কিত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ( বিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত 'বঙ্কিম-প্রতিভা' ৬১ পৃ )।

পক্ষান্তরে নবকুমার মানুষের সমাজে লালিত বর্দ্ধিত— সংসারী ও গৃহী। সে শিক্ষিত, শাস্ত্রদর্শী, ভাবুক ও পরোপকারী। গল্পারম্ভেই, কপালকুণ্ডলার সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বেই, গ্রন্থকার তাহার সে পরিচয় দিয়াছেন। সমাজবদ্ধ গৃহী মানুষের যুগযুগান্তরের ভাবনাসাধনালব্ধ কৃষ্টির ও মনোভাবের সে অধিকারী। সে কালিদাসের মহাকাব্যের শ্লোক উদ্ধার করে, শাস্ত্রের মর্ম্ম বোঝে, পরোপকারে চিরপ্রবণ। হিমবর্ষী আকাশতলে বনান্তিকে বালিয়াড়ির পার্শ্বে বসিয়া, অথবা কাপালিকের সাধনক্ষেত্রে আসন্ন বলির সম্ভাবনার মধ্যে, তাহার স্বদেশের, গৃহের, কথাই মনে পড়ে। অথচ কাপালিকের কবল হইতে কপালকুণ্ডলার ঐকান্তিক সাহায্যে উদ্ধারলাভের পরেই অধিকারী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন কপালকুণ্ডলার প্রাণরক্ষার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন কিনা, তখনই নবকুমার উত্তর করিলেন 'আমি এখন সঙ্কল্প করিতেছি যে, আমি সেই নরঘাতকের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া আত্মসমর্পণ করি। তাহা হইলেই ইহার রক্ষা হইবে।' নবকুমারের মত উত্তরই বটে। একটি নারীর জীবন বিপন্ন করিয়া তিনি নিজের জীবন রক্ষা করিবেন? কিন্তু অধিকারী যখন সে বিফল চেষ্টা অবিহিত বলিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন তখন নবকুমার সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। কেন? আকর্ষণের অভাবে নহে— সাগরতীরে সন্ধ্যালোকে প্রথম সাক্ষাতের সহানুভূতিসূচক

প্রশ্নেই ত তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছিল; কৃতজ্ঞতার অভাবেও নহে—তাঁহার 'প্রাণরক্ষয়িত্রীর জন্য কোন কার্য্য অসাধ্য নহে'—শুধু কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অর্থাৎ তিনি বিবাহ করিলেও এই অজ্ঞাতকুলশীলা নারী তাঁহার পত্নীরূপে তাঁহার স্বদেশে, স্বপরিবারে, সমাদর লাভ করিবে কি না এই চিন্তায়। সমস্ত রাত্রির জাগ্রতচিন্তার ফলে যখন স্থির করিলেন যে কপালকুণ্ডলার জন্য আবশ্যক হইলে সংসার ত্যাগ করিবেন তখনই বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। অতএব স্বগৃহে পৌঁছিয়া যখন কপালকুণ্ডলার অনাদর আশঙ্কা দূর হইল তখন 'নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল', কিন্তু বেলাতিক্রম করিল না। বরং 'যেখানে চাপল্য ছিল সেখানে গাম্ভীর্য্য জন্মিল,' আর হৃদয় প্রসন্ন ও জগৎ মধুময় হইল। এই সুগভীর প্রেম কিন্তু আপনাতেই আপনি সার্থক হইয়া রহিল। ইহার উপযুক্ত মর্য্যাদা ত পাইলই না বরং বিনিময়ে পাইতে লাগিল উত্তরোত্তর কপালকুণ্ডলার বিবাহিত জীবনে বিরক্তি।

এই বিড়ম্বনার দিনে যখন কপালকুণ্ডলা বলিতে চায় 'বিবাহ এত দাসীত্ব জানিলে কখনও বিবাহ করিতাম না' তখন লুৎফ্-উন্নিসা 'ধন, সম্পদ, মান, প্রণয়, রঙ্গ, রহস্য, পৃথিবী যাহাকে সুখ বলে সকলই' দিবার প্রতিশ্রুতি জানাইয়া এবং পত্নীত্বের গৌরবও নহে 'কেবল দাসী' হইবার প্রার্থনা মাত্র জানাইয়া উত্তর পাইল, 'ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব,

তোমার দত্ত ধন-সম্পদ লইয়া যবনীজার হইতে পারি না' আবার, বসনাগ্র ধরিয়া যখন মিনতি জানাইল 'ভাল, আর কিছু চাহি না, এক একবার তুমি এই পথে যাইও, দাসী ভাবিয়া এক একবার দেখা দিও, কেবল চক্ষুপরিতৃপ্তি করিব' তখনও প্রত্যুত্তরে শুনিল 'তুমি যবনী—পরস্ত্রী—তোমার সহিত এরূপ আলাপেও দোষ, তোমার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না।' লুৎফ্-উন্নিসার পদ্মাবতী পরিচয় পাইয়াও 'অন্যমনে কিছু শঙ্কান্বিত হইয়াও' যে নবকুমার চলিয়া গেল, এ কি শুধু তাহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা? এ কি শুধু অধর্ম্মে অপ্রবৃত্তি? ইহার পিছনে আরও যে মর্ম্মবিকানো বস্তু রহিয়াছে তাহা অন্ততঃ লুৎফ্-উন্নিসার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই ইহার দুই দিন পরেই কপালকুণ্ডলার নির্ব্বাসনের জন্য লুৎফ্-উন্নিসার অভিযান।

চরম দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিল, কিন্তু সে কি নবকুমারের আচরণে? না। শ্যামাসুন্দরীর জন্য বনৌষধি তুলিতে কপালকুণ্ডলাকে রাত্রে একাকিনী যাইতে নবকুমার নিষেধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কোন দুর্ব্বল সন্দেহে নহে ('তিনি একদিবসের তরে সন্দেহকে স্থান দান করেন নাই' [১]), 'স্নেহঃ পাপমাশঙ্কতে' বলিয়া, কপালকুণ্ডলারই অনিষ্ট আশঙ্কায়। শ্যামাসুন্দরীর পূর্ব্ব কথায় বিতৃষ্ণ কপালকুণ্ডলাই সন্দেহের অলীক অভিযোগে নবকুমারকে তিরস্কার বা আঘাত

---

১ ৪।৫।৮০ পৃঃ।

করিল।[১] তাহার পরে প্রকৃতই সংশয় আসিল, তাহা দৃঢ়ও হইল, কিন্তু কেমন করিয়া? কপালকুণ্ডলার কবরীচ্যুত ব্রাহ্মণবেশীর পত্রে লিখিত কথায় এবং কাপালিকের মিথ্যা বর্ণনায়, ('স্বচক্ষে দেখিলাম কপালকুণ্ডলার সহিত এক ব্রাহ্মণকুমারের মিলন হইল'[২]) আর, ব্রাহ্মণবেশীর সহিত কপালকুণ্ডলাকে নিভৃতে এবং ঘনিষ্ঠভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া।

কিন্তু তবুও অতিমাত্র মর্ম্মাহত নবকুমারের পক্ষে সজ্ঞানে কপালকুণ্ডলাকে বধভূমিতে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইত না। সংস্কৃতি বা শীলতাসম্পন্ন সকল মানুষই যে চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ উপস্থিত হইলেই explode বা অসংযত আচরণ করে তাহা নহে। নবকুমার প্রেমে অচঞ্চল, সংযত আচরণে অভ্যস্ত, হঠকারী হেমচন্দ্র নহে। তাই নবকুমারের স্রষ্টাকে কাপালিকের 'প্রচণ্ড তেজস্বিনী সুরার' সৃষ্টি করিতে হইল। অত্যুগ্র সুরার প্রভাবে নবকুমার কাপালিকের প্রদর্শিত পথে শ্মশানাভিমুখে কপালকুণ্ডলাকে লইয়া চলিলেন। প্রেতভূমে নদীতীরে আসিয়া সুরার প্রভাব মন্দীভূত হইলে কপালকুণ্ডলা ও কম্পিতকলেবর নবকুমারের মধ্যে যে শেষ কথোপকথন

---

১ "কপালকুণ্ডলা গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, 'আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।

নবকুমার আর কিছু বলিতে পারিলেন না। নিঃশ্বাসসহকারে কপালকুণ্ডলার হাত ছাড়িয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।" (৪।১।৭১ পৃঃ)।

২ ৪।৬।৮৩ পৃঃ।

**হইল এবং যাহাতে আগ্নেয়গিরির বিগলিত ধাতুস্রাবের মত নবকুমারের বিবাহজীবনের সমস্ত সঞ্চিত বেদনা উৎসারিত হইতেছে তাহা এইরূপ—**

"কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে কাঁপিতেছ কেন?'

নব। 'ভয়ে নহে। কাঁদিতে পারিতেছি না, এই ক্রোধে কাঁপিতেছি।'

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসিলেন, 'কাঁদিবে কেন?'

নবকুমার কহিলেন, 'কাঁদিব কেন? তুমি কি জানিবে মৃণ্ময়ি! তুমি ত কখনও রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই।' * * 'তুমি ত কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আস নাই।' এই বলিয়া সহসা নবকুমার চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন।

'মৃণ্ময়ি! কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।'

কপালকুণ্ডলা হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন—মৃদুস্বরে কহিলেন, 'তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই।'

* * * *

নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিলেন, 'চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব—বল—মৃণ্ময়ি। বল,—বল—বল আমায় রাখ।—গৃহে চল।'

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, 'যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিব। আজ যাহাকে দেখিয়াছ—সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি। এ কথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর

চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।'

'না—মৃণ্ময়ী—না—' এইরূপ উচ্চ শব্দ করিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন, কপালকুণ্ডলাকে আর পাইলেন না।' [১]

পাঠকের এখানে স্বতঃই মনে হইবে, হায়, নীড়ানুরক্ত গৃহী। হায়, 'Doll's House'এর অধিকারী। আর,

'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যম্।
অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে
মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ।' [২]

অতএব (অসংসারী ও সংসারী, স্বচ্ছন্দচারিণী ও সামাজিক, বিরজাভক্তি ও রাগাত্মক প্রেম, তাহাদের মিলনভূমি খুঁজিয়া পাইল না বলিয়াই কপালকুণ্ডলা বিয়োগান্ত কাব্য। নায়িকা ও নায়কের ভাবগত ও চরিত্রগত অনৈক্য তাহাদের বিচ্ছেদের জন্য যত দায়ী বাহ্য ঘটনা মিলনের তত বাধা সৃষ্টি করে নাই। ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে নবকুমারের অবিশ্বাস ঘটিবার পূর্ব্বেই 'ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবন সমর্পণ আদেশ করিয়াছেন' ধারণায় কপালকুণ্ডলা আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। আর, লুৎফ্-উন্নিসার (পদ্মাবতীর)

---

১ ৪।৯।৯২-৯৩ পৃঃ।

২ 'কালিদাস'—'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' ৬।৬০।

'প্রাণদান' ও 'স্বামিত্যাগ করিবার অনুরোধ শুনিবার পরে, 'কপালকুণ্ডলা পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন, কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না।' এমন কি 'অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায়' ও 'নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না।' কপালকুণ্ডলার স্রষ্টা সত্যই বলিয়াছেন 'এ সংসারবন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না'—কবি কল্পনায় সে বন্ধন যে জীবনে অঙ্গীকার করিয়াছিল মরণেও কিন্তু সে তাহা অস্বীকার করে নাই।

অতএব যাঁহারা বলেন কপালকুণ্ডলা 'নায়কহীন উপন্যাস' অথবা 'পাঠকের মুখ্য সহানুভূতি কপালকুণ্ডলাতেই নিবন্ধ সেইজন্য আমরা কপালকুণ্ডলাকে নায়িকা বলি, কিন্তু নবকুমারকে নায়ক বলিয়া স্বীকার করি না' [১] তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। নবকুমারকে আমরা 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিতাবলীর' [২] অন্যতম চরিত্র মাত্র মনে করিতেও প্রস্তুত নহি। সহযাত্রিগণের দুর্ব্ব্যবহার হইতে কপালকুণ্ডলার অনুমরণ পর্য্যন্ত গ্রন্থের আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনা যাহাকে আঘাত করিয়াছে, নায়িকা ও উপনায়িকার করুণা বা কামনার, অনাসক্তি বা আসক্তির মুখ্যপাত্ররূপে যে কেন্দ্রস্থ চরিত্র, চৈত্রবায়ু-বিতাড়িত তরঙ্গাভিঘাতে কপালকুণ্ডলার আশ্রয়ভূমির ও কপালকুণ্ডলার সহিত যাহার 'মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ'

---

১ অক্ষয়কুমার দাশগুপ্ত : 'বঙ্কিমচন্দ্র' ১২৫ পৃঃ।

২ গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী : 'বঙ্কিমচন্দ্র' ২য় ভাগ ৬৬ পৃঃ।

হইয়া গ্রন্থ সমাপ্তিতে পৌঁছিল, তাহাকে 'ক্ষুদ্র চরিত্র,' বা তাহার মহত্বপূর্ণ জীবনের বিয়োগান্ত কাহিনী যে আমাদের 'মুখ্য সহানুভূতি' আকর্ষণ করে না, কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? বনলতা কপালকুণ্ডলা গৃহাঙ্গনে রোপিত হইয়া শুকাইয়া গেল ইহা যেমন পাঠকের মনে আঘাত ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে, নবকুমারের গভীর প্রেমের ব্যর্থতা, তাহার উদার, উন্নত চরিত্রের আক্ষেপ ও বিয়োগান্ত পরিণাম যে তেমনই আঘাত বা সহানুভূতি আকর্ষণ করে না ইহাই বা কেমন করিয়া বলা যাইবে? বরং কপালকুণ্ডলার অসংসারী চরিত্র আমাদের বিশ্লেষণী বুদ্ধি বেশী আকর্ষণ করিলেও নবকুমারের প্রেমরসরক্তে রঞ্জিত হৃদয়বান চরিত্র সাধারণ-মানুষ-সুলভ সহানুভূতির অধিকতর দাবী করে বলিয়াই আমরা মনে করি। সমগ্র হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াও যে কপালকুণ্ডলার অনাসক্তি দূর করিতে পারিল না, তাহার অন্তরে শেষ পর্য্যন্ত কোন স্থানই অধিকার করিতে পারিল না, পক্ষান্তরে লুৎফ্-উন্নিসার অযাচিত প্রণয় যাহার চরিত্রকে খর্ব্ব করিতে না পারিয়া জীবনের অবলম্বন পর্য্যন্ত ঘুচাইয়া দিল, যে কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে নানা কারণে সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়াও অবশেষে ভুল বুঝিয়া সকাতর মিনতির পরিবর্ত্তে অন্তিমেও প্রত্যাখ্যানই পাইল, তাহার জীবন দিয়া প্রেমব্রত উদ্‌যাপনের চিত্র যদি পাঠককে সত্যই মুগ্ধ না করে তাহা হইলে বঙ্কিমের লেখনীর এই অত্যুদার সৃষ্টি ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হয়।

অথচ ইহা সত্য যে কপালকুণ্ডলার মহাকাব্যোচিত গৌরব ('epical value'[১]) সেইখানেই যেখানে নবকুমারের ন্যায় মহৎ চরিত্রের আপ্রাণ ভালবাসা তাহার পরিণাম ব্যর্থতায় অদৃষ্টের অক্ষমাকে মর্ম্মান্তিক করিয়া তুলিয়াছে।)

(নায়ক ও নায়িকা ব্যতীত কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে এমন আর একটি চরিত্র আছে যাহা আখ্যায়িকামধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প স্থান অধিকার করিলেও, এবং যাহার আবির্ভাব কেবল আদ্যন্তে হইলেও, যাহার প্রভাব সমগ্র কাব্যব্যাপী—ধূমকেতুর ন্যায় যাহার করাল দীপ্তি সমস্ত কাব্যাকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সঞ্চারিত—অর্থাৎ কাপালিকের চরিত্র। পালক পিতারূপে সে নায়িকার চরিত্রের যে স্থায়ী বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছে তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।[২] সে নিজে বীভৎস রসের প্রতিমূর্ত্তি হইলেও তাহার ঐকান্তিক সাধনার প্রভাবে কপালকুণ্ডলার মধ্যে যে ভবানীভক্তি ও সংসারবিমুখতা বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল গৃহসুখ বা বিবাহিত জীবন তাহার কোন ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে তাহার জন্য কাব্যকাহিনীর নব নব বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

---

১ 'Epical value'—কথাটি R. L. Stevenson যে অর্থে 'Victor Hugo's Romances' প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছেন আমরা সেই অর্থেই এখানে ব্যবহার করিলাম।

২ George Eliotএর Eppieর উপরে Silasএর প্রভাব কিছু তুলনীয় হইলেও Eppieর সহিত কপালকুণ্ডলা চরিত্রের বা Silasএর সহিত কাপালিক চরিত্রের কোন তুলনাই সম্ভব নহে।

তাহার আশঙ্কায় কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের বিসদৃশ প্রকৃতির মিলন, তাহার অনুসরণ ও আবির্ভাবে, তাহার মন্ত্রশক্তি ও মন্ত্রণাবলে, উভয়ের বিচ্ছেদ ও বিয়োগ। লুৎফ্-উন্নিসা কপালকুণ্ডলার মৃত্যু পর্য্যন্ত না চাহিতে পারে, কিন্তু বিশ্বমাতার চরণে উৎসৃষ্ট যে নারী নরের ভোগ্য হইতে পারে সে ত কাপালিকের ধারণায় পাপিয়সী ও বধযোগ্য বটে। মাতৃপূজার পুষ্প কি না কামাঘ্রাণের বস্তু হইবে? যজ্ঞের হবি কি না কুক্কুরে লেহন করিবে? সংহৃতিরূপার নৃশংস সাধক সে কেমন করিয়া তাহা ঘটিতে দিবে? অতএব যদি অনেক চেষ্টায় পলায়িত বা অপহৃত বলির পশুর সন্ধান মিলিয়াছে তবে তাহার বিকৃত কল্পনায় মহাকালীর অভীষ্ট বলিয়া যাহা বুঝিয়াছে তাহাকে তাহা পূরণ করিতে হইবে। নবকুমারকে প্রমত্ত করার জন্য মিথ্যা ভাষণ, প্রবঞ্চনা, সুরাদান, সমস্তই সে তাহার কর্ত্তব্য মনে করিয়াছে। অবএব তাহার অব্যর্থ শরসন্ধান এবং একই শরাঘাতে উভয়ের মৃত্যু।

অদৃষ্টের নির্ম্মম প্রণিধি; তাহার ভয়াবহ বাণী, 'ভৈরবী প্রেরিতোঽসি', শুধু গ্রন্থের সূচনায় নহে, সমাপ্তিতে পর্য্যন্ত যেন সমভাবেই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কপালকুণ্ডলার বনবাসে ফিরিবার আকাঙ্ক্ষা বা কল্পনা, পদ্মাবতীর স্বামিলাভের আকূতি, নবকুমারের কপালকুণ্ডলা লাভের প্রচেষ্টা সবই ব্যর্থ হইয়াছে—কেবল গ্রন্থশেষে চকিত বিস্ময়ে আমরা দেখিতে পাই কাপালিকের বলির সঙ্কল্পই প্রকারান্তরে অপ্রত্যাশিত

সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। L' Homme qui Rit এর Monsterটির মত কাপালিককে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নায়ক অবশ্য বলা যায় না—যদিও কেহ কেহ তাহাকে নায়ক বলিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই—কিন্তু Javert যেমন নায়ক না হইয়াও তাহার নির্ম্মম দৃঢ়সঙ্কল্পে Les Miserables উপন্যাসের পটভূমিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, Iago যেমন নায়ক না হইয়াও তাহার ক্রূর সঙ্কল্পে Othello নাটককে বিয়োগান্ত করিয়া তুলিয়াছে, কাপালিকও তেমনই কপালকুণ্ডলা কাহিনীটিকে চরমবিচ্ছেদে পৌঁছিয়া দিয়াছে। অবশ্য কাপালিকের বাণী সম্পূর্ণ বিভিন্ন—মায়িক মানবতাবাদের ( Humanismএর ) ব্যর্থতা ঘোষণা। )

# মৃণালিনী

# মৃণালিনী

( ১৮৬৯ * )

দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় মৃণালিনীর গল্পসৌধ ঐতিহাসিক ভূমিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইহার কোন মুখ্যচরিত্রই ঐতিহাসিক নহে। "মৃণালিনীতে রোম্যান্স 'দুর্গেশনন্দিনীর' অপেক্ষা বেশী হইলেও" ইহাতে বাঙ্গলার ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণের দুর্ব্বোধ্য ঘটনাকে সম্ভাব্য সীমার মধ্যে আনিয়া ঐতিহাসিক পটভূমিকা রচনার প্রয়াস সুস্পষ্ট। আর পাঠানদিগের বঙ্গবিজয়ের অস্পষ্ট ও বিস্ময়কর ঐতিহ্য অবলম্বনে কাহিনীর পটভূমিকা রচিত হওয়ায় মৃণালিনী ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া অভিহিত হয়। মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া বখ্‌তিয়ার খিল্‌জীর বঙ্গবিজয়ের লজ্জাকর কাহিনী বঙ্কিমের হৃদয়ে চিরদিন বেদনার সুরে বাজিয়াছে। ন্যায়দর্শন সম্পর্কীয়

---

* ১৮৬৭ সালের অগাষ্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র আলীপুরে বদ্‌লী হইয়া আসেন। আলীপুরে দশমাস মাত্র ছিলেন। "সেই দশমাসের ভিতর তিনি মৃণালিনী লিখিয়া শেষ করিলেন।" "১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মৃণালিনী প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে চলিয়া যান।" (শচীশচন্দ্র—'বঙ্কিমজীবনী' ১৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা)। মৃণালিনীর রচনাকাল সম্বন্ধে শচীশচন্দ্রের উক্তিতে সন্দেহের অবকাশ আছে। রচনার পরে দুই বৎসর মধ্যে মৃণালিনী প্রকাশিত না হইবার কারণ কি? ইহার সদুত্তর না থাকিলে বরং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে বঙ্কিম যে ছয় মাস ছুটী লইয়াছিলেন মৃণালিনী রচনা সেই ছুটীতে সমাপ্ত হয় এবং সেই অবকাশে কাশী যাওয়ার ও কাশী হইতে ফিরিয়া আসার পরে মৃণালিনী মুদ্রিত হয় মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

গ্রন্থসমালোচনা প্রসঙ্গেও তিনি না বলিয়া পারেন নাই "নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের অভ্যুদয়, নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়, কৃষ্ণচন্দ্রীয় সাহিত্যও নবদ্বীপের নামে খ্যাত—আর নবদ্বীপে সপ্তদশ পাঠানকৃত বঙ্গবিজয়"।[১]

কেমন করিয়া সপ্তদশ বা অষ্টাদশ অশ্বারোহীর সাহায্যে বখ্‌তিয়ারের পক্ষে রাজধানী নবদ্বীপ অতর্কিত আক্রমণ ও জয় করা সম্ভব হইয়াছিল আধুনিক ঐতিহাসিকগণও সে সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। "With allowable imagination" তাঁহারা এইটুকু মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে তুর্কী অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে বখ্‌তিয়ার তাঁহার অষ্টাদশ অশ্বারোহী দুই বা তিন দলে বিভাগ করিয়া নগরমধ্যে ক্রমশঃ প্রবেশ করেন এবং মধ্যাহ্ন বিশ্রামের সময়ে একদল রাজপ্রাসাদ এবং অপর দল নগরমধ্যে আক্রমণ করে[২]। ইহা বঙ্কিমের বর্ণনার অনুরূপ হইলেও একটি রাজধানী এমন কি রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত রক্ষার ব্যবস্থা এত অপ্রচুর থাকা সম্ভব হইয়াছিল কিরূপে যাহাতে ঐ অত্যল্প সংখ্যক অশ্বারোহীর আক্রমণে নগর বিপর্য্যস্ত এমন কি রাজপ্রাসাদ অধিকৃত হইয়া গেল, আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণায়ও তাহার উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

---

১ বঙ্গদর্শন ফাল্গুন ১২৮১, ৪৮৭-৪৮৮ পৃঃ।

২ 'The History of Bengal', Vol. II, edited by Sir Jadunath Sarkar : P. 7.

এ অবস্থায় বঙ্কিমের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে আর এক যুগসন্ধিক্ষণে বাঙ্গলায় যে অভিনয় ঘটিতে পারিয়াছিল পাঠান বিজয়ের সময়ে তেমনই আর এক বিশ্বাসঘাতকতা যে ঘটে নাই তাহারই বা স্থিরতা কি? বরং পরবর্ত্তী সুদীর্ঘ-কালব্যাপী জাতীয় অধঃপতনের সূচনা তৎকালীন বঙ্গাধিপের অমাত্যগণ স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যেই যে করিয়াছিল সপ্তদশ বা অষ্টাদশ অশ্বারোহীর অভিযান প্রবাদে বঙ্কিমের নিকট তাহা সহজসিদ্ধান্তই মনে হইয়াছিল। বঙ্কিম তাই স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন 'বঙ্গভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না; চাতুর্য্যেই ইহার জয়। চতুর ক্লাইভ সাহেব ইহার দ্বিতীয় পরিচয়ের স্থান।' বঙ্কিমের বহু পরে Vincent Smithও উভয়ক্ষেত্রে 'cheaply gained victory'র তুলনা করিয়াছেন।[১] সে যাহা হউক ইতিহাস আমাদের আলোচ্য নয়। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে যাহাদের সুখদুঃখের কাহিনীর অবতারণা করিয়া গ্রন্থকার আমাদের মনোহরণ করিতে চাহিয়াছেন তাঁহার কল্পিত সেই চরিত্রাবলীর কিছু আলোচনা করা যাক।

---

১ "The conquest so easily effected was final. Bengal never escaped from the rule of Muhammadans for any cosiderable time until they were superseded in the eighteenth century by the British whose victory at Plassey was gained nearly as cheaply as that of Muhammad Khilji." (Vincent Smith : Oxford History of India, Pp. 221-222).

সে আলোচনা করিতে গেলে আমরা কিন্তু প্রথমেই দেখিতে পাই বঙ্কিম এই উপন্যাসে কোন নায়কোচিত পুরুষচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেন নাই। অধঃপতনের দিনের কাহিনীতে তেমন চরিত্রের স্থানই বা কোথায়? মৃণালিনীর প্রণয়-পাত্র হিসাবে হেমচন্দ্র নায়ক বটে, কিন্তু মাধবাচার্য্যের মহতী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার পাত্র হিসাবে নহেন। মাধবাচার্য্যের আদর্শ, স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষার আদর্শ, তিনি আপনার করিয়া লইয়াছেন কই? মাধবাচার্য্যের মহৎ সঙ্কল্প-সাধনে—হিন্দুরাজ্য সংরক্ষণ বা উদ্ধার কার্য্যে—অনন্যব্রতীর অটল প্রতিজ্ঞা ও ঐকান্তিকতা হেমচন্দ্রের কোথায়? তাঁহার বীরত্ব থাকিতে পারে, নির্ভীকতাও থাকিতে পারে, কিন্তু শৌর্য্যের সহিত অপরিমিত ক্রোধের, সাহসের সহিত অত্যন্ত অসহিষ্ণুতার, পরিচয়ই তাঁহার চরিত্রে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হই। "মৃণালিনীর আশায় মথুরায় বসিয়া" থাকিয়া পিতৃরাজ্যচ্যুত হইলেন, তবুও শত্রুজয় সাধন অপেক্ষা মৃণালিনীর সন্ধানেই ব্যস্ত। তাহাতে আধুনিক নজীর অনুসারে mighty lover বলিয়া হয়ত গণ্য হইতে পারেন, কিন্তু স্বরাজ্য বা স্বাধীনতা যে তাঁহার first love নহে ইহা সহজেই বুঝা যায় প্রথম পরিচ্ছেদেই যখন তাঁহাকে বলিতে দেখি মাধবাচার্য্য মৃণালিনীর সন্ধান বলিয়া না দিলে তিনি আর অস্ত্রস্পর্শ করিবেন না। গুরু মাধবাচার্য্য মৃণালিনীকে বধ করিয়া 'দেবকার্য্যের কণ্টককে বিনষ্ট' করিয়াছেন বলিবামাত্রই 'ত্রস্ত

হস্তে ধনুকে শর সংযোগ করিয়া' 'এই শরে গুরুহত্যা ব্রহ্ম-হত্যা উভয় দুষ্ক্রিয়াসাধন' করিতে উদ্যত হইলেন। আবার সেই মৃণালিনী ব্যভিচারিণী শুনিবামাত্র মন এমনই বিগড়াইয়া গেল যে মৃণালিনীকে পিতৃদত্তশূলে বিদ্ধ করিতে, আর, গিরিজায়া বেচারীকে বেত্রাঘাত করিয়া দূতীর প্রাপ্য চুকাইয়া দিতে চাহেন। মনোরমার উপদেশ ও মৃণালিনীর অনেক অনুনয়ের ফলে যদি বা বহুদিন পরে সাক্ষাৎ ঘটিল, মৃণালিনীর মুখে হৃষীকেশের বাড়ীর ঘটনার সম্পূর্ণ বর্ণনা শুনিবার ধৈর্য্যটুকু রহিল না, আংশিক শুনিবামাত্র 'তীরের মত' লাফাইয়া উঠিলেন এবং মৃণালিনীকে ধরাশায়ী করিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন। ভাগ্যে ব্যোমকেশের মৃত্যুকালীন সাক্ষ্যটুকু পাওয়া গিয়াছিল, নতুবা সরোবরসলিলে প্রবেশ করিয়া মৃণালিনীর সকল জ্বালা জুড়াইতে হইত। তাহা হইলে মাধবাচার্য্যের সুমহৎসঙ্কল্পসাধনের উপলক্ষ হিসাবে যাহা কিছু গৌরব, নির্ভীকতার যাহা কিছু কার্য্য, ব্যক্তিগত শস্ত্রনৈপুণ্য, কিছুতেই উপন্যাসের নায়কত্বও বজায় থাকিত না। ফল নিজের গুণে নহে, মৃণালিনীর প্রণয়পাত্র হিসাবে হেমচন্দ্র নায়ক ও মৃণালিনীর গুণেই কাহিনী মাধুর্য্যঘন হইয়া উঠিয়াছে।

তেমনই পশুপতি। দুর্দ্দিনের রাজকুমার যেমন, ধর্ম্মাধিকার ততোধিক। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াও বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে চাহেন রাজ্য ও পাটরাণী। ইহা 'বিলাত থেকে আমদানী

করা' চিত্র নহে, অধঃপতিত হিন্দুর, স্বার্থান্ধ স্বজাতিদ্রোহী হিন্দুর সনাতন ছবি—এমন ছবি যাহার রেখার স্পষ্টতা ও বর্ণের উজ্জ্বলতা কোনদিন ম্লান হইবার নহে। পাণ্ডিত্যের সহিত কর্ম্মনীতির কোন সম্বন্ধ নাই। রূপতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য রাজকীয় বিধানের আনুকূল্য চাহেন। লোভ চরিতার্থতার জন্য দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দুরাশা পূরণের প্রার্থনা করেন। গঙ্গারামের আদি ও মার্জ্জিত সংস্করণ। মনোরমা Lady Macbeth হইলে বোধ হয় অধিকতর পাণ্ডিত্য-স্ফুরণের বাধা হইত না, বৃদ্ধ রাজাও যখন ছিলেন।

ভারতবর্ষে কিন্তু Lady Macbeth জন্মিত না—জন্মিত মনোরমা। কাজেই Lady Macbethএর পরিকল্পনা বঙ্কিম করেন নাই। মনোরমার মত নারীর স্বামীর পতনের একটা সীমা না থাকিয়া পারে না। সেইরূপ সীমায় পৌঁছিয়া পশুপতি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে পারিল না। রাজ্য যদি পশুপতির একমাত্র বাঞ্ছনীয় বস্তু হইত, তাহা হইলে ধর্ম্মান্তর-গ্রহণে সম্মত হওয়া হয়ত সম্ভব হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু 'তাঁহার রাজ্যাকাঙ্ক্ষা এবং মনোরমাকে লাভের আকাঙ্ক্ষা উভয়ই গুরুতর'[১] হইলেও, অত্যাসন্ন মুসলমান আক্রমণের দিনে মনোরমা যখন আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক দেবীসমক্ষে শপথ করিয়া জানাইয়া দিল স্বধর্ম্মত্যাগ দূরের কথা, রাজ্যলাভের

১ ২খঃ ৯পঃ।

দুরাশা না ছাড়িলে 'তোমায় আমায় * * এজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না,' সেদিন পশুপতি দ্বিধা ঘুচাইয়া বলিল 'আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে পথ হইতে ফিরিবার উপায় থাকিলে আমি ফিরিতাম—তোমাকে লইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া কাশী যাত্রা করিতাম'[১]। কাজেই পরবর্ত্তী দিনে রাজ্যলাভে বঞ্চিত হইয়া সে তাহার মূঢ়তার শাস্তির যখন সম্মুখীন, তখন ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের শক্তি যে সে কোথায় পাইল তাহা সহজেই অনুমেয়। এ শক্তি যে মনোরমার আশা সঞ্চার করিয়াছিল, ইহা যে পশুপতির স্বধর্ম্মনিষ্ঠা নহে, তাহা পরক্ষণেই 'ধাতুমূর্ত্তির বিসর্জ্জন' অধ্যায়ে[২] বর্ণিত ঘটনা লক্ষ্য করিলেও বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই শক্তির উদ্দীপনশিখা যখন অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, তখন অনুতাপের মধ্য দিয়া পশুপতির যে বিবেকবুদ্ধি ফিরিয়া আসিতেছিল তাহারও মহাপ্রলয় ঘটিয়া গেল। শোকের উন্মাদনায় দেশদ্রোহী হইয়া উঠিল দেবদ্রোহী। তুষানলের, 'দাবানলে'র, 'অশনিসম্পাতে'র মধ্যে মহাপাপের পরিপূর্ণতায় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে হইল মহাপাতকীর জীবন্ত সমাধি। গ্রন্থের অনুপম বর্ণনা—

"মহম্মদ আলির নিকট বিদায় হইয়া, রাজপথ অতিবাহিত করিয়া পশুপতি ধীরে ধীরে চলিলেন। * * দ্রুতপদ ক্ষেপণে তাঁহার প্রবৃত্তি

১ ৪খঃ ৩পঃ।

২ ৪খঃ ১৪ পঃ।

জন্মিল না। রাজপথে যাহা দেখিলেন, তাহাতে আপনার মনোমধ্যে মরিলেন। তাঁহার প্রতিপদে মৃত নাগরিকের দেহ চরণে বাজিতে লাগিল; প্রতিপদে শোণিতসিক্ত কর্দ্দমে চরণ আর্দ্র হইতে লাগিল। পথের দুই পার্শ্বে গৃহাবলী জনশূন্য—বহুগৃহ ভস্মীভূত; কোথাও বা তপ্ত অঙ্গার এখনও জ্বলিতেছিল। গৃহান্তরে দ্বার ভগ্ন, গবাক্ষ ভগ্ন, প্রকোষ্ঠ ভগ্ন—তদুপরি মৃতদেহ! এখনও কোন হতভাগ্য মরণ-যন্ত্রণায় অমানুষিক কাতর স্বরে শব্দ করিতেছিল। এ সকলের মূল তিনিই। দারুণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এই রাজধানীকে শ্মশানভূমি করিয়াছেন। পশুপতি মনে মনে স্বীকার করিলেন যে, তিনি প্রাণদণ্ডের যোগ্য পাত্র বটে। ** সহসা আর এক কথা মনে পড়িল—তাঁহার নিজ বাটী? তাহা কি যবনহস্তে রক্ষা পাইয়াছে? আর সে বাটীতে যে কুসুমময়ী প্রাণপুত্তলিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার কি হইয়াছে? মনোরমার কি দশা হইয়াছে?...

"পশুপতি উন্মত্তের ন্যায় আপন ভবনাভিমুখে ছুটিলেন, আপনার ভবনসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে—জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার উচ্চচূড়া অট্টালিকা অগ্নিময় হইয়া জ্বলিতেছে।

* * *

"মহাবেগে পশুপতি জ্বলন্ত দ্বারপথে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চরণ দগ্ধ হইল—অঙ্গ দগ্ধ হইল—কিন্তু পশুপতি ফিরিলেন না। অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করিয়া আপন শয়নকক্ষে গমন করিলেন—কাহাকেও দেখিলেন না। দগ্ধ শরীরে কক্ষে কক্ষে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরমধ্যে যে দুরন্ত অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাহাতে তিনি বাহ্য দাহযন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারিলেন না।

"দাবানল-সংবেষ্টিত অরণ্যগজের ন্যায় পশুপতি অগ্নি-মধ্যে ইতস্ততঃ দাসদাসী, স্বজন ও মনোরমার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কাহারও কোন চিহ্ন পাইলেন না—হতাশ হইলেন। তখন দেবীর মন্দির প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল। দেখিলেন, দেবী অষ্টভূজার মন্দির অগ্নি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া জ্বলিতেছে। পশুপতি পতঙ্গবৎ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন অনলমণ্ডলমধ্যে অদগ্ধা স্বর্ণপ্রতিমা বিরাজ করিতেছে। পশুপতি উন্মত্তের ন্যায় কহিলেন, 'মা জগদম্বে! আর তোমায় জগদম্বা বলিব না। আর তোমায় পূজা করিব না। তোমাকে প্রণামও করিব না। * * * তুমি ধাতুমূর্ত্তি মাত্র, দেবী নহ। * * * আমি তোমাকে স্থাপনা করিয়াছিলাম—আমিই তোমাকে বিসর্জ্জন করিব'। * * *

"এই বলিয়া পশুপতি প্রতিমা উত্তোলন আকাঙ্খায় উভয় হস্তে তাহা ধারণ করিলেন। সেই সময় আবার অগ্নি গর্জ্জিয়া উঠিল। তখনই পর্ব্বতবিদারাস্বরূপ প্রবল শব্দ হইল—দগ্ধ মন্দির, আকাশপথে ধুলিধুমভস্ম সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাশি প্রেরণ করিয়া চূর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল। তন্মধ্যে প্রতিমা সহিত পশুপতির সজীবন সমাধি হইল।" ১

ভাষা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু পশুপতির প্রায়শ্চিত্তের এই অগ্নিবর্ণ চিত্র Titian বা Rubensএর চিত্রের ন্যায় চিরদিনই পাঠককে মুগ্ধ করিবে।

কিন্তু উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র দুইটির ব্যর্থতা ও দুর্ম্মতির যে দৈন্য আমাদের আত্যন্ত আঘাত করে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ দান করে নারী চরিত্রযুগলের

১ ৪ খ: ১৪ প।

মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য, অটুট প্রেমের সহিষ্ণুতা ও বিদেহী প্রেমের সহানুভূতি।

সে চরিত্র যুগলের সৃষ্টি-কল্পনায় আমরা মোটামুটি দেখিতে পাই বঙ্কিম এই উপন্যাসে একদিকে আঁকিয়াছেন একটি একায়ন, তদ্‌গতচিত্ত, নিরভিমান, নিঃসংশয়, সকলব্যথাসহনশীল পূর্ব্বরাগের[১] ছবি, অন্যদিকে এমন এক অপূর্ব্ব অনুরাগের চিত্র যাহা প্রেমাস্পদের কলঙ্ক নিবারণ ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য রহিল আজীবন মিলন সুখে উদাসীন, আর সাগ্রহে বরণ করিল প্রিয়তমের সহমরণ। নারীপ্রেমের চরমোৎকর্ষের এমন দুইটি চিত্র উপন্যাস সাহিত্যে একই গ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু বিশ্বে যাহা বিরল রামায়ণ মহাভারতের বাণী-বিকীর্ণ তথাকথিত নিঃস্ব ভারতে তাহা সুলভ হইবার বাধা নাই।

দুর্গেশনন্দিনীতে তিলোত্তমার ন্যায় প্রেমতন্ময় সর্ব্বংসহা নারীর চিত্র আঁকিয়া বঙ্কিমের যেন আকাঙ্খা মিটে নাই, তাই মৃণালিনীর চরিত্র চিত্র করিয়া বঙ্কিম অচিরেই সে আক্ষেপ মিটাইয়াছেন। এই নব সংস্করণে তিলোত্তমা আর নিশ্চেষ্ট অবলা নাই, সে আবেগময়ী অভিসারিকা, যেন অচল তপস্যার স্থান অধিকার করিয়াছে তীর্থযাত্রীর অক্লান্ত পরিক্রমা। মৃণালিনী ধনীর কন্যা ঐকান্তিক ভালবাসার পাথেয় সম্বল

---

১ শেষ খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে 'পূর্ব্ব-পরিচয়' প্রসঙ্গে মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের যে গোপন বিবাহের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে প্রেমের সূচনা ব্যতীত মিলনের সংবাদ নাই। কাজেই পূর্ব্বরাগ বলিলে অধিকতর সঙ্গত হয় মনে করি।

করিয়া মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থানুসারে মথুরা হইতে সুদূর বাঙ্গলার প্রবাসে আসিল—পতিগৃহে নয়, প্রবাসী হেমচন্দ্রের সহিত মিলনাশায়—মাধবাচার্য্যের জনৈক শিষ্যের আশ্রয়ে।

'ভূমি কমলিনী গগন সূর
পেমপন্থা কতএ দূর'

অচিরে সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সে আশ্রয়ও ত্যাগ করিতে হইল, কিন্তু নিরাশ্রয়া মৃণালিনী মথুরায় ফিরিল না, আসিল হেমচন্দ্রের আবির্ভাব স্থল নবদ্বীপে, আর হেমচন্দ্রের ঠিকানা না জানায় আশ্রয় লইল গিরিজায়ার সহিত এক দুঃস্থ পাটনীর কুটীরে। অনেক অনুসন্ধানের পর যদি বা হেমচন্দ্রের ঠিকানা মিলিল সেটা হইল কি না রূপলক্ষ্মী মনোরমার স্নেহনীড়। সখী গিরিজায়ার গভীর সংশয় হেমচন্দ্র মনোরমার অনুরাগী, মৃণালিনী কিন্তু প্রথমেই স্থির করিলেন 'মনোরমা যেই হউক হেমচন্দ্র আমারই' [১]। বিশ্বাসের এমনই দৃঢ়তা! গিরিজায়া অনেক গবেষণাপূর্ব্বক তাহার উদ্‌ভাবিত মৃণালিনীর বিবাহ সম্পর্কীয় মিথ্যা সংবাদ হেমচন্দ্রকে জানাইলে হেমচন্দ্র 'উত্তম হইয়াছে' বলায় পাখী 'শিক্‌লী কাটিয়াছে' সিদ্ধান্ত করিয়া ঠাকুরাণীকে আসিয়া তাহা নিবেদন করিল। মৃণালিনী কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন না; হেমচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন। হেমচন্দ্র

১ ৩ খঃ ২ পঃ।

ইত্যবসরে মাধবাচার্য্যের কথিত হৃষীকেশের বাটীর ঘটনা শুনিয়া মৃণালিনীর প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া 'কুলটার পত্র' পড়িবেন না বলিয়া পত্রখানি ছিড়িয়া ফেলিলেন এবং বেত্রাঘাতের ভয় দেখাইয়া গিরিজায়াকে বিদায় দিলেন। লাঞ্ছিতা গিরিজায়া ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত অপমানের কাহিনী মৃণালিনীর নিকট বিবৃত করিল। মৃণালিনী কিন্তু সে অপবাদ ও অবজ্ঞার কথা ভুলিয়া গিরিজায়াকে পুনরায় হেমচন্দ্রের নিকট যাইতে বলিলেন; তাহাতে উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ আলোচনা হইল—

"গি—আবার সে পাষণ্ডের নিকট যাইব কেন?

মৃ—পাষণ্ড বলিও না। হেমচন্দ্র ভ্রান্ত হইয়া থাকিবেন—এ সংসারে অভ্রান্ত কে? কিন্তু হেমচন্দ্র পাষণ্ড নহেন। আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইব—তুমি সঙ্গে চল * * যদি তাঁহার নিজ মুখে শুনি যে, তিনি মৃণালিনীকে কুলটা ভাবিয়া ত্যাগ করিলেন, তবে এ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিব।

গি—প্রাণবিসর্জ্জন! সে কি মৃণালিনী?" ১

মৃণালিনী কোন উত্তর করিলেন না। গিরিজায়ার স্কন্ধ আশ্রয় করিয়া কাঁদিলেন। তারপরে গেলেন গিরিজায়ার বর্ণিত 'জন্মের শোধ বিদায় লইতে'। 'নিশীথে স্বচ্ছসলিলা-বাপীতীরে' হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎও হইল কিন্তু বহুদিনের অদর্শনের পরে মিলনমুহূর্ত্তের দুর্ব্বার অশ্রুধারায় বিহ্বল

১ ৩ খঃ ৮ পঃ।

মৃণালিনী হেমচন্দ্রের প্রশ্নোত্তরে বলিয়া ফেলিলেন 'হৃষীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে'। 'শ্রুতমাত্র হেমচন্দ্র তীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন'। 'মৃণালিনীর মস্তক তাঁহার বক্ষঃচ্যুত হইয়া সরোবর-সোপানে আহত হইল'। 'পাপীয়সি—নিজ মুখে স্বীকৃতা হইলি' বলিয়া ক্রোধান্ধ হেমচন্দ্র চলিয়া গেলেন। মৃণালিনীর মিলনের স্বপ্ন সাক্ষাৎ মাত্রেই শতচূর্ণ হইয়া গেল। পরিত্যক্তা সরোবর-সোপান আশ্রয় করিয়াই বিনিদ্ররজনী কাটাইল। তাহার পরে যাহা ঘটিল তাহার সমালোচনা অনাবশ্যক, বঙ্কিমচন্দ্রকৃত বর্ণনাই উপভোগ্য—

"শীতলসমীরণময়ী উষার পিঙ্গলমূর্ত্তি বাপীতীরবনে উদয় হইল। তখনও মৃণালিনী আহত মস্তক ধারণ করিয়া সোপানে বসিয়া আছেন। গিরিজায়া জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুরাণি, আঘাত কি গুরুতর বোধ হইতেছে?"

মৃণালিনী কহিলেন, "কিসের আঘাত?"

গি। মাথায়?

মৃ। মাথায় আঘাত? আমার মনে হয় না।" ১

* * * *

"নিশা প্রভাতা হইল, গিরিজায়া যত কিছু বলিলেন মৃণালিনী কোন উত্তর দিলেন না, অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। স্নানাহারের সময় উপস্থিত হইল—গিরিজায়া তাঁহাকে * * স্নান করাইল। * * কিঞ্চিৎ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া * * দিল। মৃণালিনী তাহা স্পর্শ করিলেন মাত্র।

১ ৩ খঃ ১০ পঃ।

এইরূপে পূর্ব্বাচলের সূর্য্য মধ্যাকাশে, মধ্যাকাশের সূর্য্য পশ্চিমে গেলেন। সন্ধ্যা হইল। * * * গিরিজায়া বিশেষ চঞ্চলা হইল। পূর্ব্ব রাত্রে জাগরণ গিয়াছে—এ রাত্রেও জাগরণের আকার। গিরিজায়া কিছু বলিল না—বৃক্ষপল্লব সংগ্রহ করিয়া সোপানোপরি আপন শয্যা রচনা করিল। মৃণালিনী * * কহিলেন, 'তুমি ঘরে গিয়া শোও।'

গিরিজায়া মৃণালিনীর কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল। বলিল 'একত্র যাইব। * * কিন্তু সাহস পাইত বলি—রাজপুত্রের সহিত ত এজন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচিল—তবে আর কার্ত্তিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন' ?

মৃ। গিরিজায়া, হেমচন্দ্রের সহিত এজন্মে আমার সম্বন্ধ ঘুচিবে না। আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম—আজিও তাঁহার দাসী।

গি। কি ঠাকুরাণী! তুমি এখনও বল—তুমি সেই পাষণ্ডের দাসী ?

মৃ। গিরিজায়া! যদি হেমচন্দ্র তোমাকে পীড়ন করিয়া থাকেন, তুমি স্থানান্তরে তাঁহার নিন্দা করিও। হেমচন্দ্র আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই—আমি কেন তাঁহার নিন্দা সহিব ? তিনি রাজপুত্র—আমার স্বামী; তাঁহাকে পাষণ্ড বলিও না।

গি। পাষণ্ড বলিব না ?—একবার বলিব * * দশবার বলিব * * শতবার বলিব * * কি দোষে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন ?

মৃ। সে আমারই দোষ—আমি গুছাইয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই—কি বলিতে কি বলিলাম।

* * * *

গি। তুমি হেমচন্দ্রের অঙ্গে মাথা রাখিয়াছিলে—তিনি ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন, পাথরে পড়িয়া তোমার মাথায় লাগিয়াছে।

মৃণালিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন—কিছু মনে পড়িল না। বলিলেন—'মনে হয় না, বোধ হয়, আপনি পড়িয়া গিয়া থাকিব।"[১]

এখানে যে বিলাতী কিছু নাই—আছে পৌরাণিক স্বামিবাদ, স্বামিনিন্দার প্রতিবাদ—তাহা সহজেই দেখা যায়। বঙ্কিমের কল্পকলার বিবর্ত্তনে ইহা লক্ষ্যণীয় যে প্রিয়তমের আঘাত বিস্মরণে, ক্ষমার অধিক গুণে, মৃণালিনী তিলোত্তমাকে ছাড়াইয়া গেল।

"গিরিজায়া বিস্মিতা হইল। বলিল, 'ঠাকুরাণি! এ সংসারে আপনি সুখী।"

মৃ। কেন?

গি। আপনি রাগ করেন না।

মৃ। আমি সুখী—কিন্তু তাহার জন্য নহে।

গি। তবে কিসে?

মৃ। হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।"[২]

অহঙ্কার পরিশূন্যতায় মৃণালিনীর প্রেম যে শুধু নির্ব্বিকার তাহা নহে, হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎসুখেই মৃণালিনী বিধুর—তাহাতেই সে তাহার দীর্ঘদিনের দুঃখকষ্টের প্রভূত সার্থকতা উপলব্ধি করিতেছে।

"মৃণালিনী একে আহারনিদ্রাভাবে দুর্ব্বলা, তাহাতে সমস্ত

---

১ ৪ খঃ ৮ পঃ। ২ ৪ খঃ ৮ পঃ।

রাত্রিদিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, সুতরাং * * তন্দ্রা আসিল। নিদ্রায় তিনি স্বপ্ন * * দেখিলেন হেমচন্দ্র একাকী সর্ব্ব সমরে বিজয়ী হইয়াছেন। * * মৃণালিনীকে যেন (তাঁহার) সেনা-তরঙ্গ ফেলিয়া দিয়া চরণদলিত করিয়া চলিয়া গেল—তখন হেমচন্দ্র নিজ সৈন্ধবী তুরঙ্গ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। তিনি যেন হেমচন্দ্রকে বলিলেন; 'প্রভু! অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছি; দাসীকে আর ত্যাগ করিও না।' হেমচন্দ্র যেন বলিলেন, 'আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।' সেই কণ্ঠস্বরে যেন—তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল * * দেখিলেন সত্য! হেমচন্দ্র সম্মুখে! হেমচন্দ্র বলিতেছেন—'আর একবার ক্ষমা কর—আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।'

"নিরভিমানিনী, নির্লজ্জা মৃণালিনী আবার তাঁহার কণ্ঠলগ্না হইয়া স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন।"[১]

বঙ্কিম উপসংহারে মৃণালিনীকে 'নিরভিমানিনী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মৃণালিনী 'নিরভিমানিনী' ত বটেই। কিন্তু তাহার চরিত্রে শুধু কি অভিমানের অত্যন্ত অভাবই দেখা যায়? ঐকান্তিক নিষ্ঠা, নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা, দুঃখের পরে দুঃখবরণ, সংশয় পরিশূন্যতা, অবিচল শ্রদ্ধা, অটুট সহনশীলতা ও উদার ক্ষমা, সবই তাহার চরিত্রে একে একে ফুটিয়া উঠিয়া (এবং নায়ক চরিত্রের যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি তিরস্কৃত করিয়া) তাহার অতলস্পর্শ প্রেমকে অনন্ত মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। আর, বঙ্কিম যেন বাঙ্গলার রসসাহিত্যে তাঁহার নূতন সৃষ্টি

---

১ ৪ খঃ ৯ পঃ।

আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃত মূল্যবোধের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াই মৃণালিনীকে 'নির্লজ্জ' আখ্যায় ভূষিত করিয়া গিয়াছেন। মৃণালিনী চরিত্রটি আমাদের পৌরাণিক আদর্শে চিত্রিত বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা 'বিলাত থেকে আমদানী' নহে। বিলাতের মাটিতে এমন কি কল্পনা-ক্ষেত্রেও এমন নারী সুদুর্লভ।[১]

উপন্যাসখানির আদ্যন্ত মৃণালিনীর সফল প্রেমের কাহিনীতে সমুজ্জ্বল হইলেও এবং কেবলমাত্র মৃণালিনীর চরিত্র একখানি উপন্যাসকে বিশিষ্ট গৌরবদান করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য হইলেও, পাছে মৃণালিনীর মিলনান্ত পূর্ব্বরাগের কাহিনীতে কেহ অচল প্রেমনিষ্ঠার গৌরব ভুলিয়া আসক্তির প্রবলতা মাত্র দেখেন, বঙ্কিম যেন তাই মনোরমার মিলনে উদাসীন মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের বিয়োগান্ত ছবি একই চিত্রপটে পাশাপাশি অঙ্কিত করিয়াছেন। মনোরমা পশুপতির পরিণীতা স্ত্রী। তাহার পিতা 'মেয়ে অল্প বয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমৃতা হইবে' জ্যোতির্ব্বিদের এই গণনার ফল এড়াইবার জন্য মেয়েকে লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যান। ফলে বিবাহের পর হইতেই স্বামীর সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটে। তাহার পিতা মৃত্যুকালে আপন আচার্য্য জনার্দ্দন শর্ম্মার প্রতি কন্যার ভার অর্পণ করিয়া গেলে তখন হইতে পরিচয়ে সে তাহার

১ Shakespeareএর ব্যাপক সৃষ্টি মধ্যে Desdemona অদ্বিতীয়া। পরবর্ত্তী ইংরাজী সাহিত্যে তাহার জোড়া বোধ হয় সহজে মিলিবে না।

পালক পিতার বালবিধবা কন্যা। সে জনার্দ্দন শর্ম্মার সহিত নবদ্বীপে আসিয়া পরিণত যৌবনে পশুপতিকে তাহার স্বামী বলিয়া জানিতে পারিলেও পশুপতি তাহা জানে না, সেও আত্মপ্রকাশ করে না, কারণ পশুপতি বঙ্গাধিপের ধর্ম্মাধিকার —প্রধান সচিব। সে আত্মপ্রকাশ করিলেও পশুপতি হয়ত তাহা বিশ্বাস করিবে না, আর পশুপতি বিশ্বাস করিলেও, যে বিধবা বলিয়া সমাজে পরিচিত তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলে প্রাচীন সমাজ তাহা অনুমোদন করিবে না, ফলে পশুপতির পদমর্য্যাদা বিনষ্ট হইবে,[১] কাজেই সে আত্মগোপন করিয়াই চলে তবে স্বামিদর্শনসুখে আপনাকে বঞ্চিত করে না। পশুপতি কিন্তু মনোরমার, 'অনুপম রূপমাধুরী' এবং তাহার অসাধারণ প্রতিভার দীপ্তিতে ক্রমশঃ আকৃষ্ট, অনুরক্ত ও মুগ্ধ হইল, এমনকি পাঠানের সহিত চক্রান্ত করিয়া বাঙ্গলার সিংহাসন অধিকার করিতে পারিলে বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত সপ্রমাণ করিয়া মনোরমাকে আপনার মহিষী করিবে বলিয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। পক্ষান্তরে পশুপতির অশ্রুবিগলিত মনোরমা এক দুর্ব্বলমুহূর্ত্তে তাহার পত্নী হইবে স্বীকৃত হইলেও পশুপতিকে বিশ্বাসঘাতকতার অধর্ম্মাচরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইল না, বরং পশুপতি ঐ অধর্ম্মাচরণ করিলে তাহাকে আর দেখা দিবে না বলিয়া শপথ করিবামাত্র বন্দী হইল। এত

১ ৪ খঃ ৩ পঃ।

বড় অধর্ম্মাচারীকে মনোরমা জানিয়া শুনিয়াও কেন যে ভালবাসিত হেমচন্দ্রের সহিত মনোরমার একদিনকার কথোপকথনে আমরা তাহার অপরূপ কৈফিয়ৎ পাই। মৃণালিনী ব্যভিচারিণী ধারণায় হেমচন্দ্র একদিন অত্যন্ত কাতর, মনোরমা আসিয়া এমন সময় জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে ?"

"হেম। আমার দুঃখ ভগিনীর অশ্রাব্য—অপরেরও অশ্রাব্য।

* * * *

মনো—বুঝিয়াছি। তুমি না বুঝিয়া ভালবাস, তাহার পরিণাম ঘটিয়াছে।

হেম—ভালবাসিতাম।

* * * *

"মনোরমা বিরক্ত হইল। 'বলিল, ছি! ছি! প্রতারণা! যে পরকে প্রতরণা করে সে বঞ্চক। যে আত্মপ্রতারণা করে তাহার সর্ব্বনাশ ঘটে।'

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, কহিলেন, কি প্রতারণা করিলাম ?

মনোরমা কহিল, ভালবাসিতাম কি ? তুমি ভালবাস। নহিলে কাঁদিলে কেন ? কি ? আজ তোমার স্নেহের পাত্র অপরাধী হইয়াছে বলিয়া তোমার ভালবাসা গিয়াছে ? কে তোমায় এমন প্রবোধ দিয়াছে ?' 'এ কেবল বীরদম্ভকারী পুরুষদের দর্পমাত্র।' 'তুমি বালির বাঁধ দিয়া এই কূলপরিপ্লাবিনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি তুমি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা

মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের বেগরোধ করিতে পারিবে না। হা কৃষ্ণ! মানুষ সকলেই প্রতারক।'

"মনোরমা কহিতে লাগিল।' (পুরাণে) 'লেখা আছে ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন; এক দাম্ভিক মত্ত হস্তী তাহার বেগ সংবরণ করিতে গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহার অর্থ কি? গঙ্গা প্রেমপ্রবাহস্বরূপ' 'যে ইহাতে অবগাহন করে সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যুঞ্জয়-জটা বিহারিণী; যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে সেও প্রণয়কে মস্তকে ধারণ করে।' 'হস্তী দম্ভের অবতার স্বরূপ। সে প্রণয়বেগে ভাসিয়া যায়। প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয়' 'সংসারস্থ সর্ব্বজীবে বিলীন হয়।'

হে। তোমার উপদেষ্টা কি বলিয়াছেন, প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই? পাপাসক্তকে কি ভালবাসিতে হইবে?

ম। পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে। প্রণয় জন্মিলে তাহাকে যত্নে স্থান দিবে; কেননা, প্রণয় অমূল্য। ভাই, যে ভাল, তাকে কে না ভালবাসে? যে মন্দ, তাকে যে আপনা ভুলিয়া ভালবাসে আমি তাকে বড় ভালবাসি। কিন্তু আমি ত উন্মাদিনী।"১

* * * *

মনোরমা তাহার এই অহঙ্কারবিমুক্ত পাত্র-নিরপেক্ষ প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া কেন যে আপনাকে 'উন্মাদিনী' বলিয়া বর্ণনা করিল, কেন যে তাহার ভালবাসার তত্ত্ব হেমচন্দ্রের অবশ্য গ্রাহ্য বলিয়া দাবীও করিল না, হেমচন্দ্র তাহা

১ ৩ খঃ ৬ পঃ।

বুঝিলেন না। তিনি জানেন না মনোরমার দেহসম্বন্ধশূন্য প্রেমসাধনা কোন অতীন্দ্রিয় অন্তঃসুখের তন্ময়তায় পৌঁছিয়াছে। কাজেই হেমচন্দ্র মনে করিলেন এ বুঝি বিধবা মনোরমার পরকীয়প্রীতি। অতএব যাহাকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করেন তাহার পতনাশঙ্কায়—

"হেমচন্দ্র বলিলেন, 'মনোরমা, তোমার মুখ দেখিয়া, আর তোমার কথা শুনিয়া, আমার বোধ হইতেছে, তুমিও ভালবাসিয়াছ' " " 'তুমি বিধবা, যদি স্বামিভিন্ন অপরকে মনেও ভাব, তবে তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীজাতির অধম হইয়া থাকিবে। অতএব সাবধান হও'।" " 'ধর্ম্মের জন্য প্রেমকে সংহার করিবে। স্ত্রীর পরম ধর্ম্ম সতীত্ব। সেই জন্য বলিতেছি, যদি পার প্রেম সংহার কর'।"

"ম। 'আমি অবলা, জ্ঞানহীনা, বিবশা; আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা জানি না। আমি এইমাত্র জানি, ধর্ম্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না'।"[১]

মনোরমার এই উক্তির পরে মনোরমার সমস্ত রূপগুণ আজিকার দিনে আমাদের চক্ষে হয়ত একেবারেই ঝরিয়া পড়িবে এবং বঙ্কিম যে আর্টিষ্ট্ নহেন, একজন religious preacher মাত্র—তাহা বলিতেও হয়ত আমরা কুণ্ঠিত হইব না। কিন্তু 'ধর্ম্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না' মনোরমার কথিত বঙ্কিমের এই বাণীর তাৎপর্য্য যদি আমরা বুঝিতে চেষ্টা না করি তাহা হইলে মনোরমার লোকোত্তর ( transcendental ) প্রেমের গুরুত্ব আমরা যে শুধু উপলব্ধি করিতে পারিব না তাহা নহে, পরন্তু

---

১ ৩ খঃ ৬ পঃ।

মনোরমাস্রষ্টার কবিমানসেরও সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে পারিব না। ধর্ম্ম কাহাকে বলে? যাহা মানুষকে চিরন্তন সত্তার সন্ধান দেয়, মানুষকে অনন্তের অভিমুখী জীবনযাপনে প্রণোদিত করে, তাহাই ধর্ম্ম। ঐ চিরন্তন সত্তাও যেমন বাহিরের বস্তু নহে তেমনই তাহার প্রেরণা বা আহ্বানও বাহিরের আকর্ষণ নহে। তিনি যেমন অন্তরতম সদ্‌বস্তু 'সত্যম্', তেমনই 'শিবম্', তেমনই 'রসো বৈ সঃ'। অতএব ধর্ম্ম ও প্রেম একই সাধনার যুগলরূপ, একই আত্মতত্ত্বের শিব ও রসরূপের সন্ধান। কাজেই যে সংস্কৃতির সিদ্ধান্ত feeling in terms of eternity, living in terms of eternity ব্যতীত অসম্ভব, মনোরমা সেই সংস্কৃতিজাত বলিয়া সে ধর্ম্ম ভিন্ন প্রেম মানে না। প্রেমাস্পদের সহিত মিলনই যে তাহার একমাত্র কাম্য নহে, সহ-ধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্যপালন ও অধিকার পরিচালনা করিতে যে সে উন্মুখ,[১] প্রিয়তমকে পাপমুক্ত রাখিতে একান্ত উৎকণ্ঠিত তাহাও

১ Shakespeareএর Julius Caesarএর Portiaর উক্তি এখানে মনে পড়ে—

"No my Brutus ;
You have some sick offence within your mind
Which by the right and virtue of my place,
I ought to know of." (II, 1, Ll. 267-70).

তবু Portia শুধু Brutusএর দুশ্চিন্তার বিষয় মাত্র জানিতে চাহিয়াছিল সে যতই বলুক

"Dwell I but in the suburbs
Of your good pleasure ? If it be no more
Portia is Brutus' harlot, not his wife." (II, 1, Ll. 285-87).

Brutusকে 'Sick offence) পরিহারের জিদ করিতে সাহসী হয় নাই। মনোরমা তাহার আত্মশক্তিতে পশুপতির উপর যথেষ্ট বেশী দাবী করিয়াছে।

সুস্পষ্ট। সে উৎকণ্ঠা পশুপতির সহিত তাহার জীবনের শেষ কথোপকথনে নিম্নোদ্ধৃতরূপে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে—

"মনোরমা কহিল, 'পশুপতি, আমি যাহা আজি বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলি শুন। এ ঘর ছাড়। তোমার রাজ্যলাভের দুরাকাঙ্ক্ষা ছাড়। প্রভুর অহিতচেষ্টা ছাড়। এ দেশ ছাড়িয়া চল, আমরা কাশীধামে যাত্রা করি। সেইখানে আমি তোমার চরণ সেবা করিয়া জন্ম সার্থক করিব। যে দিন আমাদের আয়ুঃশেষ হইবে একত্রে পরমধামে যাত্রা করিব। যদি ইহা স্বীকার কর আমার ভক্তি অচলা থাকিবে। নহিলে—'

পশুপতি—নহিলে কি ?

মনোরমা তখন উন্নত মুখে, সবাষ্পলোচনে, দেবী প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, যুক্ত করে গদগদ কণ্ঠে কহিল, 'নহিলে দেবীসমক্ষে শপথ করিতেছি, তোমায় আমায় এই সাক্ষাৎ, এ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না।'"[১]

পশুপতি সাক্ষাতেরই ভিখারী, মনোরমার বাহিরের রূপেই মুগ্ধ, বরং তাহার অন্তরের পূতশ্রীকে শঙ্কাই করে। কাজেই লুব্ধ পশুপতিকে সে আর কি অধিকতর দণ্ডের কথা শুনাইবে ? নতুবা মনোরমা যে পশুপতিকে অন্তর হইতে তাহার পূজার বেদী হইতে, দূরিত করিতে অক্ষম, পশুপতির আত্মার যে সে চির-আত্মীয়, পশুপতির বিড়ম্বিত বিদগ্ধ জীবনান্তে মনোরমার স্রষ্টা তাহাকে পশুপতির মহাযাত্রাপথের সঙ্গিনী করিয়া দিয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। পশুপতি মনোরমাকে তাহার গৃহপিঞ্জরে বন্দী করিলেও গ্রন্থের

১ ৪ খঃ ৩ পঃ।

বর্ণনানুসারে মনোরমার বাণীই সত্য হইয়াছিল—মনোরমার সাক্ষাৎ পশুপতি জীবনে আর পায় নাই। মরণে কিন্তু মনোরমা তাহাকে ত্যাগ করে নাই। মনোরমা একদিন কথাচ্ছলে হেমচন্দ্রকে বলিয়াছিল তাহার প্রেমগুরু 'সর্ব্বজ্ঞানী' তিনি 'অগ্নিস্বরূপ, আলো করেন, কিন্তু দগ্ধও করেন।' অন্তিমে তাঁহার প্রেরণায় পশুপতির চিতানল বরণ করিয়া একই চিতার নির্ব্বাপণনীরে তাহার সকল সন্তাপ জুড়াইবার বস্তু খুঁজিয়া লইল। আর যে হেমচন্দ্র মনোরমাকে একদিন বলিয়াছিলেন ধর্ম্মের জন্য প্রেমসংহার করিতে, পশুপতির চিতারোহণে উদ্যত মনোরমাকে সেই হেমচন্দ্রই প্রতিনিবৃত্ত করিতে গিয়া সবিস্ময়ে শুনিলেন "ভাই! যে জন্য আমার জীবন তাহা আজি চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে।"[১] আমরাও বলি মনোরমায় বঙ্কিমের কামনাবিজয়িনী ও কর্ত্তব্যকুশলা নারীর প্রেমশক্তির কল্পনা চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আর, "এ সংসারে ভালবাসাকে মহিমান্বিত ক'রবার জন্য বিচ্ছেদ যে অতুল ঐশ্বর্য্যময়ীর দ্বারে এসেই চিরদিন হাত পাতে, সে যে অল্পপ্রাণ ক্ষুদ্র প্রেমের কুটীরে অবজ্ঞায় যায় না"

---

১ "In marriage, from the very outset each individual finds his correct adjustment to the cosmic purpose. And henceforth the problems of life are set beyond the plane of tragedy. They are set in accordance with their universal and ultimate significance. Thus suffering can mean happiness just as much as satisfaction can; and the most poignant pain can be joyously accepted if it is recognised as the fulfilment of man's destiny." (Keyserling : 'Book of Marriage', p. 19).

এই তত্ত্বের সম্বন্ধে যত জোর বিবৃতিই আজ অন্যত্র দেখি না কেন, ইহার অনবদ্য রসরূপ ইদানীন্তন বাঙ্গলা সাহিত্যে বঙ্কিমের মনোরমার মধ্যেই আমরা সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাই।

মৃণালিনী ও মনোরমার যুগল চরিত্রের জন্য উপন্যাসখানি বঙ্কিম সাহিত্যে বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করিলেও, গিরিজায়াকে বাদ দিয়া 'মৃণালিনীর' আলোচনা সমাপ্ত হইতে পারে না। উপন্যাসখানিতে গিরিজায়া আনিয়া দিয়াছে বাস্তবের হাওয়া ও সখীর স্নেহ, আর রচিয়া দিয়াছে সহজিয়া সুরে বৈষ্ণবপ্রেমসাধনপরিবেশ। ছায়ার মত নিত্যসঙ্গিনী, দুঃখ-সুখের চির অংশভাগিনী, একান্ত অনুরাগিণী সখীর চিত্র হিসাবে গিরিজায়া বাঙ্গলার উপন্যাস সাহিত্যে যেমন অপূর্ব্ব তেমনই অতুল। সে আবার শুধু মৃণালিনীর ব্যথার ভাগী নয়, পাঠক-সমাজের নিকট তাহার অন্তরের পরিচায়ক ও প্রদ্যোতক উভয়ই বটে। সে যেমন একদিকে মৃণালিনীর মূক বেদনায় সুর সংযোগ করিয়া মৃণালিনীর পক্ষে তাহার ব্যথার দুর্ব্বহ ভার লঘু করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই মৃণালিনীর বেদনাকে কীর্ত্তনের ধারায় আমাদের কানের মধ্য দিয়া মরমে পৌঁছিয়া দিয়াছে। গিরিজায়া না হইলে মৃণালিনীর মর্ম্মকথা আমাদের অন্তরে এমন মুখর হইয়া উঠিত না। দূতীগিরিতে গিরিজায়ার চেষ্টা ত ব্যর্থই হইয়াছে; শুধু ব্যর্থ নয়, মৃণালিনীর মত নায়িকা না হইলে তাহার সংশয়, তাহার ভ্রান্তি, তাহার ক্রোধ, হেমচন্দ্রের সহিত মৃণালিনীর অন্তরের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া

বিচ্ছেদই ঘটাইয়া দিত। কিন্তু যেখানেই সে দূতী না হইয়া মাত্র দরদীর সহানুভূতি ও বেদনা তাহার কর্ম্মের ধারায়, গীতের ছন্দে ও ক্রোধের দীপ্তিতে প্রকাশ করিয়াছে সেখানেই অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং তাহার চরিত্রের বিশিষ্ট সার্থকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিম যে শিল্পচাতুর্য্যে গিরিজায়াকে দূতীর সাজ দিয়া মৃণালিনীর পার্শ্ববর্ত্তিনী করিয়া রাখিয়া তাঁহার নায়িকার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা যেমন অনুপম তেমনই অন্তরস্পর্শী। বাস্তবিক—

'মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে।
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা, আয় আয় আয় রে॥'

গিরিজায়ার এই আহ্বানে পাঠক সম্প্রদায় আমরা সকলেই ত মৃণালিনীর অভিসারের অনুসরণ করিয়াছি এবং

'যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরী
সে কভু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে।'

এই ব্যথার ব্যথী না হইয়াও পারি নাই। আর, যখন মৃণালিনী অভিসারক্রমে নবদ্বীপে আসিয়া হেমচন্দ্রের অদর্শনে এক পাটনীর কুটীরে তাহার অশ্রুবিবশ দিনগুলি কাটাইয়া তনুক্ষয় করিতেছে, আর তাহারই ব্যথার বাণী শ্রীরাধার শাশ্বতী বেদনার সুরে ফুটাইয়া গিরিজায়া গাহিতেছে—

'কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান?
ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজ বধূ টুটায়ল পরাণ—

অপিচ

'আগে নাহি বুঝনু রূপ দেখি ভুলনু
হৃদি বৈনু চরণ যুগল
যমুনা সলিলে সই অব তনু ডারব
আন সখি ভখিব গরল।'

তখন সে গানের সুরে অলক্ষ্যে পাঠক আমাদের চোখের পাতা যে শুধু ভিজিয়া উঠে এমন নহে—

'কিবা কানন বল্লরী গলবেড়ি বাঁধই
নবীন তমালে দিব ফাঁস
নহে—শ্যামশ্যাম শ্যামশ্যাম, শ্যামনাম জপয়ি
ছার তনু করব বিনাশ।' ১

পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতে সে অশ্রুঝরা নিবারণ করাও দুরূহ হইয়া উঠে।

কিন্তু গিরিজায়া মৃণালিনীর ভাষার অতীত ভাবধারাকে শুধু যে গীতচ্ছন্দে রূপায়িত ও ব্যঞ্জিত করিয়াছে তাহা নহে। গিরিজায়ার চরিত্রের আর একটি লক্ষ্য করিবার দিক্‌ও আছে। সে হেমচন্দ্রের ঔদাসীন্য বা দুর্ব্ব্যবহারে এবং তাহার 'ঠাকুরাণীর' দুর্দ্দশায় তাহার নিজের মনের সরল প্রতিক্রিয়া (reactions) বা লৌকিক বিকারের দ্বারা মৃণালিনীর নির্ব্বিকার প্রেমের অলৌকিক সৌন্দর্য্যও বারে বারে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ২

১ ৩খ ৪পঃ।

২ যাঁহারা Merchant of Veniceএর Nerissaর সহিত গিরিজায়ার তুলনা করেন তাঁহারা গিরিজায়ার চরিত্রের এ সকল বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা বিস্মৃত হইয়া গিরিজায়ার সখীত্ব ও গল্পশেষে বিবাহের কথাই মনে রাখেন।

হেমচন্দ্রের প্রতি তাহার সংশয়ে মৃণালিনীর প্রেমের স্থির বিশ্বাস, হেমচন্দ্রের প্রতি তাহার অভিমানে মৃণালিনীর নিরভিমান ভালবাসা, হেমচন্দ্রের প্রতি তাহার ক্রোধে ও দুর্ব্বাক্যে মৃণালিনীর অবিচল শ্রদ্ধা ও ক্ষমাময় প্রীতি যুগপৎ বিকশিত করিয়া বঙ্কিম যে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাও সর্ব্বথা উপভোগ্য। প্রত্যুত গিরিজায়ার সাধারণ নারী-হৃদয়ের সহজ অভিব্যক্তি মৃণালিনীর অসামান্য প্রণয়ের শুভ্ররুচিই পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। অতএব সে দিক্ দিয়া গিরিজায়া চরিত্রের সার্থকতা শ্বেত শতদলের বীচিবিহ্বল-পত্রালীর শ্যামলিমার মতই সুস্পষ্ট।

মৃণালিনীর কোন ইংরাজী অনুবাদ এযাবৎ যে হয় নাই উপন্যাসখানির সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও সম্পদই তাহার কারণ। যে আত্মবিস্মৃত ও আদর্শানুগত, অতনু ও অলৌকিক, প্রেমের চিত্র মৃণালিনীর পাতায় পাতায় অঙ্কিত হইয়াছে বিলাতের হাটে বাজারে তাহা বিকাইতে পারে না। আর গিরিজায়ার গানে গানে যে ব্যথার মূর্চ্ছনা জাগিয়াছে ভারতীয় বৈষ্ণব-সাধনার বহির্ভূত দেশে কাহার মর্ম্মই বা তাহা নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিবে? ভাবে বা চিত্রে মৃণালিনী 'বিদেশ থেকে আমদানী' নহে, পরন্তু ষোল আনা আমাদের স্বদেশজাতই প্রতিপন্ন হয়।

---

# বিষবৃক্ষ

# বিষবৃক্ষ

( ১৮৭৩ * )

বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গার্হস্থ্য চিত্র বা সামাজিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকালকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার প্রথম ভাগে অর্থাৎ তাঁহার ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তিনি যে তিনখানি 'রোম্যান্স' ( কাহিনী ) লেখেন তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের উপন্যাস। দুর্গেশনন্দিনী এক হিসাবে ঐতিহাসিক উপন্যাস, যেহেতু ঐতিহাসিক ঘটনা ও কিছুকিছু ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত। কপালকুণ্ডলার একাংশও ঐতিহাসিক রসসিঞ্চিত, উপনায়িকার মারফতে ইতিহাসের সহিত যৎসামান্য যোগ রাখা হইয়াছে। মৃণালিনীর কোন মুখ্য চরিত্র ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি না হইলেও ইহার ঐতিহাসিক পটভূমিকা প্রোজ্জ্বল এবং এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত উপন্যাস-বর্ণিত কাহিনীর যোগ অচ্ছেদ্য। কিন্তু বিষবৃক্ষে ইতিহাসের বিন্দুবিসর্গও নাই। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আন্দোলনের এবং পণ্ডিত

---

* ১২৭৯ সালের অর্থাৎ প্রথম বৎসরের বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। "বঙ্গদর্শনে যে জিনিষটা সেদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ।" ( রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'শরৎচন্দ্র' 'প্রবাসী' ১৩৩৮, আশ্বিন ৮০৬ পৃঃ )।

"বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে"। ( ঐ ৮০৭ পৃঃ )

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহ প্রচলন চেষ্টার ( ১৮৫৫ ) সমকালীন সামাজিক আবেষ্টনে অঙ্কিত হিন্দু-পরিবারের চিত্র[১]। সামাজিক প্রতিবেশ প্রভাব গ্রন্থ-বর্ণিত পাত্রপাত্রীদিগের উপর যেমন সুস্পষ্ট তেমনই তাহারা সংস্কারে তৎকালীন বাঙ্গালী নরনারী। কাজেই দূর অতীতের ঐতিহাসিক চিত্র বা চরিত্র সমন্বিত, অথবা অনন্য-সাধারণ চরিত্রাবলী অবলম্বনে রচিত বিস্ময়াবহ কাহিনী পাঠের যে রুচি বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা উপেক্ষা করিয়া তিনি বিষবৃক্ষে যে নূতনশ্রেণীর উপন্যাসের প্রবর্ত্তন করেন তাহাও যে সেদিনকার পাঠকসমাজে তুল্য সমাদর লাভ করিয়াছিল[২] ইহাতে তাঁহার নূতন উপকরণে নব রস পরিবেশনের অসাধারণ দক্ষতা প্রতিপন্ন হয়। দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম প্রকাশের চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম মুদ্রণের সময় হইতে চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে কপালকুণ্ডলা মাত্র পঞ্চম সংস্করণে পৌঁছিলেও, মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষ উভয়ই ঐ সময়ের মধ্যে সপ্তম সংস্করণে উপনীত হয়।

১ বর্ণিত ঘটনার একটা সময় নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত গ্রন্থ মধ্যে করা হইয়াছে। যথা সূর্য্যমুখীর শয়নকক্ষ নির্ম্মাণের তারিখ "১৯১০ সম্বৎসর" = ১৮৫৩ খৃঃ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

২ বুঝিবা প্রথম প্রকাশের সময় অধিকতর সমাদর লাভ করিয়াছিল। "The novel......was to be found in the *baitakhana* of every Bengali Babu throughout the whole of last year." The Calcutta Review No. CXIV Critical notices p. v.

অথচ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিষবৃক্ষ বঙ্কিমের সমসাময়িক সামাজিক পরিস্থিতিতে বাঙ্গালী জীবনের প্রেম-সুখ-সৌভাগ্য, বৈধব্য-ব্যথা-দুর্ভাগ্য, এবং কামাতুরতার শোচনীয় পরিণামের ও দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী। ইহাতে একদিকে দেখিতে পাই শিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি উদারহৃদয় প্রেমময় পুরুষের (নগেন্দ্রের) পতনের ধারা, অন্যদিকে ব্যভিচারের বীভৎস পরিণাম (দেবেন্দ্র)। আর, নারী প্রেমে কত মহীয়সী (সূর্য্যমুখী), মোহে কত মুগ্ধা (কুন্দ), প্রেমতৃপ্তিতে কত লীলাময়ী (কমল), খণ্ডিত প্রেমের প্রতিহিংসায় কিরূপ প্রাণঘাতিনী (হীরা) হইতে পারে তাহার বিচিত্র আলেখ্য। একখানি নাতিবৃহৎ গার্হস্থ্য উপন্যাসে এত বিভিন্ন অথচ প্রস্ফুট চরিত্রের সমাবেশ প্রায়শঃ দেখা যায় না।

ভাবের দিক্ দিয়া বিষবৃক্ষের প্রধান অবলম্বন কি? হিন্দুর গার্হস্থ্যজীবন যে সমস্ত ভাবরসের সাধনা তন্মধ্যে দাম্পত্য-প্রেমের মাধুর্য্য ও তাহার বিকারই এই গ্রন্থের প্রধান আশ্রয়। যে মাধুর্য্যসৃষ্টিতে পূর্ব্বরাগের অবকাশ নাই কিন্তু যাহা অনুরাগে অপরিমেয় এবং সাধারণতঃ অটুট, যে অনুরাগের একদিকের কথা হইতেছে 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' আর অন্যদিকের সিদ্ধান্ত হইতেছে স্বামীই সর্ব্বস্ব, বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ জীবনে সে মাধুর্য্য যে কত গভীর প্রভাব বিস্তার করে, তাহার সদ্ভাবে যে কত সুখ, ব্যতিক্রমে যে কত বেদনা এবং অভাবে যে কত দুঃখ-দুর্দ্দশার সৃষ্টি হয়, তাহা দেখাইবার জন্যই যেন

বিষবৃক্ষের পরিকল্পনা।) এই পরিকল্পনা-প্রসূত আখ্যায়িকায় উপদেশের উপরি পাওনা পাঠকের ভাগ্যে যাহা জুটিয়াছে তাহার সম্বন্ধে আপাততঃ আমরা আলোচনা করিব না। 'গৃহসুখনিরত' বাঙ্গালীর হৃদয়ে নষ্টনীড়ের ব্যথা জাগাইয়া বিষবৃক্ষের রচয়িতা তাহাকে যে কাব্যামৃতরসপানের সুযোগ দিয়াছেন (প্রথমে) সে রসই উপভোগ্য।)

(সূচনায় দেখিতে পাই ত্রিশ বৎসর বয়সের নগেন্দ্র দত্ত ভার্য্যা সূর্য্যমুখীর মাথার দিব্য বহন করিয়া নৌকারোহণে কলিকাতায় যাইতেছেন।) 'ঝড়ের সময় কখনও নৌকায় থাকিও না' সূর্য্যমুখীর অনুরোধ বা অনুজ্ঞা। 'নগেন্দ্র স্বীকৃত হইয়া নৌকারোহণ করিয়াছিলেন, নহিলে সূর্য্যমুখী ছাড়িয়া দেন না'। যাত্রাপথে ঝড় একদিন উঠিল। গ্রন্থকার তাহার বর্ণনান্তে বলিতেছেন—

> "নগেন্দ্র বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। নৌকা হইতে ঝড়ের ভয়ে নামিলে নাবিকেরা কাপুরুষ মনে করিবে—না নামিলে সূর্য্যমুখীর নিকট মিথ্যাবাদী হইতে হয়। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন 'তাহাতেই বা ক্ষতি কি ?' আমরা জানি না, কিন্তু নগেন্দ্র ক্ষতি বিবেচনা করিতেছিলেন"।

নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর অগোচরেও তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে বা মিথ্যাচারী হইতে চাহেন না বরং ভীরুতার অপবাদ বহন করিতেও প্রস্তুত। অতএব নৌকা হইতে নামিলেন এবং জল, কাদা ও অন্ধকারে তীরবর্ত্তী গ্রামে আশ্রয় অনুসন্ধানে

চলিলেন। এই অনুসন্ধানের প্রসঙ্গে শেষ-অভিভাবক-বিরহিত নিরাশ্রয় কুন্দের সাক্ষাৎ পাইলেন এবং কলিকাতায় তাহার আত্মীয় স্থলে তাহাকে পৌঁছিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় চলিলেন। কুন্দের আত্মীয়ের সন্ধান মিলিল না, কাজেই নগেন্দ্র হইলেন তাহার আশ্রয়। কলিকাতায় ভগিনী কমলমণির বাসায় থাকার সময়েই কুন্দের রূপ যে ভাবে নগেন্দ্রের মনে লাগিল বন্ধু হরদেব ঘোষালের এমন কি ভার্য্যা সূর্য্যমুখীরও নিকট লিখিত পত্রে নগেন্দ্র সরলভাবেই তাহা জানাইলেন। নগেন্দ্র যেমন উদার-স্বভাব তেমনই অকপট। বিশেষতঃ সে রূপের প্রতি কামনা তখনও অস্ফুট, অতএব তাহার মাধুর্য্য প্রকাশে, এমন কি সূর্য্যমুখীর নিকট প্রকাশ করিতেও, দ্বিধা নাই। সূর্য্যমুখী কুন্দকে গোবিন্দপুর লইয়া যাইতে লিখিলেন, মেয়েটির সহিত তাঁহার ধাত্রীপুত্র তারাচরণের বিবাহ দিবেন, এবং রহস্য করিয়া এমনও লিখিলেন 'যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক বল, আমি বরণ-ডালা সাজাইতে বসি'। 'সূর্য্যমুখীর বয়স প্রায় ছাব্বিশ' সে যে অন্ততঃ এক যুগ ধরিয়া ( নগেন্দ্রের প্রথম যৌবনাবধি ) স্বামীর নিত্য সঙ্গিনী। তাহার সন্তান না হইলেও, আদরে, সোহাগে, স্নেহে, যত্নে, সেবায় ও আত্মনিবেদনে সে যে 'সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দ্যে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী'—স্বল্প কথায়, গ্রন্থকারের

ভাষায় নগেন্দ্রের 'নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব' হইয়া উঠিয়াছিল। আজ প্রস্ফুটিত যৌবনে, অত্যন্ত ভরসায়, অসম্ভব কল্পনার কথা তুলিয়া সে রহস্যটুকু করিলে, কবির ভাষায় যে বিধির 'অতিপ্রেম সহে না' তিনি অন্তরীক্ষ হইতে যে 'তথাস্তু' বলিবেন এমন দুর্ভাগ্যের কথা কে ভাবিতে পারে? অথচ এই Sophoclean irony, এই একান্ত বিশ্বাসের কৌতুক, অদৃষ্টের উপহাসে পরিণত হইবার নিদারুণ বেদনাই না বিষবৃক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী পরিচ্ছেদগুলিতে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত?)

বঙ্কিম কিন্তু ইহার আভাস মাত্র দিয়াই তাঁহার গল্পের গতিনির্দ্দেশ করেন নাই। স্পষ্ট করিয়া পঞ্চম পরিচ্ছেদেই জানাইয়া দিয়াছেন (নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া গোবিন্দপুর যাত্রা করিলেন আর বিষবৃক্ষের "বিষবীজ রোপণ করিলেন।") পরিণামের এতটা ইঙ্গিত একপ্রকার গ্রন্থারম্ভে দিয়া পঞ্চাশ অধ্যায়ব্যাপী আখ্যায়িকাটি কেমন করিয়া যে তিনি এমন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন যে কোথাও পাঠকের কৌতূহল হ্রাস পায় না ইহা ভাবিলেও বিস্ময় মানিতে হয়। (তারাচরণের সহিত কুন্দের বিবাহ হইল, তারাচরণের অকালমৃত্যুতে সতের বৎসরের কুন্দ বিধবা হইল, সূর্য্যমুখী সদয় স্নেহে কুন্দকে আপনার বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। গ্রন্থকার আবার বলিলেন "এতদূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।" (৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

কেমন করিয়া সেই বিষবৃক্ষ বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, নগেন্দ্র ক্রমশঃ কুন্দের প্রতি আকৃষ্ট ও আসক্ত হইলেন, সূর্য্যমুখীর কপাল ভাঙিল, নগেন্দ্রের সহিত কুন্দের বিবাহের বরণডালাই সূর্য্যমুখীকে সাজাইতে হইল এবং মরণের পথে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন, আর পরাজয়ের গ্লানি বহন করিয়াও বিজয়িনীর গৌরবে মণ্ডিত হইয়া অবশেষে ফিরিয়া আসিলেন, ইহাই ত বিষবৃক্ষের মূলকাণ্ড ও মুখ্যকাহিনী।

এই কাহিনী অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রের মধুর সম্বন্ধ ও তাহার বিপর্য্যয় সূর্য্যমুখীর বাণী ও ব্যথায় প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যে সপ্ততন্ত্রী বীণার সুরসংমিশ্রগীতিকার অবতারণা করিয়াছেন সঙ্গীতের ভাষায় তাহার আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী তিন স্তরে সূর্য্যমুখীর কথা বা লিপি তাহার ভাষা যোগাইয়াছে। আভোগ বা শেষস্তরে নগেন্দ্রের অনুশোচনার বাণীই যদি বুকফাটা ক্রন্দনে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়া থাকে, সেও সূর্য্যমুখীর সংবাদ উপলক্ষ করিয়া। সে সংবাদ তাহার ব্যথার পরিক্রমার বিবরণই হোক, আর তাহার শয়ন-গৃহের যাবতীয় সামগ্রীর মূক জল্পনাই হোক। ফল, সাধ্বী নারীর ঐকান্তিক প্রেমের প্রতি গ্রন্থকারের আন্তরিক শ্রদ্ধা সূর্য্যমুখীকে পূর্ব্বাপর নায়িকার আসনে সমাসীন রাখিয়াছে এবং তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি পাঠকের পূর্ণ সহানুভূতি সর্ব্বত্রই আকর্ষণ করিয়াছে।

এমন কি বঙ্কিম যেখানে সূর্য্যমুখীকে আদর্শ নারীরূপে কল্পনা না করিয়া তাহাকে সাময়িক অসূয়ায় বিচলিত বা বিক্ষোভে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন তাহার অব্যবহিত পরেই সূর্য্যমুখীর স্বকৃত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া নায়িকার প্রতি পাঠকের অধিকতর করুণাই জাগ্রত করিয়াছেন। )

প্রথম উদাহরণ। (কুন্দ দিনের পর দিন নগেন্দ্রের ভালবাসা অপহরণ করিতেছে। সূর্য্যমুখী 'পাপকে বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচেন।' এমন সময় হরিদাসী বৈষ্ণবীর সহিত জনান্তিকে কুন্দের আলাপ লক্ষ্য করিয়া সূর্য্যমুখী অনুসন্ধানে যখন জানিতে পারিলেন হরিদাসী কুন্দলোভী দেবেন্দ্র দত্ত, তখন তাহার সহিত বিধবা কুন্দের গোপন ব্যবহার অমার্জ্জনীয় বোধে তিনি কুন্দকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে নগেন্দ্রের বিরক্তি বাড়িয়াই উঠিল। তিনি সূর্য্যমুখীকে পরিষ্কার জানাইয়া দিলেন যে তিনি কুন্দের প্রতি অনুরক্ত, কুন্দের অনুসন্ধানে গৃহ-সংসার ত্যাগ করিবেন, দেশদেশান্তরে ফিরিবেন।) নগেন্দ্র কহিলেন—

"বাড়ী ঘর সংসারে আর (আমার) সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ নাই। আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমাকে ক্লেশ দিব না। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশ দেশান্তরে ফিরিব। তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভাবিও তুমি বিধবা—যাহার স্বামী এইরূপ পামর, সে বিধবা নয়ত কি? কিন্তু আমি পামর হই আর যাই হই তোমাকে প্রবঞ্চনা

করিব না। এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। * * * যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি তবে আবার আসিব। নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ।"১

'এই শেল-সম কথা শুনিয়া' সূর্য্যমুখী কি করিলেন? বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা—

"কয়েক মুহূর্ত্ত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ পৃথিবীপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সেই ভূতলে অধোমুখে শুইয়া পড়িলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া। সূর্য্যমুখী—কাঁদিলেন কি? হত্যাকারী ব্যাঘ্র যেরূপ হতজীবের যন্ত্রণা দেখে, নগেন্দ্র সেইরূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। মনে মনে বলিতেছিলেন—"সেই ত মরিতে হইবে—তার আর আজ কাল কি? জগদীশ্বরের ইচ্ছা—আমি কি করিব? * * * আমি মরিতে পারি, কিন্তু তাহাতে সূর্য্যমুখী বাঁচিবে?"

"দণ্ডেক পরে সূর্য্যমুখী উঠিয়া বসিলেন। আবার স্বামীর পায়ে ধরিয়া বলিলেন, 'এক ভিক্ষা'।

ন। কি?

সূ। আর এক মাস মাত্র গৃহে থাক। ইতিমধ্যে যদি কুন্দ-নন্দিনীকে না পাওয়া যায়, তবে তুমি দেশত্যাগ করিও। আমি মানা করিব না।

নগেন্দ্র মৌনভাবে বাহির হইয়া গেলেন। মনে মনে আর একমাস থাকিতে স্বীকার করিলেন। সূর্য্যমুখীও তাহা বুঝিলেন। তিনি গমনশীল নগেন্দ্রের মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়াছিলেন। সূর্য্যমুখী মনে

---

১ একবিংশ পরিচ্ছেদ ৭১ পৃঃ। নগেন্দ্র গোবিন্দলাল নহেন; নিজের অপরাধ ভুলিয়া পত্নীর অপরাধ গুরুতর ধারণা করিবার প্রকৃতি প্রবৃত্তি তাঁহার নহে বা নাই।

মনে বলিতেছিলেন, 'আমার সর্ব্বস্বধন! তোমার পায়ে কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড়, না আমি বড়?'১

তাহার পর একদিন কুন্দ আসিল নগেন্দ্রের দর্শনলালসায় অলক্ষিতে অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যানে। সূর্য্যমুখী কুন্দের দেখা পাইয়া হাত ধরিলেন, এবং 'এসো, দিদি! এসো। আর আমি তোমায় কিছু বলিব না,' বলিয়া একপ্রকার অপরাধ স্বীকার করিয়া, কুন্দকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।২

দ্বিতীয় উদাহরণ—সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ সম্বন্ধে দুইটি কথার পরিষ্কার ধারণা আমাদের থাকা দরকার। প্রথমতঃ, গৃহত্যাগের সঙ্কল্প সূর্য্যমুখীর মৌলিক কল্পনা নহে। আমরা দেখিয়াছি নগেন্দ্র প্রথমে এই কল্পনা করেন। সে যাহা হোক ইহা "প্রাচীন সাহিত্য ও সমাজরীতির" অনুসরণ নহে। সে কালে কুলনারী কেহ গৃহত্যাগ করিত না। অতএব conventionকে বঙ্কিম এখানে উপেক্ষাই করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, সূর্য্যমুখী অভিমানে গৃহত্যাগ করেন নাই। প্রশ্ন হইবে, সূর্য্যমুখী না লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন 'আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না,' 'কুন্দনন্দিনী থাকিলে আমি আর এদেশে আসিব না'? তবে কি ভর্ত্তৃহরির সেই কথা হইল না—

'ন মানিনী সংসহতেঽন্যসঙ্গমম্'?

১ ঐ ৭১, ৭২ পৃঃ। ২ ২৩পৃঃ ৭৭ পৃঃ।

—না। বরং বৈষ্ণব কবি সহজিয়া সুরে

'আমার বঁধুয়া আনবাড়ি যায়
আমার আঙিনা দিয়া'

এই পদে আত্মনিবেদিত অথচ উপেক্ষিত নারীহৃদয়ের যে ক্রন্দনকে চিরধ্বনিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন সূর্য্যমুখীর উক্তিতে সেই আক্ষেপই ফুটিয়া উঠিয়াছে। নতুবা অভিমানের মধ্যে যে আত্মাদর বা আত্মশ্লাঘা সুপ্ত থাকে সূর্য্যমুখীর মধ্যে তাহা কই? শ্লাঘা বা গর্ব্ব যদি তাঁহার কিছু থাকে সে স্বামি-সৌভাগ্যের গর্ব্ব—'কে এমন স্বামী পেয়েছে?' (২৭ পরিচ্ছেদ)। পলায়নের পূর্ব্বে কমলকে লিখিত পত্রে তাহাই প্রকাশ। সূর্য্যমুখী লিখিতেছেন—

"তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও যে তাঁহার উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁহার উপর আমার রাগ নাই; কখনও তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখনও করিব না। যাঁহাকে মনে হইলেই আহ্লাদ হয় তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি তাহাই রহিল, যতদিন না মাটিতে এ মাটি মিশে, ততদিন থাকিবে। কেন না তাঁহার সহস্র গুণ আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। এতগুণ কাহারও নাই। এতগুণ কাহারও নাই বলিয়াই আমি তাঁহার দাসী। একদোষে যদি তাঁহার সহস্রগুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি।"*

এইখানে সূর্য্যমুখীর সহিত বঙ্কিমের অপর সৃষ্টি ভ্রমরের

* ২৮ পঃ ৮৯-৯০ পৃষ্ঠা।

বিভিন্নতা। এইখানে সূর্য্যমুখী আর যাহা হোক মিস্ টেম্পল্এর ছাত্রী নয় বা শাড়ীপরা মেম নয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের বিধান আমাদের সমাজে যদি তখন থাকিত তাহা হইলেও কোন অজুহাতেই বিবাহবিচ্ছেদের মোকদ্দমা উপস্থিত করা এ হেন সূর্য্যমুখীর পক্ষে সম্ভব হইত না। সে হিসাবে সূর্য্যমুখীচরিত্র হয়ত 'পৌরাণিক'।

কিন্তু সূর্য্যমুখীর দ্বারা বঙ্কিম যাহা করাইলেন তাহাতে 'সমাজপতি বঙ্কিমে'র নহে, পরন্তু নারীর মর্য্যাদাবোধসম্পন্ন সংস্কারক অথচ হিন্দুর আদর্শনিষ্ঠ বঙ্কিমের পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃসহ দুঃখভারে সূর্য্যমুখী কতকটা আধুনিক রকমে গৃহত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু বিজাতীয় ক্রোধে নহে, নূতন সংসার পাতাইবার জন্য বা আত্মহত্যার উদ্দেশ্যেও নহে। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া দুঃসহ মর্ম্মবেদনায় ক্লেশের জীবন বরণ করিয়া লইলেন। চিঠিতে তিনি 'জন্মের মত বিদায় লইলাম' লিখিয়া গেলেও তাঁহার মনের অন্তস্তলে হয়ত এমন ধারণা ছিল যে আমার স্বামীকে আমি যখন সুশিক্ষিত, উদারহৃদয়, প্রেমময়, ধর্ম্মবোধসম্পন্ন পুরুষ বলিয়াই জানি তখন আমার স্বেচ্ছায় অঙ্গীকৃত দুঃখ তাঁহার সাময়িক মতিভ্রম দূর করিয়া তাঁহাকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিবে। বঙ্কিমের রচনা-নৈপুণ্যে হইল কিন্তু তাহাই। বঙ্কিম দেখাইলেন flat life যে সভ্যতার ফল বা অঙ্গ, নব নব ইন্দ্রিয়সুখে যে সভ্যতার জীবনমান নির্দ্দিষ্ট হয়, নগেন্দ্র সে সভ্যতার বা সে সংস্কৃতির সন্তান নহেন।

কাজেই সূর্য্যমুখী-ছাড়া গৃহ কোনদিন তাঁহার কল্পনায় আসে নাই। যখন বলিতেছেন কুন্দকে তিনি দেশে দেশে খুঁজিয়া ফিরিবেন তখনও দেখি মনে করিতেছেন তিনি সূর্য্যমুখীর 'অযোগ্য স্বামী', গৃহাশ্রমে তাঁহার স্থান নাই, কিন্তু সূর্য্যমুখী সে গৃহে বিরাজ করিবেন, গৃহের সে আলো নিভিবে না। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগে সে আলো যে দিন নিভিল সে দিন এক অনভ্যস্ত অন্ধকার, এক অভাবনীয় শূন্যতা, তাঁহার চিত্ত অভিভূত করিল। সে অন্ধকারে কুন্দ অদৃশ্য, সে শূন্যতায় কুন্দ বিলীন। অধিকন্তু তিনি জানিতেন সূর্য্যমুখীর জীবনের প্রধান অবলম্বন তাঁহার ভালবাসা, সে ভালবাসা হারাইয়া সুয্যমুখী যে বাঁচিবে না সে আশঙ্কা তাঁহার ছিল—একবিংশ পরিচ্ছেদের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তিতেই তাহা প্রকাশ। কাজেই সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগে যে ধাক্কা পাইলেন তাহাতে কুন্দের নেশা শুধু ছুটিল না, সূর্য্যমুখী গৃহ ছাড়িয়া অনশনে বা অর্দ্ধাশনে, ক্লান্ত চরণে, বা পরাশ্রয়ে যতদূর যাইতে লাগিলেন, নগেন্দ্র ততই ব্যাকুল হইয়া তাঁহার অনুসরণে ছুটিলেন। নায়কের সহিত পাঠকের সহানুভূতিও ঐ দূরপথচারিণীর অনুসরণ করিতে লাগিল। )

কিন্তু নগেন্দ্র যখন সূর্য্যমুখীর অন্বেষণে কাশী গেলেন বা যাইবেন তখন সূর্য্যমুখীকে গ্রন্থকার সেকালের কাশীর পথ—বর্ত্তী হইতে ফিরাইলেন কেন? এ পরিকল্পনার তাৎপর্য্য কি? একটা সহজবোধ্য ব্যঞ্জনা অবশ্য এই যে, যে দিন সূর্য্যমুখী

কাশীর অধিকাংশ পথ অতিক্রম করিয়াও সহযাত্রীর সঙ্গ ছাড়িয়া পদব্রজে ফিরিলেন সে দিন বিশ্বনাথ অপেক্ষা নগেন্দ্র-নাথের আকর্ষণ তাঁহার মনে যে শুধু অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে, সে দিন নগেন্দ্র 'কুন্দনন্দিনীর হইয়াছেন' ইহা দেখার বেদনা অপেক্ষাও নগেন্দ্রের অদর্শন-যাতনা গুরুতরই মনে হইয়াছিল। হরদেব ঘোষাল সত্যই অনুমান করিয়াছিলেন নগেন্দ্রকে না দেখিয়া সূর্য্যমুখী কতদিন থাকিতে পারিবেন ? কাজেই কুন্দ থাকিতে তিনি আর গৃহে ফিরিবেন না এই সঙ্কল্প শিথিল করিয়া নগেন্দ্রের পিছু ডাক সূর্য্যমুখীকে যে ফেরার পথে তুলিয়া দিল, ইহাতে অশিক্ষিত নারীহৃদয়ের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইয়াছে যিনি বলিতে চাহেন বলিতে পারেন, কিন্তু যে আকর্ষণ অদর্শনে অধিকতর প্রবল হইয়া কুন্দের বাধা পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দিল তাহার গুরুত্ব প্রদর্শনের জন্য অবশ্য মধ্যপথ হইতে এই প্রত্যাবর্ত্তন-কল্পনা।

এই প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সূর্য্যমুখীর অন্তরের সংবাদ আমরা কি পাই ? মধুপুরে হরমণির গৃহে মৃত্যুশয্যা শায়িতা সূর্য্যমুখী ব্রহ্মচারীকে বলিতেছেন—

"এখন মরিতে বসিয়াছি—লজ্জাই বা এসময়ে কেন করি ? আর আমার মনোদুঃখ কিছুই নয়—কেবল মরিবার সময়ে যে স্বামীর মুখ দেখিতে পাইলাম না, এই দুঃখ। মরণেই আমার সুখ—কিন্তু যদি তাঁহাকে না দেখিয়া মরিলাম, তবে মরণেও দুঃখ। যদি এ

সময় একবার তাঁহাকে দেখিতে পাই তবে মরণেই আমার সুখ'।

"ব্রহ্মচারীও চক্ষু মুছিলেন। বলিলেন 'তোমার স্বামী কোথায়? এখন তোমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি যদি সংবাদ দিলে এখানে আসিতে পারেন, তবে আমি তাঁহাকে পত্রের দ্বারা সংবাদ দিই'।

"সূর্য্যমুখীর রোগক্লিষ্ট মুখে হর্ষবিকাশ হইল। তখন আবার ভগ্নোৎসাহ হইয়া কহিলেন, 'তিনি আসিলে আসিতে পারেন, কিন্তু আসিবেন কি না জানি না। আমি তাঁহার কাছে গুরুতর অপরাধী—তবে তিনি আমার পক্ষে দয়াময়—ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু তিনি অনেক দূরে আছেন—আমি ততদিন বাঁচিব কি?

* * * *

"ব্র। বাঁচিবে। এই বলিয়া ব্রহ্মচারী...সূর্য্যমুখীর কথামত...পত্র লিখিলেন...নগেন্দ্রদত্তের নামে শিরোনামা দিয়া ব্রহ্মচারী পত্রখানি নিকটস্থ ডাকঘরে দিতে গেলেন।

"...তখন সূর্য্যমুখী সজলনয়নে যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে, জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে ভিক্ষা করিলেন, হে পরমেশ্বর! যদি তুমি সত্য হও, আমার যদি পতিভক্তি থাকে, তবে যেন এই পত্রখানি সফল হয়। আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন অন্য কিছুই জানি না—ইহাতে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যের ফলে আমি স্বর্গ চাহি না। কেবল এই চাই, যেন মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখিয়া মরি।"*

ভারতীয় নারীর অন্তিম চিন্তাধারা ও শেষ আকাঙ্খা

* ৩৫ পঃ ১০৭-১০৮ পৃঃ

সূর্য্যমুখীর বাণীতে বঙ্কিম যে ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহার বাস্তব সঙ্গতি আজও অস্বীকার করা কঠিন। ঐকান্তিক প্রেমসাধনার জীবনে ব্যর্থতাই যখন চূড়ান্ত ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন মরণই ত সুখের বিষয় বটে। কিন্তু যাহাকে উপলক্ষ করিয়া সেই সাধনার জীবন সুখেই হোক আর দুঃখেই হোক কাটিল, তাহার সাক্ষাৎ যদি জীবনের চরম মুহূর্ত্তেও না মিলিল তবে বিফলতার মাঝেও জীবনের সম্পূর্ণতা উপলব্ধি হয় কেমন করিয়া? ভ্রমরকেও তাই আসন্ন মৃত্যুকালে গোবিন্দলালের সাক্ষাৎ পাইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিতে দেখিব। কিন্তু সূর্য্যমুখীতে আরও লক্ষ্যণীয় এই যে সে দিন মৃত্যুর ছায়ায় সূর্য্যমুখীর চিন্তাধারার মধ্যে অপরের অপরাধ চিন্তার অবকাশ নাই। গৃহধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাঁহার সেকালের ধারণামত স্বকৃত অপরাধ—যে অপরাধে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া অপরাধী তাহাই—তাঁহার মনে নিয়ত উদয় হইতেছে। সেই অপরাধের অববোধে নগেন্দ্রের সব-ক্রটিবিচ্যুতি-বিস্মৃত-সূর্য্যমুখীর চিন্তায় অতীত সুখের দিনের আসল অবিকৃত নগেন্দ্রের প্রেমময় স্মৃতিই জাগিয়া উঠিতেছে। অত্যুদার ক্ষমাগুণে মৃত্যু-শয্যাশায়িনী সূর্য্যমুখী বেদনাক্লিষ্ট মুমূর্ষু ভ্রমর হইতে কত না বিভিন্ন। তবু সূর্য্যমুখী বঙ্কিমের অভিনব কল্পনা (figment of imagination) মাত্র নহে। অন্তরের সমগ্র শ্রদ্ধা দিয়া আঁকা প্রেমময়ী ক্ষমাময়ী ভারতীয় নারীর প্রোজ্জ্বল প্রতিকৃতি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের উক্তি* সূর্য্যমুখী বঙ্কিমের সহধর্ম্মিণীর চিত্র সত্য বলিয়াই মনে হয়। কারণ রঙের গুটিকা যে স্নেহনীরে গুলিয়া গ্রন্থকার সূর্য্যমুখী-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা যে অন্তরের ক্ষরিত মধু—বিষবৃক্ষ পড়িতে বঙ্কিমের উদ্গত অশ্রু যাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন নাই তাঁহাদেরও অনুভবগম্য। সমসাময়িক সাহিত্যিকদিগের কোন উক্তি না থাকিলেও বিষবৃক্ষ যে বাঙ্গলার উপন্যাস-সাহিত্যে

"কালের কপোলতলে শুভ্রসমুজ্জ্বল
এ তাজমহল"

ইহার ভাবঘন রচনায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ জীবনের অভিজ্ঞতা-মূলে' বঙ্কিম সূর্য্যমুখীর প্রেমের যে অমৃতধারা বিষবৃক্ষে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন তাহা আধুনিক সমালোচনার দৃষ্টিতে নাকি "চিরপ্রথাগত পৌরাণিক তটভূমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ"! )

সে যাহা হোক একদিকের সঙ্কল্পচ্যুতি, অসূয়ার অবসান, উদ্বেলিত অনুরাগের দীনতায় পুনর্মিলনের অন্তরায় দূরিত হইতে দেখিলাম। অন্যদিকের অবস্থা কি?

সুলভ সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পরে নগেন্দ্র দুষ্প্রাপ্য

---

* "তিনি কি পড়িবেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।...আমি বলিলাম—বিষবৃক্ষ। ...তিনি বিষবৃক্ষ খুলিয়া যেখানে কমলমণির কাছে সূর্য্যমুখী তাঁহার পতিপ্রাণতা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছেন সেই স্থানে পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া কাঁদিয়া

সূর্য্যমুখীর মূল্য মাত্র বুঝিয়া সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু তখনও অপ্রাপ্য সূর্য্যমুখী যে কত অমূল্য তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তাই মৃত্যুর ছায়ায় চিরন্তন মূল্য বিচারের ক্ষেত্র রচনার প্রয়োজন হইয়াছে। ব্রহ্মচারীর পত্র কাশীতে বিলম্বে পাইয়া নগেন্দ্র যখন মধুপুরে আসিয়া শুনিলেন হরমণির গৃহদাহে সূর্য্যমুখীর দেহান্ত হইয়াছে তখন তিনি গোবিন্দপুরে চলিলেন 'গৃহধর্ম্মের নিকট জন্মের শেষ বিদায় লইতে'। তিনি—

"ভাবিয়া দেখিলেন, সব তাঁরই দোষ। তাঁহার তেত্রিশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছে। ইহারই মধ্যে তাঁহার সব ফুরাইল। অথচ জগদীশ্বর তাঁহাকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহার কিছুই ফুরাইবার নহে। যাহাতে যাহাতে মনুষ্য সুখী, সে সব তাঁহাকে ঈশ্বর যে পরিমাণে দিয়াছিলেন, সে পরিমাণে প্রায় কাহাকেও দেন না। ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, মান, এ সকল ভূমিষ্ঠ হইয়াই অসাধারণ পরিমাণে পাইয়াছিলেন। বুদ্ধি নহিলে এ সকলে সুখ হয় না—তাহাতে বিধাতা কার্পণ্য করেন নাই। শিক্ষায় পিতামাতা ত্রুটি করেন নাই—তাঁহার তুল্য সুশিক্ষিত কে? রূপ, বল, স্বাস্থ্য, প্রণয়শীলতা, তাহাও ত প্রকৃতি তাঁহাকে অমিতহস্তে দিয়াছেন। ইহার অপেক্ষাও যে ধন দুর্লভ—যে একমাত্র সামগ্রী এ সংসারে অমূল্য—অশেষপ্রণয়শালিনী সাধ্বী ভার্য্যা—ইহাও

ফেলিলেন এবং বলিলেন 'বিষবৃক্ষ আমি পড়িতে পারি না'।...আমাকে অক্ষয়বাবু সত্যই বলিয়াছিলেন বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে নভেলিষ্ট করিয়াছে। তিনিই সূর্য্যমুখী।" (নবীনচন্দ্র সেন: 'আমার জীবন' ২য় ভাগ ৩৬৬ পৃঃ)।

তাঁহার প্রসন্ন কপালে ঘটিয়াছিল। সুখের সামগ্রী পৃথিবীতে এত আর কাহার ছিল? আজি এত অসুখী পৃথিবীতে কে? আজ যদি তাঁহার সর্ব্বস্ব দিলে—ধন, সম্পদ, মান, রূপ, যৌবন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সব দিলে, তিনি আপন শিবিকার একজন বাহকের সঙ্গে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে স্বর্গসুখ মনে করিতেন। বাহক কি? ভাবিলেন, এই দেশের রাজকারাগারে এমন কে নরঘ্ন পাপী আছে যে আমা অপেক্ষা সুখী নয়? আমা হ'তে পবিত্র নয়? তারা ত অপরকে হত্যা করিয়াছে, আমি সূর্য্যমুখীকে বধ করিয়াছি। আমি ইন্দ্রিয় দমন করিলে সূর্য্যমুখী বিদেশে আসিয়া কুটীরদাহে মরিবে কেন? আমি সূর্য্যমুখীর বধকারী—কে এমন পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পুত্রঘ্ন আছে যে আমার অপেক্ষা গুরুতর পাপী?"

*   *   *   *

"তখন মনে করিলেন, এ জীবন এই সূর্য্যমুখীর বধের প্রায়শ্চিত্তে উৎসর্গ করিব। কি প্রায়শ্চিত্ত?...সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া অবধি যে সকল ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন আমি সেই সকল ক্লেশভোগ করিব। যে দিন গোবিন্দপুর হইতে যাত্রা করিব, সেইদিন হইতে আমার গমন পদব্রজে, ভোজন কদন্ন, শয়ন বৃক্ষতলে বা পর্ণকুটীরে। আর কি প্রায়শ্চিত্ত?...যে অর্থ নিজ ব্যয়ার্থে (রাখিব), সেই অর্থে আপনার প্রাণধারণমাত্র করিয়া অবশিষ্ট সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যার্থে ব্যয় করিব। যে সম্পত্তি স্বত্বত্যাগ করিয়া সতীশকে দিব, তাহারও অর্দ্ধাংশ আমার যাবজ্জীবন সতীশ সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যার্থে ব্যয় করিবে ইহাও দানপত্রে লিখিয়া দিব। প্রায়শ্চিত্ত! পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়। দুঃখের ত প্রায়শ্চিত্ত

নাই। দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। মরিলেই দুঃখ যায়। সে প্রায়শ্চিত্ত না করি কেন ?"*

নগেন্দ্রের অনর্গল হৃদয়ের এই গভীর আক্ষেপ ও অনুশোচনায় আমরা কি দেখিতে পাই? (সূর্য্যমুখীর প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ অনুরাগের অপরিমেয় গভীরতা ও তাঁহার অপরাধের গুরুত্বের অকপট অনুভূতি। সূর্য্যমুখীর মৃত্যু-সংবাদে 'অশেষ প্রণয়-শালিনী সাধ্বী ভার্য্যার' হত্যাকারী কল্পনায় নগেন্দ্র আপনাকে নিকৃষ্টতম নরঘাতকের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া মহাপাতকোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সকল সুখ বর্জ্জন করিয়া, সকল ক্লেশ বিশেষতঃ 'সূর্য্যমুখী যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন,' তাহা সাদরে অঙ্গীকার করিয়া; আর, প্রায়শ্চিত্তে যখন দুঃখের অন্ত নাই, তখন স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিয়া। যে অনুশোচনা ও গুরুবিরহে নগেন্দ্রের চক্ষে জগতের সকল আকর্ষণ, জীবনের সমস্ত আলো, এমন ভাবে লুপ্তপ্রায় তাহার মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনার মধ্যেই আমরা নগেন্দ্রের নৈতিক পুনরভ্যুদয়ের (moral resurrectionএর) এবং নায়কত্বের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই।[১])

ইহার পরে সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রের মধ্যে কোন ব্যবধানই থাকিতে পারে না। নায়কের বিরহকাতরতা তীব্রতর করিয়া

---

* ৩৮ পঃ ১১৫-১১৬ পৃঃ।

১ রবীন্দ্রনাথ যে বিষবৃক্ষ পাঠকালে "পাঠকের কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রমের" কথা লিখিয়াছেন তাহা নগেন্দ্রের অনুশোচনার বর্ণনা স্মরণ করিয়াই লিখিয়াছেন মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য বর্ণনার সার্থকতার যথোচিত পরিমাপ।

তুলিয়া দেশকালের ব্যবধানটুকু দূর করিবার জন্য গল্পটিকে নৈপুণ্যসহকারে আরও কয়েক পরিচ্ছেদে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। নতুবা বিষবৃক্ষের বাণী—অসংযমের বিষময় ফল ও মর্ম্মন্তুদ অনুশোচনা—এইখানেই পরিব্যক্ত। ইহার পরে বিষবৃক্ষের যে শেষ অঙ্ক আরম্ভ হইল তাহাতে অশ্রু-সাগরের অতলে নগেন্দ্র নির্ব্বাসিতা গৃহলক্ষ্মীর সন্ধান পাইলেন। সূর্য্যমুখীর প্রেম নগেন্দ্রকে যে গৃহের ইষ্টদেবতারূপে কল্পনা করিয়াছিল, সেই গৃহে সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসিলেন নগেন্দ্রের চিরবাঞ্ছিতারূপে। পরাভবের গ্লানি বহন করিয়া যেখান হইতে একদিন সূর্য্যমুখীকে বিদায় লইতে হইয়াছিল, বিজয়িনীর বিপুল গৌরবে সেইখানেই তাঁহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্কিম কাশীতে নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর পুনর্মিলন সংঘটিত করেন নাই। বহ্নী হইতে সূর্য্যমুখীকে ফিরাইবার পরিকল্পনার ইহা অন্যতম তাৎপর্য্য।)

নগেন্দ্রের আত্মলাভের পরে গল্পের দিক্ হইতে কুন্দ-নন্দিনীর বর্ত্তমান থাকিবার আর কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। তাই(গল্পশেষে সংসার-রঙ্গমঞ্চ হইতে কুন্দ সরিয়া গেল। রাখিয়া গেল নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর পুনর্মিলন ছায়াচ্ছন্ন, নগেন্দ্রের ললাট মসীলিপ্ত এবং গল্পটিকে একদিকে বিয়োগান্ত করিয়া।| যে বিকার বা বিক্ষেপ সৃষ্টির জন্য তাহার পরি-কল্পনা তাহাতে সে অক্ষম হয় নাই, বরং পূর্ণমাত্রায় সক্ষম হইয়াছে। তবু যে সে পাঠকের ক্ষমা মাত্র নহে পরন্তু

সহানুভূতি আকর্ষণ করে তাহার কারণ এই যে এমন নম্র, সরল, প্রকাশভীরু, প্রলুব্ধকারিণীর চিত্র সচরাচর দেখা যায় না। কুন্দের মৃদু বাস ফুলধনুর যত বার্ত্তাই বহন করিয়া আনুক রোহিণী-জাতীয় উপনায়িকার বর্ণবাহুল্য বা তীব্র বাস ইহাতে মোটেই নাই। বর্ণে এই চিত্র একেবারেই loud নহে।

বঙ্কিম যে শুধু স্বল্প বর্ণে ও মৃদুস্পর্শে এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাও নহে, এমন স্নেহার্দ্র তুলিকায় চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন যে কুন্দ বিষবৃক্ষের একজন লালনকারিণী হইলেও তাহার দুর্ব্বলতার অপেক্ষা দুর্ভাগ্যই তাহার পরিণামের জন্য যেন অধিকতর দায়ী মনে হয়। ফলে কুন্দের কাজ পাঠকের অনুমোদিত না হইলেও কুন্দ শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের অনুকম্পা লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকার যেন বলিতে চাহিয়াছেন যদি তাহার শেষ অভিভাবক পিতামহের মৃত্যু না হইত তাহা হইলে কুন্দকে অজ্ঞাত, অপরিচিত পুরুষের আশ্রয়ে যাইতে হইত না। সত্য বটে তাহার মাতার স্বপ্নদৃষ্ট ছায়ামূর্ত্তি তাহাকে নগেন্দ্রের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়াছিল, কিন্তু তাহার স্বগ্রামবাসী কেহ যখন তাহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিল না তখন স্বপ্নের নির্দ্দেশ যাহাই হোক নগেন্দ্রের সহিত কলিকাতায় যাওয়া ব্যতীত গত্যন্তরই বা কি ছিল? কলিকাতায় যদি তাহার আত্মীয় বিনোদ ঘোষের সন্ধান মিলিত তাহা হইলে হয়ত তাহাকে নগেন্দ্রের আশ্রয়

গ্রহণ করিতে হইত না। নগেন্দ্রের সাহচর্য্যে আসিয়াই না তাহার আসন্ন যৌবনোদয়ের দিনে সে নগেন্দ্রকে ভালবাসিল? তারাচরণের সহিত যদি বা তাহার বিবাহ হইল, দুর্ভাগ্যক্রমে তিন বৎসরের মধ্যে প্রথম যৌবনেই তাহাকে বিধবা হইতে হইল। বিধবা হইয়া নিঃসহায় কুন্দকে আবার আসিতে হইল নগেন্দ্রের আশ্রয়ে ও সন্নিধানে। গ্রন্থকার এমনই করিয়া অভাগিনীর দুর্ভাগ্য-কাহিনী ও extenuating circumstances রচনা করিয়াছেন। তাহার স্বরোপিত বিষবৃক্ষ যখন শাখা বিস্তার করিল তখন সে তাহা ছেদনের চেষ্টা করিল না, এমন কি কমলের উপদেশেও কলিকাতায় যাইতে রাজী হইল না সত্য; কিন্তু যে সংযম সূর্য্যমুখীর স্বামীর পক্ষে ত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াও অবলম্বন করা সম্ভব হয় নাই, তাহা সদ্যস্ফুরিতযৌবনা বালবিধবা কুন্দের পক্ষে অবলম্বন করা সুকঠিন। কাজেই কুন্দ আপনার বিষবৃক্ষের ফল আস্বাদন করিতে গিয়া মৃত্যুই লাভ করিল। বঙ্কিম অবশ্য বলিতে চাহিয়াছেন শিশু অগ্নিশিখায় আকৃষ্ট হইয়া অনলকুণ্ডে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া ত অগ্নির দাহিকা-শক্তি লোপ পাইবে না।

বিষবৃক্ষে কুন্দ যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে অনেকে তাহা সামাজিক হিসাবে বালবিধবার সমস্যা বলিয়া মনে করেন। আমরা কিন্তু মনে করি সতর বৎসরের অবিবাহিতা কন্যা বিষবৃক্ষের বর্ণিতকালে বাঙ্গালী ভদ্রঘরে সুলভ ছিল না

সমাজ ব্যবস্থায় বা বাহ্যবিধানের দ্বারা তাহা নিয়মিত হইবার নহে। চিত্তসংযমের দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত করা ব্যতীত মানুষের কল্যাণ নাই ইহাই বিষবৃক্ষে বঙ্কিম-প্রচারিত বাণী এবং গ্রন্থমধ্যে তাহা নিম্নলিখিত-রূপে সমীরিত—

"যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গনে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্যই ইহার বীজ—ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে। কেহ এমন মনুষ্য নাই যে তাহার চিত্ত রাগদ্বেষকামক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে এই সকল রিপু কর্ত্তৃক বিচালিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সংযত করিতে পারেন এবং সংযত করিয়া থাকেন সেই ব্যক্তি মহাত্মা; কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না তাহার জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর। তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি।...চিত্তসংযমপক্ষে প্রথমতঃ চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ চিত্তসংযমের শক্তি আবশ্যক। ইহার মধ্যে শক্তি প্রকৃতিজন্যা; প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা। প্রকৃতিও শিক্ষার উপরে নির্ভর করে। সুতরাং চিত্তসংযমপক্ষে শিক্ষাই মূল।"..."মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক"[১]।

প্রথম গার্হস্থ্য বা সামাজিক উপন্যাস রচনা করিতে গিয়া গৃহের ও সমাজের পবিত্রতা বৃদ্ধির জন্য লোকশিক্ষক বঙ্কিম রূপলেখায় ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার মুখবন্ধের বাণী—

---

১ ২৯শ পরিচ্ছেদ, ৯০-৯১ পৃঃ।

"আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ"।

* * * *

"তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ !
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্"।[২]

ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন—প্রধানতঃ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে আবেদন করিয়া নহে, প্রেম-জগতে অসংযমের শোকাবহ পরিণামের চিত্রাবলীর বেদনা পাঠকের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া। তাহা হইলেও ইহা কি সেই সেকেলে 'বস্তাপচা' সন্ন্যাসতত্ত্ব ( ascetic philosophy ) নহে বঙ্কিম যাহা উপন্যাসের মারফতে প্রচার করিতে চাহিয়াছেন? কোনটা সেকালের কোনটা একালের, চিরন্তন সত্য সম্বন্ধে তাহা বলা যেমন কঠিন তেমনই সন্ন্যাসজীবনেই সংযমের প্রয়োজন আছে সংসারক্ষেত্রে নাই একথাও বলা চলে না। যাহা হোক ভারতের ভগবান যিনি

'ধর্ম্মাবিরুদ্ধভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ !'

বলিয়াও আত্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, যিনি আত্মজয় ( sublimation ) ব্যতীত আত্মনিগ্রহের ( repression ) উপদেশ দেন নাই, তাঁহার বাণীর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ভারতের নবযুগের ঋষি এ কথা বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই যে—

---

২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩।৩৯, ৩।৪১।

"যে বৃত্তির কল্পিত অবতার বসন্ত-সহায় হইয়া মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে কবির বর্ণনায় মৃগেরা মৃগীদিগের গাত্রে গাত্রকণ্ডূয়ন করিতেছে, করিগণ করিণীদিগকে পদ্মমৃণাল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে এই রূপজ মোহমাত্র। এ বৃত্তিও জগদীশ্বর প্রেরিতা ; ইহা দ্বারাও সংসারের ইষ্টসাধন হইয়া থাকে এবং ইহা সর্ব্বজীবমুগ্ধকরী।" ১

কিন্তু সন্ন্যাসধর্ম্মী না হইলেও বঙ্কিম প্রবৃত্তিপরায়ণতার সমর্থক ( voluptuary ) বিজ্ঞানবাদী ( sensationist ) নহেন। মানুষের বুদ্ধিগত বৈশিষ্ট্য, নীতিগত গৌরব, এবং ভাবের গভীরতা, এক কথায় মানবধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকশিক্ষক বঙ্কিম পরক্ষণেই তাই বলিতেছেন—

"কিন্তু ইহা প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন। এই যথার্থ প্রণয়।" "মনের অনেকগুলি ভাব আছে তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায়, অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃপ্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়।"১

বঙ্কিম তাঁহার প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যায় এতটা আয়াস স্বীকার করিলেও আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার সমসাময়িক কোন কোন

---

১ ৩২শ পরিচ্ছেদ, ৯৭ পৃঃ।

সাহিত্যরথী যথা কবিবর নবীনচন্দ্র "প্রেমের কাহিনী অবাধ প্রচারের দ্বারা বঙ্কিম দেশের অহিত করিয়াছেন" বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পক্ষান্তরে আধুনিকী প্রেমকল্পনা যখন জৈব মোহ ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ('natural selection'এর) পরিধি মধ্যে আত্মসুখান্বেষণের বার্ত্তা বহিয়া বিব্রত, তখন এ যুগের সমালোচক যে বলিলেন "বঙ্কিমের প্রেমের ধারণা প্রাচীন সাহিত্য ও সমাজরীতি হইতে সংগৃহীত, তাঁহার ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনীর মধ্যে প্রেমের যে ধারা প্রবাহিত হইয়াছে তাহা মোটের উপর চিরপ্রথাগত পৌরাণিক তটভূমির মধ্যে সীমাবদ্ধ"[1] তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।[2]

আমরা আরম্ভেই বলিয়াছি বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনে দাম্পত্যপ্রেমের সদ্ভাব, সাময়িক ব্যতিক্রম এবং বিকার-বিপর্য্যয় কত সুখ, কত ব্যথা, কত দুর্দ্দশা সৃষ্টি করে বিষবৃক্ষে বঙ্কিম তাহারই বিভিন্ন ছবি দেখাইয়াছেন। এই প্রেমের আনন্দোচ্ছল, নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ আমরা দেখিতে পাই কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের ব্যবহারে। তাহাদের ভালবাসার স্বাস্থ্য কোনদিন নষ্ট হয় নাই—ভাগ্যও চিরপ্রসন্ন ছিল। সতুবাবু

১ বিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত 'বঙ্কিম প্রতিভা'য় প্রকাশিত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ—পৃঃ ৫৩-৫৪।

২ তবে 'দাসী'-বাদিনী সূর্য্যমুখী (গৃহত্যাগ করিয়া ও গৃহে ফিরিয়া) যদি বা 'প্রাচীন

ভাগ আদায় করিতে গিয়া তাহা বাড়াইয়াই তুলিয়াছিল। মহাকবি কালিদাসের বাণী—

'বিভক্তমপ্যেক স্থতেন তত্তয়োঃ
পরস্পরস্তোপরিপর্য্য চীয়ত।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিতে যে নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার লীলায়িত সৌন্দর্য্য অনতিক্রান্ত। স্বামিসুখে কমল পরিপূর্ণ সুখী, অতএব সে সুখে যাহারা বঞ্চিতা তাহাদের প্রতি কমলের সহানুভূতির অন্ত নাই। সূর্য্যমুখীর ব্যথায় তাহার কমলকর বুলাইতে যখন তখন সে ছুটিয়া আসিতেছে, এমন কি কুন্দের দুঃখেও তাহার সহানুভূতির অভাব নাই। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কমল ফুটাইবার বা কমলফোটা অব্যাহত রাখার জন্য বঙ্কিম যেন এই রমণীরত্নের আনন্দময় অনিন্দ্যচ্ছবিকে চিরন্তন সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তবু কমল

'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ'।[২]

বর্ণনার প্রতীক পর্য্যন্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কমল আপন সৌভাগ্যে সূর্য্যমুখীকে তাহার "আধখানা এখনও আমিতে

---

সাহিত্য ও সমাজ রীতির' অনুকরণ ব্যতীত আর কিছু না হয়, অভিমানিনী ভ্রমর দাসীত্ব ত্যাগ করিয়া আর বিধবা কুন্দ বিবাহ করিয়াও যে পৌরাণিক তটসীমা উত্তীর্ণ হইতে পারিল না ইহা বিস্ময়ের বিষয় বটে।

১ কালিদাস : 'রঘুবংশম' ৩।২৪।

২ কালিদাস : রঘুবংশম ৮।৬৭

ভরা” ইত্যাদি বলিয়া প্রেমপণ্ডিতা হিসাবে যত তিরস্কারই করুক, সূর্য্যমুখী যে কত অহঙ্কার ও আত্মাভিমান মুক্ত চরিত্র তাহা গৃহত্যাগের পূর্ব্বে কমলকে লিখিত পত্রে এবং ব্রহ্মচারীর সহিত কথোপকথনে সপ্রমাণ হয়। ফল( সূর্য্যমুখীতে বঙ্কিম যে কাব্যপ্রতিমা গঠন করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় নারীর বিচিত্র বৈশিষ্ট্য, তাহার একাধারে বহুভাবের সমষ্টিরূপ, দেখিতে পাই। সূর্য্যমুখীর গৌরব বর্ণনায় বিরহকাতর নগেন্দ্রের উক্তি[১] মহানাটকে রামের উক্তি আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতে পারে, কিন্তু এ-যুগে বঙ্কিমের পূর্ব্বে হিন্দুর গৃহলক্ষ্মীকে এমন বহু-ভাবের আধার করিয়া এবং সাময়িক পরাজয়ে চিরজয়ী করিয়া কেহ কাব্যরূপ দিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। অথচ ভারতীয় নারীর এই ভাবৈশ্বর্য্য হিন্দুর সুখদুঃখময় সংসারে নিত্য উপলব্ধির বস্তু। বহুযুগ প্রবাহিত সংস্কৃতিমূলে অধিকৃত এই নারীশক্তি[২] যেখানে বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে, সেখানে তাহার প্রভাব সাময়িক পরাভব মানিলেও পরিণামে যে বিজয় লাভ করে, আর যে প্রেম শুধু লীলায় অভিব্যক্ত নয়,

১ ৩৮ পরিচ্ছেদ।

২ "Let no one confuse this *shakti* with mere sweetness, for in this charm there is a combination of several qualities—patience, self-abnegation, sensitive intelligence, grace in thought, word and behaviour—the reticent expression of rhythmic life, the tenderness and terribleness of love; at its core, moreover, is that self-radiant spirit of delight which ever gives itself." ('The Indian Ideal of Marriage'—Rabindranath Tagore, in Keyserling's 'The Book of Marriage').

যাহার অন্তরে শ্রদ্ধা থাকে তাহা যে অবিনাশী, সূর্য্যমুখী-নগেন্দ্র সংবাদে বঙ্কিম তাহাই দেখাইয়াছেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহার বাণী বিষবৃক্ষে যে রূপাবলী পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাতে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সুফল ফলিবে। বিষবৃক্ষ যে একদিন 'বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল' ইহা বিষবৃক্ষ প্রথম প্রকাশের দিনের সাক্ষীরা[১] স্বীকার করেন। এখনও যদি নাড়া দেয় তবে জাতির অশুভ দিন আসন্ন বলিয়া শঙ্কিত হইবার অবকাশ থাকিবে না।

---

১ যথা রবীন্দ্রনাথ।

# যুগলাঙ্গুরীয়

# যুগলাঙ্গুরীয়

( ১৮৭৪ )

যুগলাঙ্গুরীয় কোন সময়ের রচনা? প্রথম বৎসরের বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ ও ছোট ইন্দিরা প্রকাশিত হইবার পরে দ্বিতীয় বৎসরের বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় অর্থাৎ ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে যুগলাঙ্গুরীয় প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রকাশের ক্রম কি রচনারও ক্রম বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য্য? বিষবৃক্ষ ও ছোট ইন্দিরার পরে বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হয় বলিয়া কি ইহা উল্লিখিত উপন্যাস দুইখানির পরবর্ত্তী রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে? এই ছোট গল্পটিতে যে সাধুভাষার বাহুল্য, যে 'সাগরী' ছন্দ সুস্পষ্ট, তাহা বিষবৃক্ষে বা ছোট ইন্দিরায় কোথায়? 'আলালের ঘরের দুলালে'র প্রতি বঙ্কিমের অনুকূল দৃষ্টি ত বিষবৃক্ষেই প্রতিফলিত। অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মতে বঙ্কিমচন্দ্র ত বিষবৃক্ষেই 'গোরু ঠেঙ্গইতে' আরম্ভ করিয়াছিলেন। গ্রন্থশেষে পুরন্দরকে দেখিয়া হিরণ্ময়ী 'জাগ্রৎ স্বপ্নের ভেদজ্ঞানশূন্যা হইলেন', কিন্তু মাথা ঘুরিয়া গেলেও সূর্য্যমুখীর পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না, মৃণালিনীর পক্ষেও হইত কি না সন্দেহ। অবশ্য মৃণালিনীর অনেক পরিবর্ত্তন পরিমার্জ্জনা, অনেক সংশোধন সংস্কার, বঙ্কিম করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু মৃণালিনীর ন্যায় যুগলাঙ্গুরীয় যে শ্রেষ্ঠিকন্যার প্রণয়-কাহিনী তাহাও কি বিস্মৃত

হইবার কথা? কাশীতে বিবাহ 'কেশবের কন্যা'রও হইয়াছিল এবং সেখানেও জ্যোতির্ব্বিদের গণনাই না হইয়াছিল মনোরমা ও পশুপতির মিলনের অন্তরায়? জীবনীলেখক বলেন 'তমলুকের দৃশ্য' বঙ্কিমের 'হৃদয়ে গভীর অঙ্কপাত করিয়াছিল।' তাই কি দীর্ঘ 'পনর বৎসর পরে তিনি তমলুকের এই চিত্র উঠাইয়া লইয়া যুগলাঙ্গুরীয়তে আঁকিয়াছিলেন'? একই সময়ে নেগুয়াঁতে কাপালিক দর্শনের ফল অনধিক পাঁচ বৎসরের মধ্যে কপালকুণ্ডলায় ফলিতে দেখিয়াছি। ১৮৬৯ সালে উত্তর-পশ্চিম ভ্রমণের ফলে প্রয়াগের চিত্রে মৃণালিনীর আরম্ভ এবং কাশীতে কেশবের কন্যার বিবাহ হইতে দেখা গেল। পরেই বিষবৃক্ষে সূর্য্যমুখী কাশীযাত্রা করিলেন, নগেন্দ্রও কাশী পর্য্যন্ত গেলেন। ১৮৮২ সালে জাজপুরের অভিজ্ঞতা তিন চারি বৎসরের মধ্যে শ্রীর পুরুষোত্তম যাত্রায় প্রতিফলিত হইতে দেখা যাইবে। কেবল এক্ষেত্রেই দর্শন ও চিত্রণের মধ্যে পনর বৎসরের ব্যবধান অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে?

নেগুয়াঁয় থাকাকালে সমুদ্রদর্শন করিবার যে সুযোগ বঙ্কিমের হইয়াছিল এবং তাহাতে তিনি যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিয়াছিলেন তাহা ত নবকুমারের মুখে 'জন্ম-জন্মান্তরে ভুলিব না' উক্তিতে জানাইয়া দিয়াছিলেন। শীঘ্র বা বিলম্বে সে দৃশ্য তাঁহার মনে পুনরাবর্ত্তিত হইয়া উঠিবার, নবরূপ পরিগ্রহ করিবার, কথা। কাজেই তাঁহার দিনের তমলুকের প্রান্ত বা উপকণ্ঠ হইতে সমুদ্রের 'চিত্র উঠাইয়া

লইয়া' যুগলাঙ্গুরীয়ে আঁকিবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও, তাঁহার কল্পনার প্রাচীন নগর 'তাম্রলিপ্তের চরণ ধৌত করিয়া অনন্ত নীল সমুদ্র মৃদু মৃদু নিনাদ' করিবার কোন বাধা ছিল না। তাই হিরণ্ময়ী—

'অনিমেষলোচনে সম্মুখবর্ত্তী সাগরতরঙ্গে সূর্য্যকিরণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে মৃদু পবন বহিতেছে—মৃদুপবনোত্থিত অতুঙ্গতরঙ্গে বালারুণরশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে—সাগরজলে তাহার অনন্ত উজ্জ্বল রেখা প্রসারিত হইয়াছে—শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষিকুল শ্বেতরেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে। হিরণ্ময়ী সব দেখিলেন—নীলজল দেখিলেন, তরঙ্গশিরে ফেনমালা দেখিলেন, সূর্য্যরশ্মির ক্রীড়া দেখিলেন—দূরবর্ত্তী অর্ণবপোত দেখিলেন, নীলাম্বরে কৃষ্ণবিন্দুবৎ একটি পক্ষী উড়িতেছে তাহাও দেখিলেন।'

অনন্ত সমুদ্রের উপকূলে নায়িকার পাদপীঠ রচনা করিয়া বঙ্কিম যে শুধু তাহাকে বিশিষ্ট গৌরব দান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নহে, সে যে দুস্তর সমস্যার সম্মুখীন তাহারও আভাস দিয়াছেন মনে হয়। হিরণ্ময়ী সবই দেখিল—দেখিল 'অনিমেষলোচনে' অথচ আন্‌মনে। যখন ভরা হৃদয় চোখ ছাপাইবার উপক্রম করে তখন অপলক দৃষ্টি কত না দূরের খবর লয়, পরে ক্লান্ত হইয়া যখন ফেরে তখন একেবারে পায়ের নখের প্রান্তে গিয়া নিবদ্ধ হয়। তাই দেখি হিরণ্ময়ী

"শেষে ভূতলশায়ী একটি কুসুমের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে কহিলেন 'তুমি কেন যাবে—অন্যান্য বার তোমার পিতা যাইয়া থাকেন'।

পুরন্দর বলিল, 'আমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন। আমার এখন অর্থোপার্জ্জনের সময় হইয়াছে। আমি পিতার অনুমতি পাইয়াছি'।

হিরণ্ময়ী লতামণ্ডপের কাষ্ঠে ললাট রক্ষা করিলেন। পুরন্দর দেখিলেন, তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইতেছে, অধর স্ফুরিত হইতেছে; নাসিকারন্ধ্র স্ফীত হইতেছে। দেখিলেন যে হিরণ্ময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পুরন্দর মুখ ফিরাইলেন। তিনিও একবার আকাশ, পৃথিবী, নগর, সমুদ্র সকল দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই রহিল না—চক্ষুর জল গণ্ড বহিয়া পড়িল। পুরন্দর চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, 'এই কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি। যে দিন তোমার পিতা বলিলেন, কিছুতেই আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন না, সেই দিন হইতেই আমি সিংহলে যাইবার কল্পনা স্থির করিয়াছিলাম।' "

উভয়ের বাল্যাবধি সখিত্ব থাকায়, 'উভয়ের পিতা পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন,' 'বিবাহের দিনস্থির পর্য্যন্ত হইয়াছিল, শেষে জ্যোতিষ গণনার ফলে হিরণ্ময়ীর পিতা কন্যার অনিষ্ট আশঙ্কায় 'বিবাহ দিবেন না' বলায় বিচ্ছেদের কারণ সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সমস্যাটি বাল্যপ্রণয়ের সমস্যা—যে 'বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে' জানাইয়া গ্রন্থকার পরবর্ত্তী উপন্যাস চন্দ্রশেখরের প্রবর্ত্তন করিবেন। অতএব বঙ্কিমের যে সকল গল্প বা উপন্যাস ঐ সমস্যা অবলম্বনে রচিত যুগলাঙ্গুরীয় সেই পর্য্যায়ের প্রথম কাহিনী বলিয়া তাঁহার রচনা-শ্রেণীতে যুগলাঙ্গুরীয়ের স্থান নির্দ্দেশ করাও যে না যাইতে পারে এমন নহে। কিন্তু আমাদের ধারণা

যুগলাঙ্গুরীয় মৃণালিনীর সমসাময়িক, বিষবৃক্ষের পূর্ব্বকালীন রচনা।

পূর্ব্বরাগের সমস্যার সূচনা, বর্ণনা ও সমাধান বঙ্কিম যে ভাবে এই ক্ষুদ্র কাহিনীতে করিয়াছেন তাহাতে তাহার ভারতীয় রূপ সুস্পষ্ট। সূচনায় দেখি হিরণ্ময়ী, পিতার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করা দূরের কথা, পিতার নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়া পুরন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। প্রকাশ করিতেছে বলিয়া যে অনিচ্ছুক তাহা বলা উদ্দেশ্য নহে, তবে হৃদয় তাহার যাহাই বলুক তাহার যুক্তি পিতার সিদ্ধান্তের অনুকূল[১]। পুরন্দরের শেষ কথা 'তুমি আমায় ভালবাস, তাহা জানি, কিন্তু যবে হউক অন্যের পত্নী হইবে। অতএব আর আমায় মনে রাখিও না। তোমার সঙ্গে যেন এজন্মে আমার আর সাক্ষাৎ না হয়'। চিত্তসংযম যে মানুষের ধর্ম্ম, হৃদয় যে অবস্থাবিশেষে শাসনযোগ্য, ভাবের ধারাকে নীতির দাবীতে যে বিপরীতমুখী করিতে হয়, ইহা ভারতের চিরকালীন সিদ্ধান্ত।

ভুলিবার পথও পুরন্দর হিরণ্ময়ীর পক্ষে সুগম করিয়া দিয়া গেল। যদিও বলিয়া গেল 'জগৎ তোমার তুল্য নহে', তবুও জানাইয়া গেল 'ইচ্ছা আছে যে, সিংহল হইতে ফিরিব না। যদি কখন তোমায় ভুলিতে পারি, তবেই ফিরিব' অর্থাৎ তাহাকে পাইবার আশাটুকুও মুছিয়া দিয়া গেল।

---

১ "এখন আর তোমার সঙ্গে এমত স্থানে একা সাক্ষাৎ করা ভাল দেখায় না। আর ডাকিলে আমি আসিব না" (১।১)।

কিন্তু হিরণ্ময়ীর চিন্তাধারা সাগরাভিমুখী একটানাই রহিয়া গেল।

উজান বহিবার উপলক্ষ যে না মিলিল তাহা নহে। পিতার আদেশে বিবাহের অনুষ্ঠান হইল, স্বামিলাভও হইল, কিন্তু আবৃত নয়নে মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় শুভদৃষ্টির সুযোগ মিলিল না। আনন্দস্বামীর আদেশে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মিলনও নিষিদ্ধ হইল কিন্তু দীর্ঘ-অবকাশেও মনের প্রবাহ ফিরিল না, পিতৃত্যক্ত বিত্ত ও আশ্রয় হারাইয়াও নহে, দারিদ্র্যের পীড়নেও নহে।

অথচ দীর্ঘ প্রবাসের পরে পুরন্দর যখন অতুল ধনরাশি লইয়া দেশে ফিরিল তখন সে সংবাদে 'হিরণ্ময়ীর ইন্দ্রিয়সকল অবশ হইলে'ও পুরন্দরের প্রেরিত রত্নহার হিরণ্ময়ী ফেরত দিয়া, 'দুরন্ত হৃদয়কে শাসিত করাই উচিত' স্থির করিল।

কিন্তু একদিন তাহার সংশয়ান্দোলিত হৃদয় লইয়া তাহাকে যে বিপুল প্রলোভনের সম্মুখীন হইয়া বিকল্প দূর করিতে হইবে তাহা সে ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। সেই অপ্রত্যাশিত অপরিমিত সুখৈশ্বর্য্যের প্রলোভন তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া রাজা মদনদেব অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগে তাঁহার পতিত্বের দাবী জানাইয়া হিরণ্ময়ীকে রাণীর আসনে আহ্বান করিলেন। একদিকে রাণীর সৌভাগ্য, অন্যদিকে 'অন্যানুরাগিণী' কুলটার কলঙ্ক। যাহা হোক 'হিরণ্ময়ী রাজমহিষী, ইহা শুনিয়া * * * কিছুমাত্র আহ্লাদিতা হইলেন না। বরং বিষণ্ণা হইলেন।'

পুরন্দরকে না পাওয়া অপেক্ষা 'পরপত্নীত্বের যন্ত্রণা' অধিকতর দুঃসহ মনে হইল[১]। তাই কুলটার মিথ্যা কলঙ্ক অঙ্গীকার করিয়াও হিরণ্ময়ী আসলে কলঙ্কিত হইতে চাহিল না। রাণীর সৌভাগ্য অপেক্ষা সে বিচ্ছেদের বেদনা বহন করিয়া যাইতেই প্রস্তুত হইল। কারণ তখনও সে জানে না রাজা, পুরন্দরের পক্ষে, তাহাকে পরীক্ষা করিতেছেন। জানিতে পারিলেও বুঝিত পুরন্দর-লাভ তখনও অনিশ্চিত। কত অনিশ্চিত তাহা স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে পুরন্দর ও রাজার মধ্যে যে কথা হইয়াছিল[২] তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়।

হিরণ্ময়ী যে শেষ পর্য্যন্ত পুরন্দরকে ভুলিল না বা ভুলিতে পারিল না, তাহার পূর্ব্বরাগকে যে চিরন্তন অনুরাগে পরিণত করিয়া তুলিল, ইহা কিন্তু হিরণ্ময়ীর চরিত্রের একটি দিক্, সে চিত্রের একটি বর্ণেরই বিকাশ মাত্র। এই বর্ণের প্রবলতা তাহার চরিত্রে একটা অপরূপ মাধুর্য্যময়ী দৃঢ়তা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যে সকল দেশে পূর্ব্বরাগের ক্ষেত্র ব্যাপক এবং চর্চ্চাবহুল সে সকল দেশের কথাসাহিত্যেও পূর্ব্বরাগের চিত্রে এমন রেখার দৃঢ়তা সাধারণতঃ ফুটিয়া উঠিতে দেখি না।

উদাহরণ স্বরূপে আমরা একখানি প্রখ্যাত উপন্যাস Balzac এর Eugénie Grandet এর উল্লেখ করিতে পারি। Eugénie অতিকৃপণ পাষাণ পিতার করুণার্দ্র কন্যা।

---

১ ৯ পঃ ১০ পৃ।    ২ ১০ পঃ ১৯ পৃ।

পিতার কঠোর ব্যবস্থায় তাহার প্রথম প্রণয়-পাত্রকে দু'দিনের বেশী কাছে রাখিতে পারিল না। পিতৃশোকার্ত্ত-প্রণয়ী সমস্তই তাহার পিতৃব্য অর্থাৎ Eugénieর পিতাকে লিখিয়া দিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য দূর প্রবাসে সাগরপারে চলিয়া গেল, Eugénie কে দিয়া গেল তাহার মাতার ব্যবহৃত ও মাতৃচিত্র-সমন্বিত প্রসাধন-পেটিকা, আর বলিয়া গেল ধনী হইয়া দেশে ফিরিয়া তাহাকে তাহার জীবন-সঙ্গিনী করিবে। বিদেশে গিয়া কিন্তু সে বেখবর হইয়া গেল, না লেখে চিঠি, না দেয় সংবাদ। এদিকে প্রাণ-পণে সুরক্ষিত পেটিকাটি দেখিয়া দেখিয়া Eugénie 'দীর্ঘ বরষ-মাস' কাটাইতে লাগিল। পিতার মৃত্যুর পরে সে প্রভূত সঞ্চিতধনের অধিকারিণী—তবু

> "She found no solace in her wealth * * * her love, her religion, her faith in the future made up all her life. Love was teaching her what eternity meant. Her own heart and the Gospel each spoke to her of a life to come, life was everlasting and love no less eternal. Night and day she dwelt with these two infinite thoughts, perhaps for her they were but one."[১]

সাত বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। শেষে ধনী Charles দেশে ফিরিয়া Eugénie কে পত্র লিখিয়া জানাইল সে এক অভিজাত বংশের মেয়েকে বিবাহ করিয়া তাহার ভাবিপুত্রের

১ Balzac: Eugénie Grandet (Every Man's Library Edition, pp. 207-208).

আভিজাত্য সংস্থাপন করিবে। Eugénieর সাত বৎসরের স্বপ্ন চূর্ণ হইয়া গেল। Eugénie বহু অর্থ দিয়া Charles এর পিতার দেউলিয়া অপবাদ দূর করিয়া দিয়া অপর এক ধনলোভী পাণিপ্রার্থীকে বিবাহ করিল। অবশ্য এই সর্ত্তে বিবাহ করিল যে তাহাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহার থাকিবে না।

Balzac এর মতে ইহা স্বর্গীয় প্রণয়ের[১] চিত্র হইতে পারে কিন্তু কোথায় গেল 'two infinite thoughts' যখন 'out of pique' M. de Bonfonsকে বিবাহ করিতে পারিল? আমাদের মনে হয় Eugénie চরিত্রের শেষ রক্ষা হয় নাই। Balzac এর বড় উপন্যাসের Eugénie যেখানে বিবাহের পাল্টা জবাব দিয়া অর্থাৎ Madame de Bonfons রূপে পাঠকের আশা ভঙ্গ করিয়া ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে বঙ্কিমের ক্ষুদ্র কাহিনীর হিরণ্ময়ী তাহার পূর্ব্বরাগের দৃঢ়তায় ভাস্বতী ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

হিরণ্ময়ী চরিত্রের অপর দিক্‌টিও আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে দিকে পরিস্ফুট তাহার পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষা[২] এবং সেই আকাঙ্ক্ষাজনিত অন্তর্দ্দৃষ্টি। ঠিক যে আকাঙ্ক্ষা আমরা অতঃপর শৈবলিনীতে দেখিতে পাইব না। প্রথমেই দেখিয়াছি পিতার নির্দ্দেশ অনুসারে সে তাঁহার অবাঞ্ছিত পাত্রের সহিত সাক্ষাৎ করা অসঙ্গত মনে করে। যখন পুরন্দরও বলিয়া

১ 'Love as the angels know'.

২ ৭ পঃ ১৩ পৃঃ।

গেল তাহার কথা হিরণ্ময়ীর বিস্মৃত হওয়াই উচিত তখন স্নেহের নির্দ্দেশ ও প্রীতির বিধান শুধু মিলিয়া গেল না, সে নিজেও বিবাহিত হইতে আপত্তি করিল না। বিবাহের পরেও দ্বিচারিণী না হইবার সত্য আগ্রহই তাহাতে দেখিতে পাই, কোন তৃপ্ত বা অতৃপ্ত কামনার প্রভাবে নহে। দীর্ঘ প্রবাসের পরে বিবাহিত পুরন্দর দেশে আসার সংবাদে হিরণ্ময়ী যে তাহার হৃদয়শোণিতের খরপ্রবাহ কতদূর দমন করিতে পারিয়াছিল পুরন্দরের প্রেরিত রত্নহার প্রত্যাখ্যানে তাহা সুস্পষ্ট। তাহার পিতৃভবনের মায়া অবশ্য সে কাটাইতে পারে নাই, সে বিষয়ে পুরন্দরের দান সে গ্রহণ না করিয়া পারিল না—ইহা তাহার চরিত্রে বাস্তবতা আনিয়া দিয়াছে—কিন্তু অমলার সর্ব্বদা পুরন্দরের বাটী যাওয়া সে নিষেধ করিয়া দিল। অমলার অর্থের প্রাচুর্য্যে তাহার 'নানা প্রকার' সন্দেহ হইতে লাগিল, কিন্তু একটা সন্দেহ কি ইহা নহে ঃ যে পুরন্দর তাহাকে ভুলিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছিল সে এখন দানের পর দানে কেন আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চায় যদি না আংটির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই থাকে ? রাজার কথায় মুহূর্ত্তের জন্য সে নিরুত্তর হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাই তাহার পবিত্র অন্তর তাহাকে প্রমাদশূন্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ভারত-ইতিহাসের অনেক স্তরই ছুঁইয়াছে, তন্মধ্যে এই নিটোল মুক্তার মত ছোট গল্পটির ঘটনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কালে বিন্যস্ত।

# চন্দ্রশেখর

# চন্দ্রশেখর

( ১৮৭৪* )

১৮৬৯ সালের নভেম্বর মাস হইতে ১৮৭৪ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী কার্য্যোপলক্ষে বহরমপুরে ছিলেন। বাঙ্গলার নবাবী আমলের শেষযুগের স্মৃতিবিজড়িত মুর্শীদাবাদের প্রতিবেশ-প্রভাবে মুকুলিত চন্দ্রশেখর ইংরাজী ১৮৭৩ সাল হইতে অর্থাৎ বাঙ্গলা ১২৮০ সালের শ্রাবণ মাস হইতে 'বঙ্গদর্শনে' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

যে বাল্যপ্রণয়ের সমস্যা লইয়া যুগলাঙ্গুরীয় রচিত, চন্দ্রশেখরও সেই সমস্যার বিপুলতর ও দুঃখাবহ (tragic) কাহিনী। কিন্তু যুগলাঙ্গুরীয়ের সহিত চন্দ্রশেখরের সম্পর্ক অতিনিকট বলিয়া যে পূর্ব্ববর্ত্তী বড় উপন্যাস বিষবৃক্ষের সহিত চন্দ্রশেখরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই তাহা নহে। তবে সমশ্রেণীর উদ্দেশ্য লইয়া যে শেষোক্ত গ্রন্থ দুইখানি রচিত হইয়াছিল বাহ্য দর্শনে তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর—প্রতিমা দুইখানির প্রকাশিত মূর্ত্তি, সাজপাট, চালচিত্র এত বিভিন্ন—অথচ কাঠামে তাহার নিগূঢ় পরিচয় রহিয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি বিষবৃক্ষ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল রূপলেখায় অসংযমের—যাহা তিনি বিষবৃক্ষের 'বীজ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহার—বিষময় ফল প্রদর্শন।

---

* ১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শনের' ভাদ্র সংখ্যায় চন্দ্রশেখর সমাপ্ত হয়।

চন্দ্রশেখরেও দেখি একদিকে উদ্দাম অসংযত মোহান্ধ কামনা কিরূপ প্রলয়-পথের পথিক হইতে পারে, কত দুর্দ্দশা ও চিত্তবিকারের পথে মানুষকে অগ্রসর করিয়া দেয়—পক্ষান্তরে চিত্তসংযমের ও অপরের জন্য আত্মত্যাগের বীর্য্য, আর ক্ষমা ও অহিংসার সৌন্দর্য্য, কত না বিপুল ও মহান্। ইতিহাসের বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চে যে পাত্রপাত্রীদের সন্নিবেশ করা হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য জাতীয় দুর্ভাগ্যের বৃহত্তর কাহিনীর অঙ্কগত করিয়া দেখাইবার জন্য।

পূর্ব্ব হইতেই বঙ্কিমের রস-রচনা দুই প্রকার পরিস্থিতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতেছিল—ঐতিহাসিক এবং পারিবারিক। বাঙ্গলার ইতিহাস এবং বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবন উভয়ই তাঁহার একান্ত দরদের ও আদরের বস্তু ছিল, উভয়ই তাঁহার কল্পনাকে উৎসারিত করিয়াছে এবং তাহার ফলে তাঁহার লেখনীমুখে যে যুগলধারা প্রবাহিত হইয়াছে বাঙ্গালীর তৃষিত চিত্তে তাহা সুধার তৃপ্তি আনিয়া দিয়াছে।

চন্দ্রশেখরে আমরা দেখিতে পাই ঐ যুগলধারার যুক্ত বেণী। একদিকে বাঙ্গলার শেষ নবাব মীরকাসেম রাজধর্ম্ম পালনে দৃঢ়তার জন্য ইংরেজের সহিত অসমশক্তি সংঘর্ষে বীরের মত পরাজয় বরণ করিতে যাইতেছেন, অন্যদিকে প্রতাপ মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্তরের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়া মৃত্যুপথের পথিক, এবং তাঁহাদের দুইজনকে অবলম্বন করিয়া আখ্যায়িকার বিমিশ্র-ধারা বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে বিয়োগান্ত অবসানের দিকে ছুটিতেছে।

অথচ গ্রন্থাভিহিত নায়ক হইতেছেন চন্দ্রশেখর। কোন্ গুণে দেখা যাক। গ্রন্থকার তাঁহার পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন; তিনি 'ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নহেন' অর্থাৎ ভিক্ষা বা দান গ্রহণ করেন না। জ্ঞানার্জ্জনে তাঁহার অশেষ আনন্দ, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাই তাঁহার ব্রত। 'তিনি গৃহস্থ অথচ সংসারী নহেন'। পাছে 'জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে' তাই বত্রিশ বৎসরের মধ্যে বিবাহের কল্পনা করেন নাই। আবার যেমন সংযমী তেমনই পরোপকারী। গ্রন্থারম্ভে সন্তরণশীল যুবক প্রতাপকে ডুবিতে দেখিয়া, তিনি যাত্রিনৌকা হইতে নদীতে ঝাপ দিয়া প্রতাপকে ধরিয়া নৌকায় তুলিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিলেন। পরে ত পরহিতব্রতের দীক্ষাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে দেবসেবার এবং গৃহধর্ম্মের বিশৃঙ্খলা হয় দেখিয়া তিনি বিবাহের সংকল্প করেন এবং সুন্দরী স্ত্রী গ্রহণ করিবেন না ইহাও স্থির করেন। কিন্তু জগতে কে অভ্রান্ত? সংসারে কে একদিনও মোহাবিষ্ট হয় না? অসংসারী পণ্ডিত শৈবলিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে বিবাহ করিলেন। গ্রন্থকারের কৈফিয়ৎ: রূপে কে না মুগ্ধ হয়? তবে কিছুদিনের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন অসঙ্গত এবং অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। আট বৎসর পরে একরাত্রে সুপ্তিমগ্ন জ্যোৎস্নাস্নাত শৈবলিনীর সুন্দর মুখমণ্ডল দেখিয়া অশ্রুময় চন্দ্রশেখর অনুতাপভরে বলিতেছেন—

"হায়, কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে

শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব, অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। * * * * * * আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্মই কি জীবনের সারভূত করিব? ছি ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধ শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?"[১]

চন্দ্রশেখরের এই অনুশোচনায় কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, চন্দ্রশেখর তাঁহার অতীত কার্য্যের জন্য অর্থাৎ শৈবলিনীকে বিবাহ করার ফলে শৈবলিনীর অতৃপ্তির জন্য আপনাকে যতই অপরাধী মনে করুন, তিনি আপনার দিক্ দিয়া বিবাহিত জীবনে অসুখী এমন কোন কথার উল্লেখ নাই; বরং অকপটে স্বীকার করিতেছেন 'আমি সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই'। কিছু পরেও আমরা দেখিতে পাইব রাজধানী হইতে সাময়িক প্রবাস অন্তে যখন বেদগ্রামে ফিরিতেছেন তখন দূর হইতে গৃহিণীযুক্ত স্বগৃহ দেখিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছেন। কাজেই চন্দ্রশেখর সন্ন্যাসী নহেন, তিনি সংযমী গৃহী। দ্বিতীয়তঃ, উল্লিখিত

১ ১।২।১৭ পৃঃ।

অনুশোচনা, শৈবলিনী যে বিবাহিত জীবনে অসুখী—চন্দ্রশেখরের বয়সে, সংযত জীবনচ্ছন্দে, শাস্ত্রবাসনায়, তাঁহার পক্ষে শৈবলিনীকে সুখী করা যে সম্ভব হয় নাই—এই চিন্তায় পরিপূর্ণ। তৃতীয়তঃ, শৈবলিনীর অতৃপ্তি তিনি অনুভব করিলেও সে জন্য শৈবলিনীকে কোনরূপ দোষী মনে করা বা তাহার প্রতি বিরক্ত হওয়া দূরের কথা এই অনুশোচনায় শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ উদার সহানুভূতির বাক্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে।

চন্দ্রশেখরের এই প্রগাঢ় অথচ অপ্রগল্‌ভ অনুরাগের আরও বেশী পরিচয় পরে প্রাপ্ত হই। আবার গৃহদর্শনের আনন্দের মধ্যে যতদূর প্রাপ্ত হই শৈবলিনীর অসুস্থতার বা অদর্শনের আকস্মিক আশঙ্কার মধ্যে ততোধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিপদের এই পূর্ব্বাভাস কেমন করিয়া যে চন্দ্রশেখরের মনে দেখা দিল তাহা বলা কঠিন। তবে ইহা বোধ হয় সেই 'সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ' বাক্যেরই দৃষ্টান্ত। উহা অপেক্ষা আরও মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত মিলিল যখন চন্দ্রশেখর বাটী আসিয়া শৈবলিনীর অপহরণের কথা সমস্ত শুনিলেন। তখন কি হইল?

"তখন চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহপ্রতিষ্ঠিত শালগ্রামশিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসীদিগের ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সায়াহ্নকাল পর্য্যন্ত এই সকল কার্য্য করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার অধীত অধ্যয়নীয়

শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি সকলে একে একে আনিয়া একত্রিত করিলেন। একে একে প্রাঙ্গণমধ্যে সাজাইলেন। সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোনখানি খুলিলেন—আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন—সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া, তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিলেন।

অগ্নি জ্বলিল * * * বহুযত্ন-সংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।"

অজ্ঞ, ভ্রান্ত শৈবলিনী এক দিন না বলিবে 'আমি তাঁহার কেহ নহি। পুঁথিই তাঁহার সব'? সে যাহা হোক—

"রাত্রি একপ্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন।"[১]

যাহার পক্ষে হয়ত জ্ঞানীর বৈরাগ্য-জনিত বিদ্বৎসন্ন্যাস কোন দিন সম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছিল সেই কি না করিল পত্নীবিরহিত গৃহত্যাগ—গ্রন্থরাজী ভস্মীভূত করিয়া—গৃহীর কর্ত্তব্য-বিমুখ জীবনের শাস্ত্রবাসনা ধিক্কৃত করিয়া! ফল, এখানে গ্রন্থকারের লিপিচাতুর্য্যে চন্দ্রশেখরের প্রচ্ছন্ন প্রেমের গভীরতা বুঝিতে কাহারও বাকি থাকে না।

কিন্তু এই প্রণয়ের পাত্রী কে? সুন্দরীর ঘরে ফিরিবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের প্রত্যুত্তরে যে শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের বজরায় বসিয়া বলিতেছে—

"দেখ, গৃহে থাকিতে মনে ভাবিতাম, যদি পিতৃমাতৃকুলে কোথাও

১ ১৷৫৷২৮ পৃঃ।

কাহারও অনুসন্ধান পাই, তবে তাহার গৃহে গিয়া থাকি। নচেৎ কাশী গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব—নচেৎ জলে ডুবিয়া মরিব। এখন মুঙ্গেরে যাইতেছি। যাই, দেখি মুঙ্গের কেমন। দেখি, রাজধানীতে ভিক্ষা মিলে কি না। মরিতে হয়, না হয় মরিব—মরণ ত হাতেই আছে। * * * কিন্তু মরি আর বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আর ঘরে ফিরিব না।"[১]

যে শৈবলিনী গৃহত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাহারই জন্য চন্দ্রশেখর "শোণিততুল্য" গ্রন্থরাশি পর্য্যন্ত অনলে আহুতি দিয়া গৃহত্যাগী হইতে যাইতেছেন। গল্পের tragedy প্রথম অঙ্কশেষেই এইভাবে ঘনাইয়া উঠিলে আমরা জ্ঞানপিপাসু চন্দ্রশেখরের স্থলে প্রেমবিহ্বল চন্দ্রশেখরের উদ্ভব দেখিতে পাই।

চন্দ্রশেখরের উদার প্রেমের আরও পরিচয় আমরা পাই শুধু গিরিপুলিনে প্রতাপ-বিযুক্ত শৈবলিনীর অনুসরণে নহে, পরন্তু যে শৈবলিনী গিরিকন্দরে তাঁহার নিকট স্বীকার করিল যে 'আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ফষ্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম,' তাহারই দুর্গতি ও উন্মাদ অবস্থা দেখিয়া চন্দ্রশেখরের আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ প্রতিক্রিয়ায়।

"চন্দ্রশেখর দেখিলেন যে, যে দেবীর প্রভাবে এই মনুষ্যদেহ সুন্দর, তিনি শৈবলিনীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—বিকট উন্মাদ আসিয়া তাঁহার সুবর্ণমন্দির অধিকার করিতেছে। চন্দ্রশেখর রোদন করিলেন। অতিমৃদুস্বরে, কত আদরে আবার ডাকিলেন 'শৈবলিনী'।

১ ১।৪।২৫ পৃঃ।

শৈবলিনী আবার হাসিল, বলিল, 'শৈবলিনী কে' ?...

চন্দ্রশেখর গদগদকণ্ঠে সকাতরে ডাকিলেন, 'গুরুদেব! একি করিলে? একি করিলে?'

শৈবলিনী গীত গাহিল * * * শেষে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি চন্দ্রশেখরকে চেন?'

চন্দ্রশেখর বলিলেন, 'আমিই চন্দ্রশেখর'।

শৈবলিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপ দিয়া চন্দ্রশেখরের কণ্ঠলগ্ন হইল—কোন কথা না বলিয়া, কাঁদিতে লাগিল—কত কাঁদিল—তাহার অশ্রুজলে চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠ, কণ্ঠ, বক্ষ, বস্ত্র, বাহু প্লাবিত হইল; চন্দ্রশেখরও কাঁদিলেন। শৈবলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাইব।'

চন্দ্রশেখর বলিলেন, 'চল'।"[১]

তখনও কিন্তু চন্দ্রশেখর জানেন না যে শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, বরং তাহার স্বৈরাচারের ফলে দেহেরও পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিবার কারণ ছিল, তবু সহানুভূতি-বিগলিত চন্দ্রশেখরের 'ক্ষমাসুন্দর চক্ষে' অশ্রু ঝরিল।

আবার, সে ক্ষমা কি শুধু পতিতা স্ত্রীর প্রতিই সীমাবদ্ধ? উদয়নালার সমরক্ষেত্রাভিমুখে অশ্বারূঢ় প্রতাপ যখন ধাবমান তখন—

"চন্দ্রশেখর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা যাও?'

---

১ ৪।৪।৯৩-৯৪ পৃঃ।

প্রতাপ বলিলেন, 'যুদ্ধে'।

চন্দ্রশেখর ব্যগ্রভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'যাইও না। যাইও না। ইংরাজের যুদ্ধে রক্ষা নাই।'

প্রতাপ বলিলেন, 'ফষ্টর এখনও জীবিত আছে, তাহার বধে চলিলাম।'

চন্দ্রশেখর দ্রুতবেগে আসিয়া প্রতাপের অশ্বের বল্‌গা ধরিলেন। বলিলেন, 'ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান্ তাহার দণ্ড বিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম, সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে; যে উত্তম সে শত্রুকে ক্ষমা করে।' প্রতাপ বিস্মিত, পুলকিত হইলেন। * * * অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া চন্দ্রশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, 'আপনি মনুষ্য-মধ্যে ধন্য। আমি ফষ্টরকে কিছু বলিব না।' "[১]

এই চিত্রের সম্মুখে কে না মাথা নত করিবে? চন্দ্রশেখর গ্রন্থের নায়ক অভিহিত হইবার যোগ্য কি না ইহার পরে সে সম্বন্ধে কেই বা প্রশ্ন করিবে? চন্দ্রশেখরের চরিত্র কিন্তু বঙ্কিম চিত্রিত করিয়াছিলেন এ যুগে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা-বাদ প্রচারিত হইবার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে। টল্‌ষ্টয়ের Confessions বা Anna Karenina তখনও প্রকাশিত হয় নাই।

জ্ঞানানুশীলন ও সংযমসাধনার ক্ষেত্রে প্রেমের ও ক্ষমার অভিব্যক্তি যেমন চন্দ্রশেখর চরিত্রের বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য, তেমনই

---

১ ৬।৮।১৩৬ পৃঃ।

পৌরুষ ও প্রেমের সমন্বয়ক্ষেত্রে যে চরিত্রের মানবোচিত সংযম এবং মহত্তর আত্মোৎসর্গ উপন্যাসখানির পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করে তাহা হইতেছে প্রতাপের চরিত্র। গ্রন্থের প্রারম্ভেই আমরা কিশোর প্রতাপের সাক্ষাৎ পাই। বলিষ্ঠ সাহসী বালক শুধু খেলার সঙ্গী শৈবলিনীর গাঁথামালা পরে না, গাছে উঠিয়া পাখীর ছানা পাড়িয়া দেয়—গঙ্গায় সাঁতার দেয় ও দিতে শেখায়। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্য-লীলার বর্ণনা-প্রসঙ্গে তাহাদের ভালবাসার অরুণোদয়ের পরিচয় দিয়া দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সূচনায় গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয়, না বল। ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা। বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না।"

তাহার পরে বলিতেছেন—

"শৈবলিনী বাড়িতে লাগিল—সৌন্দর্য্যের ষোলকলা পূরিতে লাগিল—কিন্তু বিবাহ হয় না। বিবাহের ব্যয় আছে'—( দরিদ্রের সন্তান )—'কে ব্যয় করে?" . . . .

"পরে শৈবলিনীর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। বুঝিল যে প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। বুঝিল" ( জ্ঞাতি-কন্যা বলিয়া ) "এ জন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।"

"দুই জনে পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেকদিন পরামর্শ করিল। গোপনে গোপনে পরামর্শ করে, কেহ জানিতে পারে না। পরামর্শ ঠিক হইল, দুইজনে গঙ্গাস্নানে গেল।"

উভয়ে একসঙ্গে ডুবিয়া মরিবার সঙ্কল্প স্থির করিয়া—

"সাঁতার দিতে দিতে অনেক দূর গেল। ** অনেক দূর গিয়া প্রতাপ বলিল; 'শৈবলিনি এই আমাদের বিয়ে'।"

প্রতাপ ডুবিল। শৈবলিনী যতই হোক বালিকা, ভয়ে ডুবিতে পারিল না*। সাঁতার দিয়া কূলে ফিরিল কিন্তু 'আর প্রতাপকে মুখ দেখাইল না'। ওদিকে চন্দ্রশেখর জলমগ্ন

---

* কাহিনীর পূর্ব্বস্বীকৃতি বা Postulate হিসাবে উল্লিখিতরূপ বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একালের পাঠক (? লেখক) দিগের প্রতিনিধি-স্বরূপে বঙ্কিমের প্রদত্ত তথাকথিত স্বল্পপরিচয়ের প্রতিবাদ করিয়া বলেন "এখনকার দিনের পাঠকেরা অত্যন্ত তার্কিক, তাহারা গ্রন্থকারের মুখের কথায় বিশ্বাস করিতে চাহে না, নিজে তাহারা বিচার করিয়া দেখিতে চায়, শৈবলিনী কিরূপ লোক ছিল, তাহার কতখানি প্রেম জন্মিয়াছিল, জন্মানো সম্ভবপর কি না, এবং এত বড় একটা অন্যায় করিবার পক্ষে সেই প্রেমের শক্তি যথেষ্ট কি না।" শৈবলিনী প্রতাপের সঙ্গে মরার সঙ্কল্প করিলেও ডুবে নাই বা মরে নাই। ভয়ে ডুবিতে না পারিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল। তবুও আজিকার পাঠক-সম্প্রদায়, যাঁহাদের এই প্রকারের অনেক 'বড় অন্যায় সঙ্কল্প' কাজে পরিণত করার খবর সংবাদপত্রে প্রায়ই পড়িতে হয়, শৈবলিনী না মরিলেও যে উল্লিখিতরূপ Coroner's inquest করিতে বসিবেন ইহা সম্ভবপর মনে হয় না। তবে আমাদের বাঙ্গলাদেশ ন্যায়শাস্ত্রের দেশ, এখানে তর্কপ্রবৃত্তি নিরোধ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু এই সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য মনে পড়ে "আজকালকার নভেলিষ্টরা কিছুই বাদ দিতে চান না। তাঁহাদের কাছে সকলই গুরুতর। এইজন্য উপন্যাসে সংসারের ওজন ভয়ঙ্কর বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরেজের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের মতো পাঠককে তাহাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট করে। এইজন্য আধুনিক উপন্যাস আরম্ভ করিতে ভয় হয়। মনে হয় কর্ম্মক্লান্ত মানবহৃদয়ের পক্ষে বাস্তব জগতের চিন্তাভার অনেক সময় যথেষ্টর অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে, আবার যদি সাহিত্যও নির্ম্মম হয় তবে আর পলায়নেব পথ থাকে না। সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই, কিন্তু জগতের ভার চাহি না।"

প্রতাপকে তুলিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিলেন, আর ঘটনাক্রমে হইলেন শৈবলিনীর বয়োবৃদ্ধ স্বামী। প্রতাপের আশৈশব ভালবাসার পাত্রী শৈবলিনী হইল অপ্রাপ্য শুধু নহে, ভারতীয় নীতি অনুসারে, কামনার অযোগ্য এবং উপন্যাসখানির মুখ্য চরিত্রগুলির অন্তরের সমস্যার এইভাবে অপ্রত্যাশিত সূত্রপাত হইল।

ভাবস্রোতকে বিপরীত দিকে প্রবাহিত করিবার একান্ত প্রয়োজনে প্রতাপ রূপসীকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু বেদগ্রামে যাতায়াতে যখন বুঝিলেন, যে শৈবলিনী অনূঢ়া অবস্থায় মরণ-ভয়ে ডুবিতে পারিল না সে বিবাহিত হইয়াও নৈতিক মৃত্যু বরণ করিতে এবং প্রতাপের চিত্তহরণ করিতে চায়, তখন হইতে কি করিলেন? প্রতাপ শৈবলিনীকে পরে বলিতেছেন—

"ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম"[১]

কিন্তু প্রতাপ বেদগ্রাম ত্যাগ করিলে কি হইবে?

"Apollo flies and Daphne holds the chase".[২]

কাজেই বেদগ্রাম এবং চন্দ্রশেখরের গৃহ শৈবলিনীর অসহ্য হইয়া উঠিল এবং সে লরেন্স ফষ্টরের বজরায়, প্রতাপের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় অকূলে যাত্রা করিল। সেই সংবাদ শ্যালিকা

---

১ ২।৬।৪৯ পৃঃ।

২ Shakespeare : 'A Mid Summer Night's Dream.' II, I, 231.

সুন্দরীর নিকট . শুনিবামাত্র 'প্রতাপ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন'।

"কিঞ্চিৎ পরে মাথা তুলিয়া, প্রতাপ কিছু রুক্ষভাবে সুন্দরীকে বলিলেন, 'এতদিনে আমাকে এ কথা বলিয়া পাঠাও নাই কেন '?

সু। কেন, তোমাকে বলিয়া কি হইবে?

প্র। কি হইবে? তুমি স্ত্রীলোক, তোমার কাছে বড়াই করিব না। আমাকে বলিয়া পাঠাইলে কিছু উপকার হইতে পারিত।

সু। তুমি উপকার করিবে কি না তা জানিব কি প্রকারে?

প্র। কেন তুমি কি জান না—আমার সর্ব্বস্ব চন্দ্রশেখর হইতে?

সু। জানি। কিন্তু শুনিয়াছি, লোকে বড় মানুষ হইলে পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া যায়।

প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া অধীর এবং বাক্যশূন্য হইয়া উঠিয়া গেলেন।[১]

বুঝিলাম প্রতাপ পবিত্রতা ও কৃতজ্ঞতা উভয়েরই মূল্য বুঝেন এবং যেমন পাপের আকর্ষণ এড়াইতে তেমনই উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে উৎসুক। শৈবলিনীকে উদ্ধার করিবার এবং চন্দ্রশেখরের প্রতি কৃতজ্ঞতার কর্ত্তব্য পালনের আগ্রহে প্রতাপ তাঁহার ভৃত্য রামচরণকে লইয়া ফষ্টরের বজরা আক্রমণ করিয়া শৈবলিনীর উদ্ধার করিলেন। প্রতাপ সাহসী ও সাহসিকতার কর্ম্মদক্ষ।

ভৃত্য রামচরণের প্রতি প্রতাপের আদেশ ছিল শৈবলিনীকে নৌকা হইতে জগৎশেঠের পুরীতে লইয়া যাইবে।

---

১ ২।৪।৪০ পৃঃ। কোন সমালোচক প্রতাপকে "ধীরস্থির" বলিয়াছেন।

রামচরণ কিন্তু আপন বিবেচনামত তাহাকে প্রতাপের বাসায় লইয়া গেল। ফলে বহুদিন পরে শৈবলিনীর সহিত অনভিপ্রেত সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। শৈবলিনী প্রথম প্রতাপকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইল। পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞান মতে stimulation—inhibition—hysteria। শৈবলিনীর কাব্যজীবনের পরবর্ত্তী ঘটনা বুঝিবার পক্ষে এই ভাবগ্রস্ত মূর্চ্ছা (hysteric fit) মনে রাখা দরকার।

জলসেচনে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া শৈবলিনী শুধাইল ঃ—

"কে তুমি? প্রতাপ? না কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছ'?

প্রতাপ বলিলেন, 'আমি প্রতাপ'।

* * * * *

শৈবলিনী সম্পূর্ণরূপে সুস্থির হইয়াছেন দেখিয়া প্রতাপ বিনা বাক্যব্যয়ে গমনোদ্যত হইলেন। শৈবলিনী বলিলেন, 'যাইও না'। প্রতাপ অনিচ্ছাপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন। শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?'

প্রতাপ বলিলেন, 'আমার এই বাসা'।

শৈবলিনী * * * ধৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া পুনরপি বলিলেন, 'আমাকে এখানে কে আনিল?'

প্র। আমরাই আনিয়াছি।

* * * * *

শৈ। কেন তোমরা এখানে আনিলে? তোমাদের কি প্রয়োজন?

প্রতাপ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, বলিলেন, 'তোমার মত পাপিষ্ঠার

মুখদর্শন করিতে নাই। তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম—আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর, এখানে কেন আনিলে ?'

শৈবলিনী ক্রোধ দেখিয়া ক্রোধ করিলেন না—বিনীতভাবে, প্রায় বাষ্পগদগদ হইয়া বলিলেন, 'যদি ম্লেচ্ছের ঘরে থাকা আমার এত দুর্ভাগ্য মনে করিয়াছিলে—তবে আমাকে সেইখানে মারিয়া ফেলিলে না কেন ? তোমাদের হাতে ত বন্দুক ছিল।'

প্রতাপ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তাও করিতাম—কেবল স্ত্রী-হত্যার ভয়ে করি নাই ; কিন্তু তোমার মরণই ভাল।'

শৈবলিনী কাঁদিল। পরে রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল—'আমার মরাই ভাল—কিন্তু অন্যে যাহা বলে বলুক তুমি এ কথা বলিও না। আমার এ দুর্দ্দশা কাহা হ'তে ? তোমা হ'তে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে ? তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছি ? তোমার জন্য। কাহার জন্য দুঃখিনী হইয়াছি ? তোমার জন্য। কাহার জন্য আমি গৃহধর্ম্মে মন রাখিতে পারিলাম না ? তোমার জন্য। তুমি আমায় গালি দিও না॥'

প্রতাপ বলিলেন, 'তুমি পাপিষ্ঠা তাই তোমায় গালি দিই। * * * তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমায় দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি ?'

শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—বলিল, তুমি কি করিয়াছ ? কেন তুমি তোমার ঐ অতুল দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে ? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে ও রূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে ? * * * তুমি কি জান না তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল ? তুমি কি জান না যে,

তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?'

শুনিয়া প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল"—[১]

কিন্তু প্রতাপ এই উষ্ণ প্রস্রবণের তপ্ত ধারায় অভিভূত না হইয়া—'বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া সেস্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন'। সেকালের প্রতাপ ধর্ম্ম ও সমাজ, পবিত্রতা ও কৃতজ্ঞতা ভাসাইয়া দিতে না পারিয়া, বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াও যে চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর অনিষ্টের কারণ হইয়াছেন তাহা ভাবিয়া, বজ্রাঘাত ও বৃশ্চিকদংশনজ্বালা অনুভব না করিয়া করেন কি? বঙ্কিম যে তাঁহাকে পাশ্চাত্ত্যধারণা-বিরহিত, প্রাচ্যসংস্কারপুষ্ট, অষ্টাদশ শতাব্দীর হিন্দুসমাজের বলিষ্ঠ সন্তান হিসাবে অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন।

সে যাহা হোক, কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রতাপের বিমল দীপ্তি আমরা ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম। দেখিলাম প্রতাপ শৈবলিনীকে উদ্ধার করিয়া আপনাকে হারাইল না।[২]

---

১ ২।৬।৪৮-৪৯ পৃঃ।

২ আধুনিক সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে প্রতাপের চরিত্রে প্রশংসার বড় কিছু নাই এবং নিন্দার অনেক কিছু আছে—ইহা বুঝাইবার জন্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, ("বঙ্গবাণী" ১৩৩০, শ্রাবণ, ৬৮৪ পৃঃ) "শৈবলিনী পরস্ত্রী, গুরুপত্নী (?), নিজের ঘরে পাইয়া অত্যাচার করে নাই, এমন অনেকেই করে না এবং করিলে গভীর অন্যায় করা হয়।" শরৎচন্দ্র প্রতাপের "অত্যাচারের" কল্পনা কেমন করিয়া করিলেন বুঝা যায় না। যাহারা প্রতাপের প্রশংসা করে "ঘরে পাইয়া অত্যাচার" না করার জন্যই তাহারা যে প্রতাপের প্রশংসা করে তাহা নহে। অতটা হীনতা তাহারা কোন

কিন্তু তিরস্কারে যাহা হইল না পুরস্কারে বা প্রত্যুপকারে তাহা হইবার বাধা কি ? প্রতাপ হইল ফষ্টরের স্বজাতিদিগের হস্তে বন্দী এবং তাহারা তাহাকে নদীপথে কলিকাতায় লইয়া চলিল। শৈবলিনী প্রতাপের স্ত্রী পরিচয় দিয়া নবাবের সাহায্যে লোক-নৌকা লইয়া তাহার অনুসরণ করিল এবং উন্মাদিনী সাজিয়া প্রতাপের পলায়নের ও মুক্তির সহায়তা করিল। উভয়ে নৌকা হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া দ্রুতসন্তরণে রক্ষিগণের দৃষ্টি এড়াইয়া গেল। জ্যোৎস্নালোকে গঙ্গাবক্ষে অগাধ জলে সাঁতার দিতে দিতে উভয়ের মধ্যে অভাবনীয় কথালাপ হইল। শৈবলিনী যখন ভাবিতেছিল এতদিনের এত দুশ্চেষ্টার ফলে সে বুঝি কূল পাইল, তখন প্রতাপই কি না তাহাকে ভাসাইয়া দিল অকূলে! অতীতের স্মৃতি জাগাইবার জন্য—

"প্রতাপ ডাকিল, শৈবলিনী—শৈ'।

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইল। * * * শৈবলিনী যত বৎসর সই শব্দ শুনে নাই শৈবলিনীর সে এক মন্বন্তর।

---

সাধারণ ভদ্রব্যক্তির চিত্তেও প্রত্যাশা করে না। তাহারা প্রশংসা করে প্রতাপের ভাবস্রোত উজানে বহাইবার চেষ্টার ; প্রশংসা করে, শৈবলিনীর তীব্র কামনার স্রোতোমুখে প্রতাপের অনভিভূত, অনমিত চিত্তের—যে চিত্ত শৈবলিনী পরস্ত্রী হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শৈবলিনীতে সংস্থাপিত ছিল ; প্রশংসা করে ব্যভিচারের সহিত তাহার আপোষ না করিবার প্রবৃত্তির ; আর, এ পর্য্যন্ত তাহার "মিথ্যাচারী" না হইবার আন্তরিক আগ্রহের। ইহার পরে প্রশংসা করিবার আরও অনেক কিছু হয়ত দেখা যাইবে।

এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশিমধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্রতারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, 'প্রতাপ! আজিও এই মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?'

প্রতাপ বলিল, 'চাঁদের? না। সূর্য্য উঠিয়াছে'।"

শৈবলিনীর ধারণা—'শীতল বলিয়া ওচাঁদ সেবিনু'। প্রতাপ যে 'ভানুর কিরণের' সংবাদ বা পরিচয় দিবেন তাহা অভাগিনী তখনও বুঝে নাই। প্রতাপ মনে করাইয়া দিলেন—

"মনে আছে যে আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি।"

"শৈবলিনী শঙ্কিতা হইয়া বলিল, 'কেন প্রতাপ? চল তীরে উঠি' "।

প্র। "আমি উঠিব না। আজ মরিব।"

* * * * *

"আমার শপথ কর, নহিলে ডুবিব। কিসের জন্য প্রাণ? কে সাধ করিয়া পাপ-জীবনের ভার সহিতে চায়? চাঁদের আলোয় এই স্থির গঙ্গার মাঝে যদি এ বোঝা নামাইতে পারি, তবে তার চেয়ে সুখ কি?

উপরে চন্দ্র হাসিতেছিল।

শৈবলিনী বলিল, "তোমার শপথ কি বলিব?"

"প্রতাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিল। সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে অতিশয় কঠিন, অতিশয় রুক্ষ, তাহার পালন অসাধ্য, প্রাণান্তকর; শৈবলিনী শপথ করিতে পারিল না। বলিল, 'এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ?'

প্র। আমি।

শৈ। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে,—বল আছে—কীর্ত্তি আছে—বন্ধু আছে—রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রতাপ?

প্র। কিছু না—আইস তবে দুইজনে ডুবি।”

শৈবলিনীর যখন ধারণা প্রতাপই তাহার সকল দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ, পক্ষান্তরে প্রতাপ নিজে অনেক সুখে সুখী, তখন প্রতাপই প্রস্তাব করিল কিনা ‘আইস তবে দুই জনেই ডুবি’!

“শৈবলিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। চিন্তার ফলে তাহার জীবন-নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। ‘আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন’? প্রকাশ্যে বলিল, ‘তীরে চল’।

প্রতাপ হাত ছাড়িল। শৈবলিনী আবার ধরিল···বলিল ‘প্রতাপ, হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ, শুন, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ-বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি। আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল’।”[১]

উপরে চন্দ্র নীচে গঙ্গা। উভয়ে গিয়া তীরে উঠিল। প্রতাপ মৃত্যুপণে এবারে শৈবলিনীর নৈতিক মৃত্যু নিবারণ করিল, শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রতাপের জীবন রক্ষা করিল, এবং উভয়েরই কল্যাণবুদ্ধি জয়ী হইল। এই পরিচ্ছেদটি পড়িবার সময় দার্শনিক Kantএর এমনই একটি উক্তি আমাদের বার বার মনে পড়ে—

“Two things fill the mind with admiration and

১ ৩।৬।৭২-৭৩ পৃঃ।

awe, the grandeur of the starry heavens above and the grandeur of the moral law within".

বাস্তবিক—'অগাধ জলে সাঁতার' অধ্যায় লিখিয়া বঙ্কিম নৈশ প্রকৃতির অন্তহীন সৌন্দর্য্যের আবেষ্টনে নৈতিক মানুষের অপরিমেয় বীর্য্য ও মহত্ত্ব যে ভাবে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কাব্যকলা এখানে চরমোৎকর্ষে পৌঁছিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। শৈবলিনী যখন প্রতাপের সান্নিধ্যসুখে শুধু জ্যোৎস্নাপ্লুত জলহিল্লোল অনুভব করিতে আত্মহারা, প্রতাপ তখন ছার পার্থিব নদীতে দুর্ব্বহ দেহভার বহনকরা অপেক্ষা 'কি পুণ্য করিলে মানুষ আকাশের অনন্ত নীলসাগরে সাঁতার দিতে পারে' তাহাই ভাবিতেছিলেন। চিন্তার এই বিভিন্নতা যখন বাক্যেও ফুটিয়া উঠিল তখন একদিকে দেখি শৈবলিনীর ভাবজীবনের অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতার অনুভূতি তাহার বাষ্পাকুল কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিয়া উঠিতেছে, অন্যদিকে প্রতাপ তাঁহার দায়িত্ব অঙ্গীকার করিয়া সহমৃত্যুর প্রস্তাব শুধু করিতেছেন না পরন্তু দেহগত মনের বিদ্রোহকে সম্পূর্ণ দমিত করিবার ঐকান্তিক আগ্রহে শৈবলিনীর আবেদনে অবিচল থাকিয়া আপনার মৃত্যুপণেও আন্তরিকতা সপ্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। শৈবলিনী যে অকূলে ভাসিতেছিল সে ইহা যত না বুঝুক প্রতাপ ততোধিক বুঝিতেছিলেন এবং কোন্ স্রোত অবলম্বনে শৈবলিনী যে তীরে উঠিতে পারিবে সে

---

* 'Critique of Practical Reason'.

সম্বন্ধেও তিনি নিঃসংশয়। অতএব শৈবলিনীর কল্যাণকামনায় এত কোমলতার মধ্যেও প্রতাপ আজ একান্তই কঠোর। মাধুর্য্য ও শক্তির সমাহারে প্রতাপের চরিত্রের প্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য্য এখানে প্রকৃতই বর্ণনাতীত।

তবু প্রশ্নের অবকাশ থাকিয়া গেল। শৈবলিনীকে প্রতাপের চিন্তা পর্য্যন্ত ছাড়িতে হইবে এত বড় দাবী করিবার কি অধিকার প্রতাপের আছে? প্রতাপ নিজেই কি শৈবলিনীর চিন্তা দূরের কথা, শৈবলিনীর প্রতি প্রীতিমুক্ত?

বঙ্কিম এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন প্রতাপের জীবনের পরবর্ত্তী কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া।

শৈবলিনী প্রতাপের নৌকা হইতে নিভৃতে উঠিয়া নৈশ অন্ধকারে মিলাইয়া যাওয়ার পরে প্রতাপ যখন অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে পাইলেন না, তখন স্থির করিলেন যে শৈবলিনী ডুবিয়া মরিয়াছে। একদিন তিনি শৈবলিনীর মরাই ভাল বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শৈবলিনীর মৃত্যু হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিবার পরে তিনি নবাবের পক্ষ সমর্থন করিয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন স্থির করিলেন, কেন না তাঁহার মতে ফষ্টর না হইলে শৈবলিনী মরিত না, কাজেই ফষ্টরের জাতিকে তিনি ক্ষমা করিতে অপ্রস্তুত। প্রতাপের প্রীতি ও বিদ্বেষ এমনই তীব্র। পরে যখন শুনিলেন বিকৃত-মস্তিষ্ক শৈবলিনীকে লইয়া চন্দ্রশেখর গৃহে ফিরিয়াছেন তিনি অবিলম্বে তাঁহাদের দেখিতে গেলেন। রমানন্দস্বামীর যৌগিক

(psychiatric) চিকিৎসায় শৈবলিনী প্রকৃতিস্থ হইলে নবাবের আহ্বানে তাঁহারা সকলে নবাবশিবিরে উপস্থিত হইলেন। উদয়নালার রণক্ষেত্রে যুদ্ধও ঘনাইয়া উঠিল। পূর্ব্বসঙ্কল্প অনুসারে প্রতাপ যুদ্ধে যাইতেছিলেন এমন সময়ে নবাবশিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত শৈবলিনী তাঁহাকে নেপথ্যে ডাকিয়া বলিল 'স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও না'[১]। প্রতাপ অশ্বে কষাঘাত করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করিতে। মুমূর্ষু প্রতাপকে রমানন্দস্বামী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন কেন নিষেধ সত্ত্বেও এই দুর্জ্জয় সংগ্রামে তিনি প্রাণ দিলেন তখন প্রতাপের শেষ উত্তর হইল :—

"আমি বুঝিলাম আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই ;" "কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি···শিরে শিরে, শোণিতে, শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে··· এ জন্মে এই অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া, এ দেহত্যাগ করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে—কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে ? আমার মৃত্যু ভিন্ন উপায় নাই। এইজন্য মরিলাম।··· আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী ? যদি দোষ হইয়া থাকে, এ প্রায়শ্চিত্তে কি তাহার মোচন হইবে না ?"

"রমানন্দস্বামী বলিলেন, তাহা জানি না, মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ, শাস্ত্র এখানে মূক···তবে ইহাই বলিতে পারি, ইন্দ্রিয়-জয়ে

১ ৬খ।৮ পঃ

যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।"[১]

প্রতাপের চরিত্র আলোচনা করিয়া সাধারণ পাঠকও রমানন্দস্বামীর প্রশস্তির প্রতিধ্বনি করিবে, কিন্তু গীতার বাণী—

'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি'

যে পাঠক স্মরণ করিবে সে ইহা মানিবে না যে ভারতের শাস্ত্র এখানে মুক। ভারতের শাস্ত্র ও সংস্কৃতি এ বিষয়ে বাঙ্ময় বলিয়াই প্রতাপের স্রষ্টা তাহাকে রসরূপ দিয়া ধন্য হইতে পারিয়াছেন।

তবু আশঙ্কা হয় ধর্ম্মধ্বজিগণ হয়ত প্রতাপের স্বীকারোক্তি, 'আমার মন কলুষিত হইয়াছে', উল্লেখ করিয়া একদিকে বলিবেনঃ কোথায় তবে প্রতাপের মহত্ত্ব? আর অন্যদিকে ধর্ম্মবিদ্বেষিগণ হয়ত বলিবেন প্রতাপের পাপানুভূতি ও রমানন্দস্বামীর পুণ্যস্তুতিতে art এর প্রাণান্ত ঘটিয়াছে।

একপক্ষের উত্তরঃ মহৎ প্রচেষ্টার গৌরব কোন ব্যর্থতাই কাড়িয়া লইতে পারে না। এখানে Eucken এর একটি সুন্দর মন্তব্য স্মরণীয়—

"It is one of the tragedies of the life that a man's soul is filled with longing for something better, yet is

১ ৬।৮।১৩৯ পৃঃ।

held captive by circumstance and is finally driven back to that from which he would fain escape. And yet it is the struggle which gives to life its vitality and greatness".১

ইহা শুধু দার্শনিকের কথা নহে কবির কথাও বটে—

"What I aspired to be
And was not, comforts me".২

অপর পক্ষের উত্তর : প্রতাপের পাপানুভূতি, রমানন্দস্বামীর পুণ্যস্তুতি, না হয় অতীত যুগের কুসংস্কার, 'ইন্দ্রিয়জয়' 'চিত্ত-সংযম' না হয় সেকালের hagiology সাব্যস্ত হোক, কৃতজ্ঞতা যেহেতু অতীতকে স্মরণ করে অতএব না হয় প্রগতির পরিপন্থী ধর্ম্মই গণ্য হোক, কিন্তু চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য প্রতাপের আত্মবিসর্জ্জনের মধ্যেই বা মনুষ্যত্ব ও মাধুর্য্যের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যাইবে না কেন ? আর 'অগাধ জলে সাঁতারে'র প্রসঙ্গে শৈবলিনীর কাছে যে প্রতিশ্রুতি প্রতাপ চাহিয়াছিল তাহা যে একপক্ষের মাত্র পালনীয় মনে করিয়া চাহে নাই এবং তাহা প্রতিপালনে আপনার ত্রুটিও যে সে ক্ষমার যোগ্য মনে করিল না ইহার গৌরব কি তাহার প্রাপ্য নহে ?৩

---

১ Eucken : Present-Day Ethics.

২ Robert Browning,

৩ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন ('বঙ্গবাণী' ১৩৩০ শ্রাবণ, ৬৮৪ পৃঃ) "যুদ্ধের অজুহাতে আত্মহত্যা ? তাহাতে পৌরুষ থাকিতে পারে, কিন্তু কাজ ভাল নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে একটি কথা অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন : তাঁহার গ্রন্থে পুরুষচরিত্র অপেক্ষা নারীচরিত্রই অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাস সম্বন্ধে এ কথা অল্পাধিক প্রযোজ্য হইলেও চন্দ্রশেখর উপন্যাস সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের ন্যায় দুইটি সুমহৎ নায়ক-চরিত্র তাঁহার আর কোন উপন্যাসে নাই। দুর্গেশনন্দিনীও সে হিসাবে চন্দ্রশেখরের সমকক্ষ নহে। Shakespeare এর নাটকাবলীর নায়কচরিত্র সম্বন্ধে Ruskin এর যে অভিযোগ* সেরূপ কোন সাধারণ অভিযোগ বঙ্কিম

---

সংসারের উপরে, নিজের স্ত্রীর উপরে, এই যে একটা অবিচার করা হইয়াছে, আমরা তাহা পছন্দ করি না।" আত্মহত্যা কাজ যে ভাল নয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ; কিন্তু এ ভাল-মন্দর বিচার তাহা হইলে কি Penal Code অনুসারে করা হইল না ? Penal Code দূরের কথা, "নীতিব চোখ রাঙানিতে" উপন্যাসের চরিত্র মরিতে পারে না, সে "উপন্যাসের আইনেই মরিতে পারে", শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গান্তরে এইরূপ বলিয়াছেন দেখিতে পাই। "উপন্যাসের আইনে" আত্মহত্যা যদি সকল ক্ষেত্রেই হেয় হয় তাহা হইলে এমন মহাকবি বা শ্রেষ্ঠতম পর্য্যায়ের ঔপন্যাসিক অনেক আছেন যাঁহারা সাহিত্যের আইনে অত্যন্ত অপরাধী বলিতে হইবে। শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরেব সুখের বা মঙ্গলের জন্য প্রতাপের আত্মোৎসর্গ "উপন্যাসের আইনে" যদি গর্হিত হয় তাহা হইলে উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে Dicknes এর "A Tale of Two Cities" গ্রন্থের Sydney Carton এর চরিত্রও নিন্দনীয়। অথচ এযাবৎ কোন পাঠক বা সমালোচক তাহা বলিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। আর 'স্ত্রীর উপরে অবিচারের কথা যাহা বলা হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে শৈবলিনীকে কামনা করিয়া রূপসীর সহিত সহবাস করিতে থাকিলে স্ত্রীর বা নিজের প্রতি নিশ্চয়ই সুবিচার করা হইত না।

* "Shakespeare has no heroes; he has only heroine. There is not one entirely heroic figure in all his plays, except

চন্দ্রের উপন্যাসের নায়কদিগের সম্বন্ধে আনা সম্ভব না হইলেও বঙ্কিমের নায়িকা-চরিত্রগুলির তুলনায় নায়ক-চরিত্রাবলীর তুর্ব্বলতা চন্দ্রশেখর বিশেষভাবে পূরণ করিয়াছে। বিষয়বস্তু হিসাবে চন্দ্রশেখরের সহিত তুলনীয় অপরাপর উপন্যাসে নায়ক-প্রতিনায়ক উভয়কেই এমন সদ্‌গুণের আধার করিয়া চিত্রিত করা সম্ভব হয় নাই। Anna Kareninaর Vronsky এমন কি 'ঘরে বাইরে'র 'সন্দীপের' সহিত প্রতাপের নাম যুগপৎ উচ্চারণ করিতে কাহার প্রবৃত্তি হইবে? এখানেও বঙ্কিমের সৃষ্টিকৌশল অনুধাবনযোগ্য।

কিন্তু চন্দ্রশেখরের নায়ক-উপনায়ক যত সবল সুন্দর চরিত্র হোক না কেন চন্দ্রশেখরেয় উপজীব্য হইতেছে তাহার নায়িকার জীবনকাহিনী। তাহার বাল্যের নিরপরাধ ভালবাসা, কৈশোরের মোহ ও নৈরাশ্য, তাহার যৌবনের অতৃপ্তি ও তৃষ্ণা, তাহার পাপ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত, মোহনাশ ও স্মৃতিলাভ—এক কথায় তাহার অশান্ত জীবনান্তে শান্ত জন্মান্তর। কাজেই বালিকা শৈবলিনীর রচিত মালা বাঞ্ছিত কণ্ঠে গিয়া উঠিবে অথবা ফুল-ঝরা ছিন্নসূত্র অবস্থায় ধূলায় লুটাইবে, সে শুধু নৌকা গণনায় ভুল করিবে, না তীরের সম্বন্ধেও ভ্রান্ত ধারণায় অকূলে ভাসিবে, তাহার প্রথম ভালবাসা প্রতিষিদ্ধ কামনার

---

the slight sketch of Henry the Fifth exaggerated for the purpose of the stage; and the still higher Valentine in the Two Gentlemen of Verona. In his laboured and perfect plays you have no hero." Ruskin: 'Sesame and Lilies' pp. 50-51 (Everyman's Library Ed.).

পঙ্কিলজলে মৃত্যু খুঁজিবে, না তাহার অবাঞ্ছিত বিবাহই আশীর্ব্বাদের শান্তিধারা বহন করিয়া আনিবে?—উপক্রমের এই সকল প্রশ্নের উত্তরই সারা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

অতএব শৈবলিনী হইতেছে গ্রন্থের নায়িকা এবং গ্রন্থখানি প্রধানতঃ তাহারই কল্পিত জীবনকাহিনী। তাহার জীবনের প্রধানস্রোত যখন প্রতাপের কূল দিয়া বহিয়াছে তখন প্রতাপ আমাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর দিক্‌চক্রবালের ক্ষীণরেখা। আর, যখন চন্দ্রশেখরের কূলে সে স্রোত প্রবাহিত তখন চন্দ্রশেখরকে আমরা ভালভাবে দেখিতে ও জানিতে পারি, প্রতাপ তখন সুদূরে ছায়ালীন। আরও, যখন যে কূলের সন্নিধানে তাহার বাসনার দুর্ব্বার গতি উচ্ছ্বসিত বেদনার কাতরধ্বনি তুলিয়াছে—সেখানে ভাঙনের দুঃখ-দুর্দ্দশা সত্ত্বেও উপকূলের অপ্রত্যাশিত সমৃদ্ধির পরিচয়ও ফুটিয়াছে। তাহার বাল্যপ্রণয়ে জাগিয়াছে প্রতাপের প্রথম অনুরাগ, তাহার কৈশোরের নৈরাশ্যে তরুণ প্রতাপের মৃত্যুপণ, তাহার বিবাহিত জীবনের অতৃপ্তিতে জ্ঞানপিপাসু চন্দ্রশেখরের বেদনাময় সহানুভূতি, তাহার গৃহত্যাগে চন্দ্রশেখরের প্রেমসন্ন্যাস, তাহার উদ্ধারে প্রতাপের বীর্য্য, তাহার সান্নিধ্যে প্রতাপের শুভ্র-জ্যোতি, তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতিতে চন্দ্রশেখরের ক্ষমা, তাহার দুর্ব্বলতার নিবেদনে প্রতাপের আত্মোৎসর্গ। নায়িকা হিসাবে নায়ক-প্রতিনায়কের যাবতীয় সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ববিকাশের সেই নিমিত্ত। শৈবলিনীর মত চরিত্র উপলক্ষ করিয়া একদিকে

চন্দ্রশেখর অপর দিকে প্রতাপ বঙ্কিম ছাড়া বিশ্বের কয়জন সাহিত্যশিল্পী সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন তাহা গবেষণার বিষয় বটে।

শৈবলিনীর চরিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা দ্বিবিধ মত প্রকাশিত হইতে শুনিয়াছি। প্রাচীনেরা বলিতেন এরূপ অত্যুগ্র কামনার ও স্বৈরাচারের চিত্র অঙ্কিত করিয়া বঙ্কিম সৎসাহিত্যের সৃষ্টি করেন নাই। পাপের এমন অত্যুজ্জ্বল চিত্র প্রায়শ্চিত্তের দীর্ঘ বর্ণনা সত্ত্বেও অম্লান রহিয়া গিয়াছে, অতএব বঙ্কিম রুচিবিকারের সহায়তা করিয়াছেন। ইদানীং শুনিতে পাই শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের অতিবিস্তৃত ব্যবস্থায় এবং অতিরিক্ত নীতিবাদের ফলে চন্দ্রশেখর উপন্যাসের সৌন্দর্য্যহানি ঘটিয়াছে। আমাদের মনে হয় এ দুইটি অত্যুক্তির কোনটিই সত্য নহে এবং বঙ্কিমের সম্যগ্‌দৃষ্টি ও সামঞ্জস্য-বোধ যাহা করিয়াছে তাহাই ঠিক। শৈবলিনীর পাপ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত না করিলে চন্দ্রশেখর বা প্রতাপ কাহারও চিত্রে এত দীপ্তি ফুটিয়া উঠিত না। আর, শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের যৎসামান্য ব্যবস্থা হইলে তাহা বিবাহ-বিচ্ছেদের মোকদ্দমা-মীমাংসায় ব্যভিচারিণীর পক্ষে দুঃখ প্রকাশের পত্রাকারই ধারণ করিত। তবে বঙ্কিম যে নীতিবাদী ছিলেন ইহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহার হালের কলঙ্ক অঙ্গীকার করাই উচিত মনে হয়। কিন্তু কি অর্থে তিনি নীতিবাদী ছিলেন তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার। পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং আমরা পরেও বলিব যে

সাহিত্যশিল্পী হিসাবে তিনি মানিতেন Keatsএর মত শুধু 'Truth is Beauty and Beauty truth' নয়, পরন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির মূলকথা Truth is Good and Good Beauty*। তিনি মানিতেন সত্য, শিব, সুন্দর, অভিন্ন—যাহা শিব নয় তাহা সত্যও নয়, সুন্দরও নয়। কাজেই শৈবলিনীর নীতিবিরুদ্ধ, সমাজদ্রোহী, আত্মসর্ব্বস্ব, ইন্দ্রিয়-পরবশ, উৎকট কামনাকে তিনি অসত্য, অসুন্দর, অকল্যাণকর অতএব দণ্ডার্হ মনে করিয়াই গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য গোপন করা বঙ্কিমের কখনও অভ্যাস ছিল না, কারণ উদ্দেশ্যকে বিবৃত করিয়াও রচনাকে সুন্দর করিবার অসামান্য ক্ষমতা তাঁহার আয়ত্ত ছিল। তাই দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন "পাপের অনর্থকতা, আর সার্থকতা কি ? বরং অনর্থকতাই ভাল। কিন্তু একদিন সে শৈবলিনী এ কথা বুঝিবে ; একদিন প্রায়শ্চিত্তের জন্য সে অস্থি পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবে। সে আশা" অর্থাৎ আঁকিবার ক্ষমতা "না থাকিলে আমরা এ পাপের চিত্র অবতারণা করিতাম না।" প্রত্যুত পাপ যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে প্রায়শ্চিত্ত তেমনই কঠোর ও ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইয়া শিল্প-সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে।

---

* "The perfection of existence is the result of the union of Nature and Soul ; of the Physical with the Super-Physical ; of the Beauty with Truth and Goodness ; of the Human with the Divine." (Bankim Chandra : Letters on Hinduism, Letter IV.)

বর্ণিত প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আবার একদিকে শুনা যায় ইহা "বিরাট কল্পনার দ্বারা মহিমান্বিত," অন্যদিকে একথাও শুনা যায় যে উহা মামুলী নরকদর্শনের ব্যবস্থা। কিন্তু কাহার পক্ষে এবং কি ভাবেই বা হালের ব্যবস্থা হইতে পারিত? শৈবলিনী ত সেকালের সর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জিত একালের নারী নহে। সেকালের মেয়ে সে যতই বলুক 'আমার আবার ধর্ম্ম কি,' সেকালের সংস্কারে তাহার অন্তর পূর্ণ। পাপপুণ্য, স্বর্গনরক, প্রভৃতির সংস্কার অষ্টাদশ শতাব্দীর অশিক্ষিতা বাঙ্গালীমেয়ের মনের অন্তস্থলে প্রচ্ছন্ন না থাকিবার কোন কারণ দেখা যায় না। (ইহা Jung বর্ণিত 'Collective unconscious' বা জাতিগত সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত নহে কি?) প্রতাপকে না পাইলে সে অবশেষে কাশী গিয়া ভিখারিণীর জীবন যাপন করিতে চায়। সামাজিক সংস্কার ত পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ফষ্টরের বজরায় থাকিয়াও সে 'জাতি'-ভ্রষ্ট হইতে চাহে না, পানাহারে হিন্দুর আচার রক্ষা করিতে ইচ্ছুক। কাজেই তাহার সচেতন বা জ্ঞানগোচর (conscious) মনের বিকৃতি ঘটিলে জ্ঞানাগোচর বা অবচেতন (sub-conscious) মনের মায়ারচনা যে চলিতে থাকিবে, আধুনিক মনোবিকলনের (psycho-analysisএর) সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই[১]। বরং বঙ্কিমের অপরোক্ষানুভূতি বা দিব্যদৃষ্টি যে

১ "The dissolution of the *persona* (the personal conscious, subliminal and repressed unconscious) results in the release of phantasy, which is nothing else but the functioning of the

সেকালে হালের সিদ্ধান্ত-সম্মত সৃজনকুশলতার পরিচয় দিতে পারিয়াছিল তাহাতে বিস্ময় মানিবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রতাপের নিকট প্রতিশ্রুতির ফলে শৈবলিনীর চিরসঞ্চিত অতৃপ্তকামনার সহসা ব্যর্থতা উপলব্ধি ও তাহার চিত্তের প্রবলতম বৃত্তির আকস্মিক ও একান্ত নিরোধের ফলে আধুনিক Psychiatryর ভাষায় যে psychic traumaর সৃষ্টি হয় তাহাতে তাহার মনের গুরুতর বিকার বা উন্মত্ততা যে অত্যন্ত স্বভাবসঙ্গত পরিণতি ইহা কামোন্মাদের বিশেষজ্ঞগণ সহজেই স্বীকার করিবেন। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীনে'র শিক্ষিতা Spencerian কিরণময়ী, শৈবলিনী অপেক্ষা অনেক বেশী মার্জ্জিত বুদ্ধির (intellectual) ও অনেক কম ভাবময়ী (emotional) চরিত্র হইয়াও, এযুগেই বা মস্তিষ্ক-বিকৃতি এড়াইতে পারিল কই? অর্থাৎ তাহার স্রষ্টা তাহার কামনামথিত মার্জ্জিত বুদ্ধির মহা-প্রলয়ই স্বাভাবিক পরিণতি মনে করিয়াছেন। আর, শৈবলিনীর উন্মাদ অবস্থায় সংস্কারবশে পুনঃ পুনঃ নরকের চিত্রদর্শনে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নাই। ইহা পৌরাণিক লেখকদিগের অনুকরণ নহে, আধুনিক মনোবিকলন তত্ত্বের প্রতিপাদিত কথার বঙ্কিমকল্পিত পূর্ব্বাভাস ( anticipation ) মাত্র। এ অবস্থায় গুহামধ্যে শৈবলিনীর তত্ত্বাবধানের যে ব্যবস্থা করা

collective psyche. This release brings into consciousness a rich mine of mythological thought and feeling, having an analogy with mental derangement." (Devine; 'Recent Advances in Psychiatry', p. 305).

হইয়াছে তাহাকেও অবৈজ্ঞানিক প্রণালী বলা যায় না।[১] তেমনই রমানন্দস্বামী শৈবলিনীর উপবাসক্লিষ্ট নির্ব্বিষয় চিত্তে "বিষয়বতী প্রবৃত্তি" উৎপন্ন করিবার জন্য চন্দ্রশেখরের অনুধ্যান করিতে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে নিঃশেষে মজ্জনোন্মুখ শৈবলিনীকে আশ্রয়-তরণীর সন্ধান দিয়া তাহার উন্মত্ততা ক্রমশঃ দূর হইবার যোগশাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থাই দিয়াছিলেন।[২] ফল বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে ভিন্ন অর্থাৎ উন্মত্ততার মধ্য দিয়া তাহার পুরাতন মনোনাশ ও নবচিত্ত নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা ভিন্ন তাহার পূর্ব্বসঙ্কল্পাত্মক মনের ধারা পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা খুব কমই ছিল। সুন্দরীকে সে ত স্পষ্টই বলিয়াছিল, 'মরি আর বাঁচি আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ঘরে আর ফিরিব না'।

কাব্যের দিক্ দিয়া শৈবলিনীর মত অশান্ত চরিত্রের তিন প্রকার সমাপ্তি সম্ভব ছিল। আত্মহত্যা, Anna[৩] বা Bovary[৪] যেরূপ করিয়াছিল, উন্মাদ যেমন কিরণময়ীর[৫] ঘটিয়াছিল, অথবা তাহার প্রকৃতির অস্বাস্থ্য অতিক্রম করিয়া শান্তি বা এই জীবনেই জন্মান্তর লাভ। বঙ্কিম শেষোক্ত পরিণতিই সুষ্ঠু মনে করিয়াছিলেন।

---

১ "The importance of psychotherapy in such a case would then need to be emphasised—skilled and tactful nursing, a quiet room, the dissipation of delirious fears and so on." (Devine: 'Recent Advances in Psychiatry', p. 284).

২ 'বিষয়বতী বা প্রবৃত্তি রুৎপন্না মনসঃ স্থিতি নিবন্ধনী' (যোগসূত্র : ১।৩৫)।

৩ Tolstoy: 'Anna Karenina,' ৪ Flaubert: 'Madame Bovary'.

৫ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'চরিত্রহীন'।

কেহ কেহ বলেন "শৈবলিনীর চরিত্র ঠিক বাঙ্গালীর মেয়ের মত হয় নাই।"[১] তাঁহারা 'ঠিক' শব্দ কি অর্থে ব্যবহার করেন? আদর্শ, সাধারণ, না ছাঁচ ( model ), কোন অর্থে? শৈবলিনী যে বাঙ্গালীমেয়ের আদর্শ চরিত্র হিসাবে অঙ্কিত হয় নাই ইহা বলাই বাহুল্য। বঙ্কিমের মতে আদর্শ বাঙ্গালী নারীর মাধুর্য্যঘন চিত্র সূর্য্যমুখী কমলমণি বা তাহার বিভিন্ন সংস্করণ। সাধারণ ( representative ) বাঙ্গালী মেয়ের চিত্রেও তাঁহার গ্রন্থ পরিপূর্ণ। আর শৈবলিনীকে তিনি যে সাধারণ বাঙ্গালী-মেয়ে হিসাবে চিত্রিত করেন নাই ইহা সত্য। শৈবলিনী সাধারণ নিয়ম হইতে ব্যতিক্রমের অসাধারণ দৃষ্টান্ত —এমন বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত যাহা নিয়মকে প্রতিপন্ন করে। বাঙ্গালী মেয়ের স্বভাবসুন্দর শান্ত পবিত্র অথচ ভাবাবেগময়ী প্রকৃতির সে হইতেছে তির্য্যগ্‌গতি। অথচ ছাঁচে সে বাঙ্গালীর মেয়ে। অশনে, বসনে ও অঙ্গরাগে, রুচিতে, শুচিতার ধারণায় ও বিদ্বেষে, মনের গঠনে, ভাবসর্ব্বস্বতায় ও অন্তরের সংস্কারে, সে বাঙ্গালী হিন্দুর মেয়ে বটে। বানের জলে বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া নদীটি বাঙ্গলার নদী নহে বলিলে চলিবে কেন? যে 'সুন্দরীর' চিত্র বঙ্কিম আঁকিয়াছেন—শুধু কোন্ নিয়ম হইতে শৈবলিনী ব্যতিক্রম তাহা দেখাইবার জন্য—তাহার সহিত শৈবলিনী সংস্কারে এক, শুধু মনোবৃত্তিতে বিভিন্ন। একজন সুস্থ, আর একজন বিকারগ্রস্ত।

১ গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী : 'বঙ্কিমচন্দ্র'।

কেহ কেহ আবার বলেন "বহুবিধ সংস্কার" ও "অলৌকিক ব্যাপারে"* চন্দ্রশেখর ভারাক্রান্ত। কিন্তু একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, যে চরিত্রের অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত গতি ও সহজ শান্তিময় পরিণতি প্রসঙ্গে তথাকথিত অলৌকিক ব্যাপারের সংমিশ্রণ বা অবতারণা ঘটিয়াছে সে চরিত্র অনন্য-সাধারণ, অতি সহজে তাহার সমস্যারও সমাধান হইবার নহে। শৈবলিনীর মত একটি প্রচুর জীবনীশক্তি ও প্রবলভাবাবেগ-সম্পন্ন দৃঢ়সঙ্কল্প নারী-চরিত্রের দুর্ব্বারগতি চিত্র করা অপেক্ষাকৃত সহজ, তাহার আদ্যন্ত ও পরিবর্ত্তনদশাগুলি বিজ্ঞানসম্মতভাবে অঙ্কিত করাই কঠিন। যে দূরদৃষ্টি সহকারে বঙ্কিম শৈবলিনীর জীবন-লীলার উপক্রমের ও তাহার 'early sorrow'র† বর্ণনা করিয়াছেন আজ তাহার দিব্যশক্তি ও অগ্রগামিত্ব উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আজ Freud প্রভৃতির গবেষণার ফলে, "contrary to the usual belief that children have no sexuality and that only at puberty does it suddenly arise", আমরা সহজেই বলিতে পারি "there was a very marked kind of sexuality among children of the most tender years entirely instinctive and capable of producing a grave

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ প্রকাশিত জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

† শব্দ দুইটি Thomas Mann এর গল্পের শিরোনাম হইতে গৃহীত।

effect on the entire system," কিন্তু বঙ্কিম যে দিন আট বৎসরের মেয়ের প্রণয়ের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন "বাল্য প্রণয়ে অভিসম্পাত আছে" এবং তাহার এক অভিনব কাহিনী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সে দিন psycho-analysis বা মনোবিকলনের স্বপ্নও কেহ দেখে নাই। Neurosis বা স্নায়ুবিকারের ভিত্তি যে আসন্নযৌবনোদয়ে এমন কি কৈশোরে-বাল্যেও স্থাপিত হইতে পারে এ তত্ত্ব যে দিন কাহারও জানা ছিল না সে দিন কতলোক না বলিয়াছে বঙ্কিম অনধিক দ্বাদশ-বর্ষের বালিকার পক্ষে ব্যর্থপ্রেমে মরিবার জন্য সাঁতার দিবার এক অভাব্য কল্পনা করিয়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে স্বপ্নের প্রতীকত্ববাদ ( symbolism of dreams ) প্রচারিত হইবার বা স্মৃতিশক্তির রোগজ ব্যত্যয় দূরীকরণে সম্মোহন (hypnosis) চিকিৎসা-প্রণালী গণ্য হইবার, এমন কি, Psychiatryর ইদানীন্তন প্রসারের পরেও শৈবলিনীর স্বপ্ন বা মনোবিকার বা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের পুনরুদ্ধার সম্পর্কীয় ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার তথাকথিত অপরাধে বঙ্কিম-প্রতিভাকে "বহুবিধ সংস্কার ও অলৌকিক ব্যাপারে" গ্রস্থ ভারাক্রান্ত করিবার গ্লানিভাজন হইতে হয়। আমরা কিন্তু মনে করি এমন দিন প্রায় আগত, যে দিন শৈবলিনীর চরিত্রস্রষ্টা প্রগাঢ় মনস্তত্ত্ববিদ্ বলিয়া শুধু নহেন পরন্তু মহাকবির কালজয়ী অনুভূতিবলে মনোবিকলনের ( Psycho-analysis এর ) রহস্যদ্রষ্টা অসামান্য মনীষী বলিয়া গণ্য হইবেন।

পরিশেষে গ্রন্থকার ইতিহাসের যে ফ্রেমে বাঁধাইয়া চন্দ্রশেখরের চিত্রাবলী আমাদের উপহার দিয়াছেন তাহাতে গৌণ ও মুখ্য স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে যে বিভিন্নতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহা অত্যন্ত মনোজ্ঞ। দলনীর প্রেমনিষ্ঠা ও নবাবের নিকট প্রত্যাবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা যেমন শৈবলিনীর ব্যভিচার ও বিপ্রকর্ষণকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, মীরকাসেমের অন্তিম অবিশ্বাস ও অক্ষমা তেমনই চন্দ্রশেখরের উদার তিতিক্ষাকে অধিকতর সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করিয়াছে।

নায়কদিগের চরিত্রগৌরবে, নারীচরিত্রের বর্ণরাগে ও সৃষ্টি-কৌশলে, রিরাট ব্যাপক কল্পনায় ও বর্ণনা-বৈচিত্র্যে, মহদুদ্দেশ্যে ও উদ্দেশ্যের প্রতি স্থির লক্ষ্যে, চন্দ্রশেখর ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের* সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়াই আমরা মনে করি। আর মুসলমান ভ্রাতৃবর্গকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যে বঙ্কিম প্রতাপকে উদয়নালার সমরক্ষেত্রে মৃতুবরণ করাইয়াছেন, আর শৈবলিনীর পার্শ্বে দলনীর চিত্র আকিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে মুসলমান বিদ্বেষের স্থান থাকিতে পারে কি না?

যেখানে শৈবলিনীর ন্যায় মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ু দিক্ হইতে দিগন্তরে শুধু দহনদাহনের বার্ত্তা বহিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত সেখানে দলনীর মাধুর্য্যময়ী ক্ষুদ্র জীবনকাহিনী এক অপ্রত্যাশিত মরূদ্যানের অমৃতময়ী উৎসধারাই বটে।

---

* 'ঔপন্যাসিক' ও 'ঋষি' বঙ্কিমের পার্থক্য আমরা শ্রীঅরবিন্দের উক্তি অনুসারেই এখানে কল্পনা করিলাম।

# রজনী

# রজনী

( ১৮৭৭* )

রজনী বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষক উপন্যাস বলিয়া পরিচিত। উপন্যাসখানিতে বঙ্কিমচন্দ্র Wilkie Collins প্রণীত Woman in White এর আদর্শে বিভিন্ন চরিত্রের উক্তির দ্বারা উপাখ্যান-রচনার যে অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি সাফল্য লাভ করেন নাই, বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীদের তথাকথিত আত্মকথার প্রসঙ্গে তাহাদের বিশেষ বিশেষ যোগ্যতা ও স্ব স্ব কথনভঙ্গী যে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই অর্থাৎ গ্রন্থকার হিসাবে আত্মগোপন করিতে পারেন নাই, কাজেই গল্প-রচনার এই নূতন ধারা ব্যর্থ হইয়াছে, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন এবং আমরাও স্বীকার করি। এমন কি কোন কোন স্থলে গল্পধারার নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা হয় নাই, আকস্মিকতাও আসিয়া গিয়াছে (যথা অমরনাথের সহিত রজনীর প্রথম সাক্ষাৎ) এবং যেখানে স্বভাবসঙ্গতির দাবীতে পাঠক অধিকতর আলোকসম্পাত আশা করে তেমন স্থলও স্বল্পালোকিত রহিয়া গিয়াছে ( যথা গঙ্গা-প্রবাহে নিমজ্জিত রজনীর উদ্ধার )। কিন্তু রচনার এই সকল

---

* ১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শনে'র ভাদ্র সংখ্যায় চন্দ্রশেখর সমাপ্ত হয়, আশ্বিন সংখ্যা হইতে রজনী প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১২৮৪ সালে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

শিল্পগত ত্রুটি সত্ত্বেও বঙ্কিমের চরিত্রসৃষ্টি রজনীতে যে বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে তাহাতে উপন্যাসখানি চিরদিন পাঠক-সমাজের নিকট সমাদর লাভ করিবে। বস্তুতঃ রজনীর বৈশিষ্ট্য তাহার চরিত্রগৌরবে এবং সে গৌরবে কথাপ্রসঙ্গের ত্রুটিবিচ্যুতি অনেকাংশে চাপা পড়িয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরে মনস্তত্ত্বের যে গভীর গহনে প্রবেশ করিয়াছিলেন আমরা পূর্ব্বেই তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু, তাহাতে তাঁহার মনোবীক্ষণ-শক্তির যে পরিচয় আমরা পাই না কেন, চন্দ্রশেখর-রচনায় কোন মনস্তত্ত্ব প্রতিপাদন করা বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। সেরূপ উদ্দেশ্য বিবৃত দেখিতে পাই রজনীর বিজ্ঞাপনে। অন্ধনায়িকাকে আশ্রয় করিয়া গ্রন্থ-রচনার কৈফিয়ৎ বঙ্কিম বিজ্ঞাপনে বা ভূমিকায় এইরূপ দিয়াছেন—

"যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধযুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্ম্মাণ করা গিয়াছে।"

অতএব "Rajani is a novel without any purpose"[১] নহে, বরং উল্লিখিত উদ্দেশ্যের সার্থকতা Nydia চরিত্র অপেক্ষা রজনীর চরিত্রে অনেক বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে। The Last Days of Pompeiiএর পাঠককে Nydiaর

১ **A critical study of the life and novels of Bankim Chandra by Dr. J. K. Das Gupta, p. 86.**

সাবলীল গতিবিধি ও ক্ষিপ্রকারিতায় অনেক সময় তাহার দৃষ্টি-হীনতার কথা বিস্মৃত হইতে হয়, কিন্তু রজনীর দৃষ্টিহীনতাজনিত দুর্ব্বলতা কোথাও অপরিস্ফুট নহে। আর, রজনীর চরিত্রে বঙ্কিম যে নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহার জন্য অন্ধ নারীর একান্ত আবশ্যকতা সুস্পষ্ট না হইলেও এই চরিত্রে যে সকল মানসিক তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন 'অন্ধ যুবতীর সাহায্যে' বিশেষ মনোজ্ঞভাবেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। অন্ধ পুষ্পনারী সে ফুলের স্পর্শে সুখী, ফুলের গন্ধে নন্দিত, আর শব্দজগতের আনন্দধ্বনিতে শ্রবণ ভরিয়া লইয়া রূপজগতের অভাব পূরণ করিয়া লইয়াছে। তবু দিনের পর দিন মালা গাঁথিয়া যদি বিশ বৎসর বয়সে যৌবনচঞ্চলমনে কোন অভাব বোধ হইয়া থাকে তবে তাহার গুঞ্জনেই তাহা প্রকাশিত। অন্তরের উচ্ছ্বসিত অনুরাগকে পাত্রস্থ করার আকুলতা সে রহস্যচ্ছলে প্রথমে মনুমেণ্টকে এবং পরে শিশু বামাচরণকে পতিত্বে বরণ করিয়া প্রথম পরিচ্ছেদেই জানাইয়া দিয়াছে। যাহার কোন বহিরিন্দ্রিয় অক্ষম তাহার অপরাপর জ্ঞানেন্দ্রিয় সবল হইয়াই থাকে, বিশেষতঃ অন্ধের শব্দেন্দ্রিয়[১] ও স্পর্শেন্দ্রিয়। অতএব শব্দমাধুর্য্য ও স্পর্শরসের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া তাহার প্রণয়পাত্রের সন্ধান মিলিল তাহার যে

---

১ "Sounds certainly play a far more prominent part in the mental life of the blind than in our own." "The mutations of sound, far and near, constitute their chief delight." (William James : 'Psychology', Vol. I, p. 205).

অপরূপ বর্ণনা রজনীতে দেখা যায় Lyttonএর গ্রন্থে তাহা দুর্লভ। রজনীর বর্ণনা—

"ফুল লইয়া গিয়া লবঙ্গের কাছে গেলাম। দেখিয়া লবঙ্গ বলিলেন কি লো কাণি—আবার ফুল লইয়া মরতে এসেছিস্ কেন? কাণী বলিলে আমার হাড় জ্বলিয়া যাইত—আমি কি কদর্য্য উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, এমত সময়ে হঠাৎ কাহার পদধ্বনি শুনিলাম—কে আসিল, যে আসিল—সে বলিল—'এ কে ছোট মা?'

ছোট মা? তবে রামসদয়ের পুত্র। রামসদয়ের কোন্ পুত্র! বড় পুত্রের কণ্ঠ একদিন শুনিয়াছিলাম—সে এমন অমৃতময় নহে—এমন করিয়া, কর্ণবিবর ভরিয়া, সুখ ঢালিয়া দেয় নাই। বুঝিলাম, এ ছোট বাবু।"

কর্কশতার মধ্যে আসিল কমনীয় ধ্বনি, শ্রুতিসুখের মারফতে প্রেম জাগিল। কাহার উদ্দেশ্যে? বর্ণনা চলিল—

"ছোট মা বলিলেন, এবার বড় মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, 'ও কাণা ফুলওয়ালী—"

ফুলওয়ালী! আমি বলি বা কোন ভদ্রলোকের মেয়ে!"

ফুলওয়ালীর পেশা যত ছোটই মনে করুক রজনীর শ্রী যে শচীন্দ্র উপলব্ধি করিয়াছে রজনী তাহা বুঝিল—

"লবঙ্গ বলিলেন, 'কেন গা, ফুলওয়ালী হইলে কি ভদ্রলোকের মেয়ে হয় না'?

ছোটবাবু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, 'হবে না কেন? এটি ত ভদ্রলোকের মেয়ের মতই বোধ হইতেছে। তা ওটি কাণা হইল কিসে?'

লবঙ্গ। ও জন্মান্ধ।

ছোটবাবু। দেখি?"

রজনী অপরিচিতের কর্কশ ব্যবহারেই অভ্যস্ত এখানে যেন কোমল অনুকম্পার আভাস পাইল। তা' ছাড়া ছোটবাবুর গুণের খবরও সে রাখে—বলিতেছে—

"ছোটবাবুর বড় বিদ্যার গৌরব ছিল। তিনি অন্যান্য বিদ্যাও যেরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থের প্রত্যাশী না হইয়া চিকিৎসা শাস্ত্রেও সেইরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। লোকে রাষ্ট্র করিত যে, শচীন্দ্রবাবু, ছোটবাবু, কেবল দরিদ্রগণের বিনামূল্যে চিকিৎসা করিবার জন্য চিকিৎসা শিখিতেছিলেন। দেখি বলিয়া আমাকে বলিলেন, 'একবার দাঁড়াও ত গা'।

আমি জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলাম।

ছোটবাবু বলিলেন, 'আমার দিকে চাও'।"

"ছোটবাবুর মনের মত হইল না। তিনি আমার দাড়ি ধরিয়া মুখ ফিরাইলেন।"

রজনী বলিতেছে—

"ডাক্তারের কপালে আগুন জেলে দিই। সেই চিবুক স্পর্শে আমি মরিলাম।"

অর্থাৎ শব্দের বাণী স্পর্শ সমর্থন করিল। সে কি প্রবল সমর্থন[১]!

---

১ "Mr. Hanks Levy, the blind author . . . gives the following account of his powers of perceptions: 'I seem to perceive objects through the skin of my face, and to have the impressions immediately transmitted to the brain. The only part of

রজনীর মুখে প্রকাশ—

"সেই স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যুথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি—সব ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম। বোধ হইল আমার আশে পাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পরণে ফুল, আমার বুকের ভিতর ফুলের রাশি। আ মরি মরি! কোন্ বিধাতা এই কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল। বলিয়াছি ত কাণার সুখদুঃখ তোমরা বুঝিবে না। আ মরি মরি—সে নবনীত-সুকুমার—পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ। বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ, যার চোখ আছে, সে বুঝিবে কি প্রকারে?"

শব্দস্পর্শের সম্মোহন বার্ত্তা রূপানুভূতির কি তীব্র আকাঙ্ক্ষাই না জাগাইল! অন্ধের সে আকাঙ্ক্ষা ত' পূর্ণ হইবার নহে। কাজেই ব্যথাতুর রজনীর কাতরোক্তি :—

"বহুমূর্ত্তিময়ি বসুন্ধরে! তুমি দেখিতে কেমন? তুমি যে অসংখ্য, অচিন্তনীয় শক্তিধর, অনন্ত বৈচিত্র্যবিশিষ্ট জড় পদার্থ সকল হৃদয়ে ধারণ কর, সে সব দেখিতে কেমন? * * * বল মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত পুরুষজাতি দেখিতে কেমন? দেখাও মা, তাহার মধ্যে যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন? দেখা মা, দেখিতে কেমন দেখায়? দেখা কি? দেখা কেমন? দেখিলে কিরূপ সুখ হয়? এক মুহূর্ত্ত জন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না? দেখা মা! বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে থাকুক মা! আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া মনের সাধে রূপ দেখে নারীজন্ম সার্থক করি। সবাই দেখে,

my body possessing this power is my face'." (W. James: 'Psychology', Vol. I. p. 204). বঙ্কিম বৃথাই চিবুক স্পর্শের অবতারণা করেন নাই।

আমি দেখিব না কেন? * * * শুধু দেখা * * * সবাই অবহেলে দেখে—কি দোষে আমি কখনও দেখিব না?

না, না, অদৃষ্টে নাই। হৃদয়মধ্যে খুঁজিলাম। শুধু শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ। আর কিছু পাইলাম না।

আমার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিতে লাগিল, কে দেখাবি দেখা গো—আমায় রূপ দেখা! বুঝিল না। কেহই অন্ধের দুঃখ বুঝিল না।"[১]

Nydiaর মধ্যে রূপানুভূতির জন্য এই সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা কোথাও প্রকাশ পাইতে দেখি না। অথচ ইহা কত মনোবিজ্ঞান-সম্মত। যাহা হোক বঙ্কিমের বক্তব্য বুঝিলাম। সাধারণতঃ চোখের দেখায় রূপজরাগের উদয় হয়—রজনীর ক্ষেত্রে, শ্রুতি ও স্পর্শ সুখের মাধ্যমে রাগরঞ্জিত হৃদয়ে দর্শনলালসা জাগিল। অন্ধের এ লালসা ত চরিতার্থ হইবার নহে, কাজেই শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বরে শ্রুতিবিনোদনের আকাঙ্ক্ষায় রজনী প্রতিদিন মিত্রদের বাড়ী যাতায়াত করিতে লাগিল—সে সুখের সম্ভাবনাও অনিশ্চিত, আশাও প্রায় বিফল হইত, তবুও রজনী যাইত এবং না যাইবার পণ যতবার করিত ততবার ভাঙ্গিত—(তৃতীয় পরিচ্ছেদ)।

গোপালের সহিত লবঙ্গলতাকৃত বিবাহ-প্রস্তাবে একদিন অসম্মতি জানাইয়া তিরস্কৃত হইয়া রজনী যখন ফিরিতেছে তখন শচীন্দ্র তাহাকে সিঁড়িতে কাঁদিতে দেখিয়া হাত ধরিয়া

১ ১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ ৯–১১ পৃঃ।

মরণকেই আলিঙ্গন করিল। মরণ কিন্তু তাহাকে গ্রহণ করিল না, জীবনের কূলে তুলিয়া দিয়া গেল। ভাসমানা অবস্থায় এক গহনার নৌকা তাহাকে উঠাইয়া লইল, কিন্তু সে পড়িল পুনরায় এক দুর্বৃত্তের হস্তে যাহার আক্রমণ হইতে অমরনাথ তাহাকে উদ্ধার করিল। অমরনাথের চেষ্টায় শুধু তাহার জীবন ও সম্ভ্রম যে রক্ষা পাইল তাহা নহে, পুনরায় তাহার পালক পিতার আশ্রয়লাভ, এমন কি তাহার পিতৃব্যের সম্পত্তিলাভও অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটিল। কৃতজ্ঞতার এত বড় পাত্র অমরনাথ তাহাকে ভালও বাসিল, বিবাহ করিতে উৎসুক হইয়া প্রস্তাবও করিল, ফলে দুঃখের দিনের বাধা-বিপত্তি অপেক্ষা সুখের দিনের সমস্যা তাহার পূর্ব্ব সঙ্কল্পের অধিকতর পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু শচীন্দ্রের প্রতি তাহার জাগ্রত প্রেমের অশ্রুজলে অমরনাথের সকল আশার বিসর্জ্জন হইয়া গেল। রজনীর সর্ব্বজয়ী প্রেম কৃতজ্ঞতার অন্তরায় অবশেষে কেমন করিয়া অতিক্রম করিল অমরনাথের বর্ণনায় তাহা নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশিত—

"যে দিন রজনী শচীন্দ্রকে দেখিয়া আসিয়াছিল সেই দিন অপরাহ্নে আমি রজনীকে এই কথা বলিতে গেলাম। গিয়া দেখি রজনী একা বসিয়া কাঁদিতেছে। * * *

আমি বড় কাতর হইলাম। বলিলাম, 'দেখ রজনী, তোমার যাহা কিছু দুঃখ, তাহা জানিতে পারিলে আমি প্রাণপাত করিয়া তাহা নিবারণ করিব—তুমি কি দুঃখে কাঁদিতেছ, আমায় বলিবে না'?

রজনী আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বহু কষ্টে আবার রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল, 'আপনি এত অনুগ্রহ করেন, কিন্তু আমি তাহার যোগ্য নহি'।

আমি। 'সে কি রজনি? আমি মনে জানি, আমিই তোমার যোগ্য নহি। আমি তোমাকে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি'।

রজনী। 'আমি আপনার অনুগৃহীত দাসী, আমাকে অমন কথা কেন বলেন'?

আমি। 'শুন রজনি! আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া ইহজন্ম সুখে কাটাইব, এই আমার একান্ত ভরসা। এই আশা আমার ভগ্ন হইলে বুঝি আমি মরিব। কিন্তু সে আশাতেও যে বিঘ্ন তাহা আমি তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। * * * প্রথম যৌবনে একদিন আমি রূপান্ধ হইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলাম—জ্ঞান হারাইয়া চোরের কাজ করিয়াছিলাম। অঙ্গে আজিও তাহার চিহ্ন আছে। * * * আর কখনও কোন অপরাধ করি নাই। চিরজীবন সেই একদিনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। আমাকে কি তুমি গ্রহণ করিবে'?

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'আপনি যদি চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকেন—আপনি যদি সহস্র ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আপনি আমার কাছে দেবতা। আপনি আমাকে চরণে স্থান দিলে আমি আপনার দাসী হইব। কিন্তু আমি আপনার যোগ্য নহি'।" * * *

"আমি। 'সে কি রজনি'?

রজনী। 'আমার এই পাপ মন পরের কাছে বিক্রীত।'

"আমি চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,'সে কি রজনি'?

রজনী বলিল 'আমি স্ত্রীলোক—আপনার কাছে ইহার অধিক আর কি প্রকারে বলিব? কিন্তু লবঙ্গঠাকুরাণী সকলই জানেন। যদি আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে সকল শুনিতে পাইবেন'। * * *

আমি তখনই মিত্রদিগের গৃহে গেলাম। * * * দেখিলাম লবঙ্গলতা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া শচীন্দ্রের জন্য কাঁদিতেছে।"

* * *

"আপনার দুঃখ রাখিয়া আগে লবঙ্গের দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। লবঙ্গ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত সমুদয় বলিল। * * * তারপর রজনীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম; 'রজনী সকল কথা বলিতে বলিয়াছে—বল'। লবঙ্গ তখন রজনীর কাছে যাহা শুনিয়াছিল অকপটে সকল কথা বলিল।"

"রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর, মাঝখানে আমি কে?"[১]

অমরনাথ রজনীকে মুক্তি দিয়া 'ভবেরহাটে দোকানপাট' উঠাইল। রজনীর অশ্রু শুকাইল, তাহার প্রেমজীবনের প্রথম সঙ্কল্প, সকল কথার শেষে, সার্থকই হইল। অন্ধের দৃষ্টিহীনতা আঁখির বিলাসের বাঁধা সৃষ্টি করিয়া অন্তরের একাগ্রতার সহায় হইয়াছিল এই মনস্তত্ত্ব প্রতিপাদন করা বঙ্কিমের উদ্দেশ্য থাকিলেও[২] তাহার প্রেম-সাধনাকে সকল দুঃখ, দুর্দ্দশা, নিমজ্জন, লাঞ্ছনা, এমন কি সৌভাগ্যও দ্বন্দ্বের অতীত সিদ্ধিতে

---

১ ৫।১।৮০-৮১ পৃঃ।

২ রজনী লবঙ্গলতাকে বলিয়াছিল "ঠাকুরাণি, তোমাদের চক্ষু আছে—চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে কি"। ৪।৩

পৌঁছিয়া দিয়া অন্ধনারীর ঐকান্তিক অনুরাগের যে অপূর্ব্ব ছবি সহানুভূতিপূর্ণ সুকোমল তুলিকায় তিনি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহার প্রশান্ত মাধুর্য্য ও পূত সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই।

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন Nydia? উত্তরে আমরা আবার বলিব লিটনের নিজের উক্তিমতেই ত Nydia ছিল 'crafty' 'cunning'। কিন্তু বঙ্কিম রজনীকে বুদ্ধিমতী করিয়া চিত্রিত করিলেও তাহাতে 'cunning' বা চতুরতার ভাঁজ নাই। ফলে রজনীর চরিত্র অনেক বেশী আত্মসম্ভ্রমসমৃদ্ধ, ও আত্ম-মর্য্যাদাসম্পন্ন (dignified) চরিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর Nydiaর চাতুর্য্যই না তাহাকে Glaucus এর সকল দুঃখ-দুর্ভোগের জন্য দায়ী করিয়াছে? অবশ্য Glaucusকে সে আবার মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিল সত্য, কিন্তু তাহার বশীকরণ-প্রচেষ্টা তাহার চরিত্রকে যে ভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে তাহাতে Nydiaর ব্যর্থ প্রণয়কে মৃত্যুবরণ করাইয়া তবে পাঠকের করুণা জাগ্রত করা Lyttonএর পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

অন্ধ নারীকে উপলক্ষ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিতে গিয়া তাহার প্রণয়ী সৃষ্টি করিতে বঙ্কিম সহজ উপায় অবলম্বন করেন নাই। উপন্যাসের পরিকল্পনায় রজনীর স্বামী হইতেছে 'পদ্মচক্ষুতে' অনাকৃষ্ট শচীন্দ্র। 'রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ, রজনী পুষ্পবিক্রেতার কন্যা এবং রজনী অশিক্ষিতা' বলিয়া শচীন্দ্র রজনীকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। শচীন্দ্র অমরনাথের

ন্যায় ভাবপ্রধান ('viscerotonic') চরিত্র নহে। সে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সমাদরকারী, চিকিৎসা-বিদ্যায় কৃতবিদ্য, জড়বাদী, বুদ্ধিজীবী ('cerebrotonic') আধুনিক যুবক। সে আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, মনের অতিরিক্ত আত্মা মানে না। দেহমনের স্বতন্ত্রতা মানিতে প্রস্তুত থাকিলেও সন্ন্যাসীর জেরায় মন শরীরের ক্রিয়া মাত্র (function of the brain) স্বীকার করিতে প্রস্তুত[১]। এই পূর্ব্বস্বীকৃতির (postulateএর) উপরে আবার রজনী যখন মিত্রদের দখলী বিষয়ের প্রকৃত সত্ত্বাধিকারিণী সাব্যস্ত হইল তখন আত্মাভিমানী শচীন্দ্র বিষয় বা টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করিতে একেবারেই অনিচ্ছুক হইয়া উঠিল। পিতা, মাতা, বিমাতা কাহারও অনুরোধে সে সঙ্কল্প শিথিল হওয়া দূরের কথা দৃঢ়তর হইয়া উঠিল[২]। এই সমস্যার সমাধানের জন্য গ্রন্থকার সন্ন্যাসীকে আবাহন করিয়াছেন সত্য—ভারতীয় পাঠকের হৃদ্য হইবে মনে করিয়া—কিন্তু কোন Deus-ex-machina হিসাবে নহে। সন্ন্যাসী অবশ্য যুক্তির দ্বারা শচীন্দ্রের জ্ঞানগোচর মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, অর্থাৎ যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা কাজে লাগাইয়া সম্মোহনের দ্বারা তাহার অবচেতন মনের উপর আরও অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন দেখা যায়। শচীন্দ্রকে স্বপ্নে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অনুরাগিণী হিসাবে রজনীকে

---

১ ৩।৬।৫৭ পৃঃ। ২ ৩।৫।৫৪ পৃঃ।

দেখাইয়া সন্ন্যাসী 'শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অনুরাগের বীজ সংরোপিত'[১] করেন। 'কিন্তু রজনী অন্ধ এবং ইতর লোকের কন্যা, ইত্যাদি কারণে সে অনুরাগ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই'। 'ক্রমে ঘোরতর দারিদ্র্যদুঃখের আশঙ্কা' 'ভুলিবার জন্য শচীন্দ্র অধ্যয়নে মন দিলেন। সেই বিদ্যালোচনার আধিক্যহেতু চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল'। 'তাহাতে মানসিক রোগের সৃষ্টি হইল'। 'সেই রোগের একগতি এই যে হৃদয়স্থ লুক্কায়িত এবং অপরিচিত ভাব বা প্রবৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠে'। 'গুপ্ত মানসিক ভাব বিকশিত হইয়া বিকারের স্বরূপ প্রতীয়মান হয়'।[২] শচীন্দ্রের ক্ষেত্রে তাহাই যখন ঘটিয়াছে তখন সন্ন্যাসী মানসিক রোগের মানসিক চিকিৎসার (psycho-therapy সম্মত চিকিৎসার) ব্যবস্থা করিলেন এবং রজনীকে আনাইবার উপদেশ দিলেন। কারণ তাঁহার ধারণা নূতন ভাবাবেগে ( emotional shocks এর ফলে ) শচীন্দ্রের 'রজনীর প্রতি অপ্রকৃত[৩] অনুরাগ, রুগ্নাবস্থায় দেখা-সাক্ষাৎ হইলে বদ্ধমূল হইয়া স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে' এবং রজনী শচীন্দ্রকে বিকারের জগৎ হইতে স্বাস্থ্যের জগতে ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে পারিবে।

---

১ ইংরাজী ভাষায় যাহাকে বলিবে 'fixation' অবশ্য external fixation। ইহার পরে যে সকল stagesএর উল্লেখ করা হইয়াছে তৎসমস্তই আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত।

২ ৪।৭।৭৬—৭৮ পৃঃ।

৩ 'অপ্রকৃত' কথাটি বঙ্কিম অপ্রকট অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন মনে হয়।

এই যে উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনী, রজনী লেখার দিনে এবং তাহার পরেও ইহা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অলৌকিক প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের অতিরিক্ত আস্থার পরিচয় হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কিন্তু রজনী লিখিত হইবার অর্দ্ধশতাব্দী পরে Pascal, Davesne, Gordon, Janet প্রভৃতির গবেষণার ফলে ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে 'Persistent inhibition of feeling has pathogenic effects', 'Psychoses are benefited by interjected somatic diseases', 'ranging from amelioration to complete recovery', আর 'Every psychiatrist has observed instances of the effect of emotional situations upon psychotic patients'. 'A visit from a relation may produce a beneficial change in a patient who has failed to respond to treatment.'[১]

বঙ্কিমের দিনে উপন্যাস লিখিতে গিয়া অবচেতন মনের অন্তস্তলে নামিবার বা মনোবিকারের অনালোকিত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার দুঃসাহস বোধ হয় আর কেহই করেন নাই।

১ Devine : 'Recent Advances in Psychiatry' Ch XII Pp. 168—173.

মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের প্রসার ফলে এখন বিজ্ঞানবিৎ একাধিক উপন্যাসলেখক অনায়াসেই সে সকল ক্ষেত্র হইতে উপকরণ আহরণ করিতেছেন।

রজনী ও শচীন্দ্র ব্যতীত উপন্যাসখানির আর দুইটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রও পাঠকসমাজকে আকৃষ্ট করিয়াছে অর্থাৎ অমরনাথ ও লবঙ্গলতা। কিন্তু অমরনাথ সাধারণতঃ যে সহানুভূতি আকর্ষণ করে তাহা অনেকখানি বার বার loved and lost বলিয়া, তাহার ব্যর্থ প্রেমের বেদনা ও নৈরাশ্যের জন্য। নতুবা অমরনাথ উদারস্বভাব হইলেও যে আদর্শ প্রেমের অধিকারী, সুপণ্ডিত হইলেও যে অসাধারণ মনোবলে বলীয়ান্, সমগ্র আখ্যায়িকা বিচার করিলে তাহা মনে করা যায় না। অমরনাথ লবঙ্গলতাকে ভুলে নাই সত্য, কিন্তু সে দেশত্যাগ করিয়াছিল কতটা লাঞ্ছনা মূলে, কতটা বিফল প্রেমের বৈরাগ্যে, তাহা বলা কঠিন। মনোহর দাসের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী যাহাতে রজনী হইতে পারে সে চেষ্টায় বা রজনীর অন্বেষণে সে কাশীত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, কতটা নিঃস্বার্থ পরোপকার-প্রবৃত্তির বশে, কতটা মিত্রদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে, তাহাও অস্পষ্ট।

রজনীকে সে কৃতজ্ঞতাপাশ হইতে মুক্তি দিল কোন বৈরাগ্যবশতঃ নহে, রজনীর 'হৃদয় অপরের নিকট বিক্রীত' শুনিবার ও বুঝিবার পরে। কিন্তু রজনীকে সে যে প্রসন্ন চিত্তে মুক্তি দিতে পারে নাই তাহার দেশান্তর গমনেই তাহা সুস্পষ্ট।

তাহার উদারতা বা আত্মসংযমই বা কতটুকু, হৃদয়কে শাসিত করিবার, 'যিনি সুখদুঃখের অতীত তাঁহার চরণে সকল সমর্পণ' করিবার, সঙ্কল্পের মূল্যই বা কতটুকু যখন দুই বৎসর পরেও রজনীর পুত্রের 'অমরপ্রসাদ' নাম শুনিবামাত্র সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, রজনীর প্রদত্ত আসন গ্রহণ না করিয়াই অতীত স্মৃতির জাগ্রত বেদনায় অন্তর্হিত হইল। অমরনাথের ব্যথার জীবনের প্রতি আমাদের করুণা যতই জাগুক না কেন, আদর্শ নায়কচরিত্রের সম্মান তাহার প্রাপ্য নহে। যাঁহারা অমরনাথ ও প্রতাপ সমপর্য্যায়ের চরিত্র মনে করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে প্রতাপের আদর্শনিষ্ঠা, অন্তর্দৃষ্টি ও মনোবল অমরনাথের নাই।

বরং লবঙ্গলতার চরিত্রবল দেখিয়া, আপনার হৃদয়কে শাসন শুধু নয় চিত্তগঠন করিবার ক্ষমতা দেখিয়া, আমরা বিস্মিত হই। অমরনাথের তরুণ প্রণয়কে উপেক্ষা—এমন কি লাঞ্ছিত—করিয়া সে উনিশ বৎসরে তেষট্টি বৎসর বয়সের বৃদ্ধ 'পিতামহের তুল্য স্বামীকে' এমন ভালবাসিতে পারিয়াছিল যে 'কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসেন কি না সন্দেহ। ভালবাসিতেন বলিয়া তাহাকে নবীন সাজাইতেন।' 'আপন হস্তে শুভ্র কেশে কলপ মাখাইয়া' মলমলের ধুতির পরিবর্ত্তে 'কোকিলপেড়ে, ফিতেপেড়ে, কল্কাপেড়ে পরাইয়া,' 'নিদ্রিতাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে আতর মাখাইয়া' রাশি 'রাশি ফুল কিনিয়া রামসদয়কে ভূষিত' করিয়া তাহার বার্দ্ধক্যের প্রতিবাদ

এবং নিজে আনন্দ উপভোগ করিত।[১] ইহাকে ভাবের দৈন্য অভিনয়ে চাপা দিবার প্রচেষ্টা বা 'inferiority compensation' বলিবার উপায়ও গ্রন্থকার রাখেন নাই। পরবর্ত্তী বর্ণনা—

"সেই প্রাচীনে নবীনে মনের মিল ছিল দর্পণের মত দুইজনে দুইজনের মন দেখিতে পাইত···

রামসদয় বলিত; 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশী' ?

লবঙ্গ। আজ্ঞে ঠাকুরদাদা মহাশয়, দাসী হাজির।

রাম। আমি যদি মরি।

লব। "আমি তোমার বিষয় খাইব।" মনে মনে বলিত "আমি বিষ খাইব।" রামসদয় তাহা মনে মনে জানিত।"[২]

শুধু কি তাই ? সে ছিল সমস্ত সংসারের কর্ত্রী—স্বামীর আদরে মাত্র নয়, নিজের গুণে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উদার সহানুভূতি প্রভাবে; সংসারের লক্ষ্মী—পতিগৃহের কল্যাণ কামনায়, দুঃস্থ দরিদ্রের প্রতি দয়ায়। সপত্নীপুত্রদের নিজের সন্তানের মত ভালবাসিত, ভালবাসিয়া নিজের ছেলের অধিক বশীভূত করিয়া লইয়াছিল। শচীন্দ্রের প্রতি তাহার গভীর স্নেহের পরিচয়, শচীন্দ্রের অসুস্থতার দিনে অমরনাথের উক্তিতে আমরা এইরূপ পাই—

---

১ এইরূপ করিত ও করিবার সুযোগ পাইয়াছিল বলিয়া সে শৈবলিনীর মত অসুস্থচিত্ত বা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ( morbid ) হয় নাই।

২ ১।২।৮ পৃঃ।

"আমি তখনই মিত্রদের গৃহে গেলাম। * * * দেখিলাম, লবঙ্গলতা ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া শচীন্দ্রের জন্য কাঁদিতেছে। যাইবামাত্র লবঙ্গলতা আমার পা জড়াইয়া আরও কাঁদিতে লাগিল—বলিল ক্ষমা কর! অমরনাথ ক্ষমা কর! তোমার উপর আমি এত অত্যাচার করিয়াছিলাম বলিয়া বিধাতা আমাকে দণ্ডিত করিতেছেন। আমার গর্ভস্থ পুত্রের অধিক প্রিয় পুত্র শচীন্দ্র বুঝি আমারই দোষে প্রাণ হারায়! আমি বিষ খাইয়া মরিব।"[১]

লবঙ্গ পায়ে ধরিতেছে! যে লবঙ্গ অমরনাথকে চিরদণ্ডিত করিয়াছে, আত্ম-বুদ্ধির শ্লাঘায় পুরুষকে পুতুলের অধিক বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না, আত্মমর্য্যাদাবোধের প্রাচুর্য্যে 'রাজেন্দ্রাণী'র মত চলিতে চায়, সেই লবঙ্গ আজ শচীন্দ্রের কল্যাণ-কামনায় অমরনাথের পদানত। ইহাই তাহার আত্ম-শিক্ষালব্ধ বাৎসল্যের পরিমাপ। প্রত্যুত প্রাচীন স্বামীর প্রতি লবঙ্গের আপ্রাণ ভালবাসা, স্বামীর সংসারের কল্যাণচিন্তায়, ও স্বামীর সন্তানের প্রতি সুগভীর স্নেহে, প্রতিফলিত হইয়াছিল। বহু বিবাহ প্রথা হেয় ও নিন্দনীয় হইলেও এমন ছোটমা গতশতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে বিরল ছিল না। অতএব গ্রন্থকারকে নিতান্ত কষ্টকল্পনা করিতে হয় নাই।

কিন্তু বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি লবঙ্গলতার যে প্রেম তাহা যে লবঙ্গলতার অপূর্ব্ব চিত্তসংযমে অর্জ্জিত বস্তু, ঐকান্তিক প্রযত্নে আয়ত্ত সিদ্ধি, তাহা আখ্যায়িকার প্রায় শেষ ভাগে তুলিকার

১ ৫ম খণ্ড ৮১ পরিচ্ছেদ।

একটি রেখাপাতের মত সামান্য বাক্যাংশে প্রতীত হয়। লবঙ্গলতা যে দেবী নয় মানবী, অথচ মানবী হইলেও কত বড় শক্তিমতী নারী, তাহা অমরনাথের সহিত তাহার শেষ কথা-প্রসঙ্গে বুঝিতে পারি।

"লব। তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছ কেন? তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ?

অম। যাইব।

ল। কেন?

অ। যাইব না কেন? আমাকে যাইতে বারণ করিবার ত কেহ নাই।

ল। যদি আমি বারণ করি?

অ। আমি তোমার কে যে বারণ করিবে?

ল। তুমি আমার কে? তা' ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

লবঙ্গলতা আর কিছু বলিল না। আমি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, 'যদি লোকান্তর থাকে তবে?'

লবঙ্গলতা বলিল, "আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্ব্বলা। আমার কত বল, দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।'

আমি বড় বিচলিত হইলাম, বলিলাম, 'আমি সে কথায় বিশ্বাস করি। কিন্তু একটি কথা আমি কখন বুঝিতে পারিলাম না তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে আমার গায়ে চিরদিনের জন্য এ কলঙ্ক লিখিয়া দিলে কেন?

লবঙ্গ অধোবদনে রহিল। ক্ষণেক ভাবিল। বলিল, তুমি কুকাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকাবুদ্ধিতে কুকাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড, বিধাতা তাহার বিচার করিবেন—আমি বিচারের কে? এখন সে অনুতাপ আমার—কিন্তু সে সকল কথা না বলাই ভাল। তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে?"

অ। তুমি না বলিতেই আমি ক্ষমা করিয়াছি। ক্ষমাই বা কি? উচিত দণ্ড করিয়াছিলে—তোমার অপরাধ নাই। আমি আর আসিব না—আর কখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু যদি তুমি কখন ইহার পরে শোন যে, অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু—অনুমাত্র—স্নেহ করিবে?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।

অ। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই?

ল। না—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহ কখনও হইবে না।

আবার 'ইহলোক' থাক—আমি লবঙ্গের কথা বুঝিলাম কি না বলিতে পারি না; কিন্তু লবঙ্গ আমার কথা বুঝিল না। কিন্তু দেখিলাম লবঙ্গ ঈষৎ কাঁদিতেছে।"*

অমরনাথ সুশিক্ষিত হইলেও ভাবপ্রবণ, কিন্তু অন্তর্দ্দর্শী

* ৫ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ ৮৪-৮৫ পৃঃ।

নহে বলিয়াই সংগঠিত-চরিত্রলাভ করিতে পারে নাই—শেষ পর্য্যন্ত ভাববিহ্বলই রহিয়া গিয়াছে। এখনও ভাবাবেগে সে তাহার নিজের মন বুঝিতে অক্ষম। লবঙ্গ তাহার পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যদি সত্যই সে ইহা বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে 'কলঙ্ক লেখার' জন্য প্রশ্ন তুলিত না, প্রশ্ন তুলিয়া 'উচিত দণ্ড করিয়াছিলে' বলিয়া আবার স্নেহের দাবী করিত না। সে লবঙ্গের কথা বাস্তবিক বুঝে নাই। নিজে অসংগঠিত (unintegrated) চরিত্র, কাজেই সংগঠিত চরিত্র লবঙ্গলতার উক্তির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া সে আপনাকে লবঙ্গলতার মধ্যে কিছু না কিছু প্রতিফলিত দেখিতে চায়। লবঙ্গলতা যে এখন সমতলক্ষেত্রের পঙ্কিল জলধারা মাত্র নহে, সে যে পাষাণে বুক বাঁধিয়া এমন বৈদ্যুতিক শক্তির প্রবাহ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে যাহাতে সে তাহার সংসার-ক্ষেত্রের সমস্ত আনন্দের আশ্রয় ও আলোকের উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অমরনাথ তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে অক্ষম। অথচ অমরনাথের এক পূর্ব্ব কথাতেই আমরা তাহার পরিচয় পাই—

"আমি অবাক হইয়া, নিস্পন্দশরীরে, সশঙ্কচিত্তে, এই বিচিত্রচরিত্রা রমণীর মানসিক শক্তির আলোচনা করিতেছিলাম। ললিত লবঙ্গলতা কিছুতেই টলে না। লবঙ্গলতা মহান ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পড়িয়াছে—তবু সেই সুখময় হাসি; যে রজনী হইতে এই ঘোর বিপদ ঘটিয়াছে, তাহারই গৃহে উঠিতেছে,—তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে

তবু সেই সুখময় হাসি। আমি সম্মুখে—তবু সেই সুখময় হাসি। অথচ আমি জানি লবঙ্গ কোন কথা ভুলে নাই।

আমি সরিয়া পার্শ্বের ঘরে গেলাম। লবঙ্গলতা প্রথমে সেই ঘরে প্রবেশ করিল—নিঃশঙ্কচিত্তে আজ্ঞাদায়িনী রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় রজনীকে বলিল, 'রজনি—তুই এখন আর কোথাও যা! তোর বরের সঙ্গে আমার গোপনে কিছু কথা আছে। ভয় নাই! তোর বর সুন্দর হ'লেও আমার বৃদ্ধ স্বামীর অপেক্ষা সুন্দর নহে।'[১]

অমরনাথ পূর্ব্বেও বলিয়াছিল 'আমি লবঙ্গলতার মর্ম্ম কখন বুঝিতে পারিলাম না', গ্রন্থশেষেও তাহার সে আক্ষেপের অন্ত নাই—'আমি লবঙ্গের কথা বুঝিলাম কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু লবঙ্গ আমার কথা বুঝিল না।'

কিন্তু এখানেই প্রশ্ন উঠিবে: মানিলাম অমরনাথ অগঠিত চরিত্র, কিন্তু তাই বলিয়া লবঙ্গের চরিত্র সংগঠিত বলা কি বাড়ানো কথা নহে? লবঙ্গলতাকে সংগঠিত-চরিত্র আমরা কি অর্থে বলিতে চাহি তাহা বিশদভাবে বলিতে গেলে বলিব সংগঠিত শব্দটি আমরা লবঙ্গচরিত্রের অন্তরের বৃত্তিসামঞ্জস্য ও বাহিরের বিরুদ্ধ অবস্থা অতিক্রম করিয়া জীবনের সার্থকতা-সম্পাদন ক্ষমতা উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করিয়াছি। লবঙ্গ যেমন প্রখরবুদ্ধিশালিনী ও প্রীতিস্নেহসম্পন্না, তেমনই তাহার জাগ্রত ধর্ম্মবোধ। তাহার চিত্তের কোন বৃত্তিই অপুষ্ট নহে বা অপরাপর বৃত্তিকে অভিভূত করে নাই। সর্ব্বোপরি

১ ৪।২।৬৫ পৃঃ।

তাহার অন্তর্দৃষ্টি আছে। সে তাহার নিজের মন—তাহার শক্তি কতদূর, দুর্ব্বলতা কোথায়—বুঝে এবং বুঝে বলিয়াই তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সংসারের কল্যাণে, তাহার মাধুর্য্য বৃদ্ধ পতির সেবায়, তাহার বাৎসল্য সপত্নীপুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়, তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি নিয়ত চিত্তজয়ে ব্যাপৃত। অমরনাথের প্রতি তাহার কৈশোরের আকর্ষণ কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে, 'যদি লোকান্তর থাকে' বলিয়া অন্তরের অধস্তন অন্ধকূপ হইতে বাহির হইতে চাহিয়া থাকে সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া সেখানে ফেরত পাঠাইতে সক্ষম। অমরনাথ তাহার সুযোগ লইতে চাহিলে সে পরিষ্কারভাবে জানাইতে চাহে জ্ঞাতসারে তাহাকে প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর প্রাপ্য কোন স্নেহ দূরের কথা কোনপ্রকার স্নেহদানে সে প্রস্তুত নহে যতদিন তাহার বর্ত্তমান দেহমন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বিলাতী Nettie হালে প্রশ্ন তুলিয়াছে "Is there one love ? only one love ?"* বাঙ্গালী লবঙ্গলতা বহুপূর্ব্বে তাহার জবাব দিয়াছে: যদি সাধারণ জীব নহে পরন্তু মানুষ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় তাহা হইলে তাহাই বটে। অতএব চিত্তজয়ের সাধনায় ও সিদ্ধিলাভে যদি মনুষ্যত্ব থাকে তবে তাহার গৌরব লবঙ্গের অবশ্যই প্রাপ্য। আধুনিক সাহিত্যে লবঙ্গের মত অনেক নারীচরিত্রই চিত্রিত হইয়াছে, তবে আধুনিক লবঙ্গলতাদের সহিত বঙ্কিমের

* H. G. Wells : 'In the Days of the Comet,' Bk. III, Ch. 4, P. 258.

লবঙ্গলতার পার্থক্য এই যে বঙ্কিমের লবঙ্গলতা ধর্ম্ম মানে, পবিত্রতার মূল্য বোঝে এবং ভাবের ঘরে চুরি করিতে বা করিতে দিতে অপ্রস্তুত।

কিন্তু নৈতিক সত্বার মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ ও তজ্জনিত দুঃখ নিহিত থাকে লবঙ্গ যে তাহার কাব্যজীবনে তাহা ভোগ করে নাই ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বঙ্কিমও তাহা অস্বীকার করেন নাই; বরং লবঙ্গের নিজের মুখ দিয়াই তাহা প্রকাশ করাইয়াছেন। রজনীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে লবঙ্গই একদিন স্বগতোক্তি করিয়াছিল 'কাণি! তুই ভালবাসার কি জানিস? তুমি লবঙ্গলতার অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী'[১]। কিন্তু মনুষ্যত্বের অনুরোধে, পবিত্রতার অনুরোধে, আত্মজয়প্রচেষ্টায় এই যে দুঃখ ও দুর্গমপথ বরণ নৈতিক ব্যক্তিত্বের ( Ethical personality-র ) ইহাই না বিশিষ্ট গৌরব? "A hundred traces of the ape"[২] থাকা সত্বেও ইহাই না মানুষকে পশু-জগতের ঊর্দ্ধে সংস্থাপিত করিয়াছে?

রজনীর অব্যবহিত পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর লিখিত হয়। ইহা যদি আমরা স্মরণ করি তাহা হইলে আমাদের স্বতঃই ইহা মনে হইবে যে বঙ্কিম চন্দ্রশেখরে পুরুষ প্রতাপের চরিত্রে নৈতিক

---

১ ৪।৩।৬৯ পৃঃ।

২H. G. Wells: 'In the Days of the Comet,' Bk. III. Ch. 4, p. 260.

ব্যক্তিত্বের যেরূপ গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন রজনীতে লবঙ্গলতার চিত্র আঁকিয়া নারীপক্ষে তেমনই জয়শ্রী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন শৈবলিনী ও লবঙ্গের চরিত্রের উপক্রমের প্রশ্ন প্রায় একই প্রকার হইলেও অন্তরের বিভিন্ন গঠনে, সংযমশক্তি ও চরিত্র-বলের অভাব এবং সদ্ভাবে, তাহাদের জীবনের ধারা কত না বিভিন্ন উত্তরই দিয়াছে, ফলে উপসংহার কতই না বিভিন্ন. হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শৈবলিনী যেখানে ব্যর্থতার দৈন্যে ও বিকারের গ্লানিতে পরিম্লান, লবঙ্গ সেখানে বিজয়িনীর সাফল্য-গৌরবে মণ্ডিত।

কিন্তু মানুষ যেখানে শুভ সংস্কার বশেই হোক, আর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াই হোক, নৈতিক ব্যক্তিত্বের এই দ্বন্দ্ব মুক্ত থাকে বা মুক্ত হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে পারে সেখানে যে তাহার রসময় সত্ত্বা অনাহত থাকে—'তত্র ন বিজিগুপ্‌সতে'— অথবা শতদুঃখের মধ্য দিয়া আনন্দে উত্তীর্ণ হয় ইহা দেখাইবার জন্য রজনীর অব্যবহিত পরবর্ত্তী বা শেষ অধ্যায়ের অবতারণা। শচীন্দ্রের 'বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ' উপলক্ষ করিয়া যে প্রেমের সুর রজনীর হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া তাহাকে তন্ময় করিয়াছিল তাহার একতানতায় চোখের বার্ত্তা বা অন্তরের বৃত্তি কোন বিবাদিসুর সংযোগ করিতে পারে নাই। অমরনাথের প্রভূত উপকার বিবেকবুদ্ধির মারফতে রজনীর অন্তরে যে দাবী উপস্থিত করিয়াছিল তাহাতে সে ক্রীতদাসী হইতে প্রস্তুত

থাকিলেও তাহার শচীন্দ্র-প্রীতি অম্লানই ছিল। প্রীতির ক্ষেত্রে অমরনাথ কোন ভাবের দ্বৈধ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তাই আমরা দেখিয়াছি অমরনাথ ও শচীন্দ্র উভয়ের মধ্যে অমরনাথ পাইয়াছে কৃতজ্ঞতা, কিন্তু শচীন্দ্র জাগাইয়াছে কান্না ( ৪।৩, ৫।১ )। অমরনাথের দাবীত্যাগেই স্নে অশ্রুধারা শুকাইল—আর অনতিবিলম্বে 'শুভদৃষ্টির দিনে' সন্ন্যাসীর কৃপায় যুগলনয়নে লুপ্তদৃষ্টিশক্তিও জাগিয়া উঠিল। ইহা হয়ত সম্ভাব্যসীমা ছাড়াইয়া গেল, কিন্তু ইহার ব্যঞ্জনা দুর্ব্বোধ্য নহে। রজনী একদিন বড়দুঃখে বলিয়াছিল, 'আমার বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে থাকুক মা! অন্তরের চক্ষু ফুটাইয়া দে'। গ্রন্থশেষে অন্ধ ফুলওয়ালীর দুঃখময় জীবনের 'সকল কাঁটা ধন্য হইয়া ফুল ফুটিবার' দিনে মহাকবি তাহার বাহ্যদৃষ্টি ফুটাইয়া একদিকে যেন বলিতে চাহিয়াছেন যাহার অন্তরের দৃষ্টি চিরদিন অম্লানই ছিল তাহার একাগ্র তপস্যায় বাহিরের দৃষ্টিও উন্মীলিত না হইয়া পারে না, অন্যদিকে রজনীর পাঠকদিগকে যেন প্রশ্ন করিয়াছেন, 'চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে কি ?'

———

# রাধারাণী

# রাধারাণী

( ১৮৭৫ * )

যুগলাঙ্গুরীয়ের স্থায় রাধারাণীর আলোচনায় প্রথম প্রশ্ন হইতেছে, এই ছোট গল্পটি কোন সময়ের রচনা? বঙ্কিম-জীবনী লেখক বলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮২ সালের রথযাত্রার সময় ছুটি লইয়া গৃহে বসিয়াছিলেন"। গৃহবিগ্রহ রাধাবল্লভ জিউর রথযাত্রার "ভিড়ে একটি ছোট মেয়ে হারাইয়া যায়। তাহার আত্মীয়-স্বজনের অনুসন্ধানার্থ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার দুই মাস পরে রাধারাণী রচিত হয়।" রাধারাণী প্রকাশিত হয় কিন্তু ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শনের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। ঐ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রজনী পূর্ব্ব বৎসরের অর্থাৎ ১২৮১ সালের আশ্বিন হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়া সমাপ্তিতে পৌঁছিয়াছিল। তাহার পরে পৌষ সংখ্যা হইতে কৃষ্ণকান্তের উইল প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। অতএব রাধারাণী রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইলের মধ্যবর্ত্তী রচনা, রজনীর পূর্ব্বগামী মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

---

* শচীশ বাবু লিখিয়াছেন ১৮৭৫ সালে রাধারাণীর প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার তারিখ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। ১৮৭৫ সালের নভেম্বর মাসে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়া ঐ সালেই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়া কি সম্ভব?

রাধারাণী আর এক হিসাবে রজনীর জের। রজনীতে একটি সমস্যার কথা উঠিয়াছিল নারীহৃদয়ের উপর কাহার দাবী বেশী—পূর্ব্বানুভূত অনুরাগের না নবানুভূত কৃতজ্ঞতার? রজনী চোখের জলে লুটাইয়া কৃতজ্ঞতাকে হৃদয় হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল যদিও বিশুষ্ক চক্ষেও আগন্তুক অশ্রুর অতর্কিত আবির্ভাব রুদ্ধ করিতে পারে নাই। রাধারাণী সত্যই বলিয়াছে "জীবনসমুদ্র অমন করিয়া মন্থন করিতে গেলে কাহারও কপালে উঠে অমৃত কাহারও কপালে গরল উঠে।" হিরণ্ময়ীর ভাগ্যে উঠিয়াছিল অমৃত, শৈবলিনীর গরল, আর লবঙ্গ গরল জীর্ণ করিয়াছিল।

রাধারাণীর ভাগ্যে কিন্তু গরল উঠিবার অবকাশ ঘটে নাই। বড় দুঃখের দিনে বালিকা রাধারাণী দয়ার মধ্য দিয়া তাহার ভাবী প্রেমদেবতার অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ পাইয়াছিল। তাহার কি অপরূপ বর্ণনায়ই না ক্ষুদ্র কথার আরম্ভ! মাতৃবৎসল বালিকা দুঃস্থ মাতার পথ্য সংগ্রহের জন্য বনফুলের মালা গাঁথিয়া বিক্রয় করিয়া দুই এক পয়সা পাইবার আশায় মাহেশের রথের বাজারে গেল ;

"কিন্তু রথের টান অর্দ্ধেক হইতে না হইতেই বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোকসকল ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে, আমি না হয় একটু ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক

আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।”

“অন্ধকার—পথ কর্দ্দমময়, পিচ্ছিল—কিছুই দেখা যায় না। তাহাতে মুষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল—মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাণীর চক্ষু বারিবর্ষণ করিতেছিল। * * * দুই গণ্ডবিলম্বী ঘনকৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টিজল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বকুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।”[১]

বাঙ্গলার মেয়ের মাতৃবৎসলতা ঘরে ঘরে উচ্ছ্বসিত। কিন্তু এমন মেয়ের ছবি আমাদের সাহিত্যে খুব বেশী পাওয়া কঠিন।

রাধারাণীর মাতৃবৎসলতা এইখানেই শেষ হয় নাই। আগন্তুক সঙ্গী যখন দয়া করিয়া মালাটি কিনিতে চাহিল তখন

“রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্তু মনে ভাবিল যে, আমাকে যে এত যত্ন করিয়া হাত ধরিয়া লইয়া এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে তাহার কাছে দাম লইব কি প্রকারে? তা নহিলে, আমার মা খেতে পাবে না। তা নিই।”[২]

‘বড় ঘরের মেয়ে’ দুর্দ্দশার মধ্যেও কৃতজ্ঞতার ও যথা-যোগ্যতার ধারণা হারায় নাই। তাহাও কিন্তু ত্যাগ করিল মায়ের পথ্যের চিন্তায়।

কিন্তু অভাবে যে স্বভাব সত্যই নষ্ট হয় নাই, তাহারা যে

১ ১১৫-৬ পৃঃ। ২ ১১৭ পৃঃ।

'দরিদ্র হইয়াও লোভী নহে' তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় অবিলম্বে পাই।

মালা-ক্রেতা চারি পয়সা দাম দুইটি ডবল পয়সায় দেওয়ার ছলে টাকা দিলে বালিকা বলিল ঃ

" 'তা এ যে অন্ধকারে চক্ চক্ ক'রছে। তুমি ভুলে টাকা দাও নাই ত?'

'না। নূতন কলের পয়সা তাই চক্‌চক্ ক'রছে।'

'রাধা। তা, আচ্ছা ঘরে গিয়ে প্রদীপ জ্বেলে যদি দেখি যে, পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে'।"[১]

স্বল্প কথায় বালিকার লোভমুক্ত সরল অন্তরের কি মধুর পরিচয়!

দাতা রাধারাণীকে বাড়ী পৌঁছিয়া দিয়া নেপথ্যে তাহার কাপড়েরও ব্যবস্থা করিয়া এবং অলক্ষ্যে একখানি নোট ফেলিয়া চলিয়া গেল। রাধারাণী নোট কুড়াইয়া পাইয়া মাকে দেখাইল। মা বলিলেন, 'একখানি নোট' 'তোমায় দিয়া গিয়াছেন'। রাধারাণী বলিল, 'হাঁ, মা, এমন লোক কে মা?' পরদিন মাতায়-কন্যায় নোটদাতা রুক্মিণীকুমার রায়কে অনেক খুঁজিল, পাইল না। রাধারাণী নোট তুলিয়া রাখিল, বুঝি বা নোটের সহিত তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানিও তুলিয়া রাখিল।

তার পরে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে ক্রমশঃ ভালবাসার রঙ

---

১ ১।৭ পৃঃ।

ধরিতে লাগিল বালিকা যেমন ধীরে ধীরে কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবনে অগ্রসর হইতে লাগিল। কখন যে উষার শিশির-সিক্ত মুক্তাশুভ্র আকাশ আসন্ন অরুণোদয়ে রাঙা হইতে আরম্ভ করিল তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন, তবে অরুণিমা যে একদিন প্রভাত আলোয় ফুটিয়া উঠিয়া সারা আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহার কোমলস্পর্শে বাহিরের দুঃখ-দৈন্য প্রশমিত হইতেছে তাহা ত স্পষ্টই দেখিতে পাই। রুক্মিণীকুমারের স্মৃতিপূজার মন্দির রাধারাণীর নূতন অট্টালিকার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া যেমন পূজার আনন্দ দিতেছে তেমনই আবার আরাধ্যের অভাবও জানাইয়া দিতেছে।

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার 'ক্ষুদ্র উপন্যাসের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া কলেবর বাড়াইতে হইয়াছে' বলিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনের রাধারাণীর ছোট গল্প হিসাবে কি কি ত্রুটি ছিল যাহা সংশোধনের জন্য নূতন পরিচ্ছেদ সংযোগ করিতে এবং বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত শেষ পরিচ্ছেদটিকে রূপান্তরিত করিয়া সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদ বিস্তৃত আকারে লিখিতে হইয়াছে গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ না করিলেও চতুর্থ সংস্করণের পরিবর্ত্তনগুলি লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝা যায়। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত গল্পে পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষেই রাধারাণী রুক্মিণী-কুমারের প্রদত্ত নোট প্রত্যর্পণ করিয়া শুধু আত্মপরিচয় দেয় নাই, 'তুমিই আমার দেবতা' বলিয়া আত্মসমর্পণও করিয়াছে। তখনও কিন্তু সে রুক্মিণীকুমারের সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নাই

(বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত গল্পের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদেই সে পরিচয় আছে)। ইহার অসঙ্গতি ও আকস্মিকতা উপলব্ধি করিয়াই বঙ্কিম গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদের অন্তে ঐ আত্মপ্রকাশ ও আত্মনিবেদনের কাহিনীটুকু রূপান্তরিত ও বিস্তারিত করিয়া রাধারাণীর পক্ষে এমন অভিমান ও ঐকান্তিকতা প্রকাশের সুযোগ করিয়া লইয়াছেন যে রাধারাণী-চরিত্রের সুকোমল মাধুর্য্য ও অবিচল নিষ্ঠা আরও প্রস্ফুট ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

"রাধা। তাই বলিতেছিলাম, আপনাকে দয়ার্দ্রচিত্ত বলিয়া বোধ হয় না। যে রাধারাণী আপনার শ্রীচরণ দর্শন জন্য—এইটুকু বলিতেই * * * ফুলের কুঁড়ির ভিতর যেমন বৃষ্টির জল ভরা থাকে, ফুলটি নীচু করিলেই ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া যায়, রাধারাণী মুখ নত করিয়া এইটুকু বলিতেই তাহার চোখের জল ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। অমনই যে দিকে রুক্মিণীকুমার ছিলেন, সেই দিকের মাথার কাপড়টা বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।"[১]

যে দয়ার স্মৃতি বহন করিয়া রাধারাণী এগারো হইতে উনিশ বৎসরে পৌঁছিয়াছে আজ সে দয়ার মালিককে সম্মুখে পাইয়া রাধারাণীর দীর্ঘ আট বৎসরের স্মৃতি উদ্বেলিত। রাধারাণী বলিতে চাহে, যে লোক দয়ার বিনিময়ে একটি বালিকার হৃদয় কিনিয়া লইয়া গেল সে কেমন দয়ালু যে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সেই কেনা মানুষটার কোন খবরই রাখিল না, বা কত দুঃখ-

১ ৬।২১ পৃঃ।

সুখের মধ্যে সেই স্মৃতি যে নিত্যপূজায় অক্ষয় করিয়া রাখিতে হইয়াছে তার কোন সংবাদই লইল না! এমন লোককে এতদিন পরে সম্মুখে পাইয়া রাধারাণী একটু অশ্রুময় অনুযোগ না করিয়া পারে কেমন করিয়া? তাহার মিতার এমনই অভিমান-অনুযোগেই ত বাঙ্গলার কীর্ত্তন ভরপুর।

যাহা হোক অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের দিনে অভিমানের এই কান্নাটুকু কাঁদিয়াই রাধারাণী নিষ্কৃতি পায় নাই। বস্তু-তন্ত্রতার অনুরোধে অর্থাৎ পাছে কেহ বলে রাধারাণী এ দেশীয় সমাজের মেয়ের চিত্র নহে, তাই নবোদ্ভাবিত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বঙ্কিম তাহাকে আরও একটু কাঁদাইয়া ছাড়িয়াছেন।

"বাহিরে আসিয়া মুখে চক্ষে জল দিয়া অশ্রুচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া রাধারাণী ভাবিতে লাগিল। ভাবিল 'ইনিই' ত রুক্মিণীকুমার। আমিও সেই রাধারাণী। দুই জনে দুই জনের জন্য মন তুলিয়া রাখিয়াছি। এখন উপায়? আমি যে রাধারাণী তা উঁহাকে বিশ্বাস করাইতে পারি—তার পর? উনি কি জাতি তা কে জানে। জাতিটা এখনই জানিতে পারা যায়; কিন্তু উনি যদি আমার জাতি না হন, তবে ধর্ম্মবন্ধন ঘটিবে না। তবে আর উহার সঙ্গে কথায় কাজ কি? না হয় এ জন্মটা রুক্মিণীকুমার নাম জপ করিয়াই কাটাইব। এতদিন সেই জপ করিয়া কাটাইয়াছি, জোয়ারের প্রথম বেগটা কাটিয়া গিয়াছে—বাকীকাল কাটিবে না কি?

"এই ভাবিতে ভাবিতে রাধারাণীর আবার নাকের পাটা ফাঁপিয়া উঠিল, ঠোঁট দুখানা ফুলিয়া উঠিল—আবার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আবার সে জল দিয়া মুখচোখ ধুইয়া টোয়ালিয়া দিয়া মুছিয়া

ঠিক হইয়া আসিল। রাধারাণী আবার ভাবিতে লাগিল—'আচ্ছা! যদি আমার জাতিই হয় তা হ'লেই বা ভরসা কি। উনি ত দেখিতেছি বয়ঃপ্রাপ্ত—কুমার, এমন সম্ভাবনা কি? তা হলেনই বা বিবাহিত? না। না। তা হইবে না। নাম জপ করিয়া মরি, সে অনেক ভাল—সতীন সহিতে পারিব না।"

সে কালের বুঝমত বাধা, একালের বুঝমত বাধা—সামাজিক বাধা বা আত্মসম্ভ্রমের বাধা—মিলনের সকল বাধাই রাধারাণী অঙ্গীকার করিয়াও তাহার ভালবাসাকে জয়ী করিতে চায় আমৃত্যু "নাম জপ করিয়া"। রুক্মিণীকুমার নামজপের মধ্যে সে এমন অমৃতের সন্ধান পাইয়াছে—যাহার তুলনায় একটা জীবনের পরিমিতকাল অতি ক্ষুদ্র, একটা মিলনহীন জীবনের দুঃখ, সহনীয় শুধু নহে, বরণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্রোহিতায় বা প্রতিযোগিতায় অনভ্যস্ত দুর্ব্বলতার মধ্যে একি মাধুর্য্যঘন অন্তরের দৃঢ়নিষ্ঠা! এমন চিরপ্রদীপ্ত প্রেমপরায়ণা রাধারাণী পশ্চিমের মেয়েকে 'মোমবাতির মেয়ে' বলিবে না? যাহা হোক এই দৃঢ়নিশ্চয়ের মধ্যে রাধারাণী যেন তাহার সকল সংশয়জনিত দুঃখের অবসান দেখিতে পাইল। আপনাকে প্রবোধ দিয়া নামলেখা সযত্নে রাখা নোটখানি আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে ভাবিতে লাগিল :—

"আচ্ছা যদি মনের বাসনা পূরিবার মতনই হয়? তবে শেষ কথাটা কে বলিবে? এই ভাবিয়া রাধারাণী আপনাআপনি হাসিয়া কুটপাট হইল। আ, ছি-ছি-ছি তাও আমি পারিব না।"

আবার ভাবিল, এতদিন যে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সে অতি পবিত্র ভাবেই কাটাইয়াছে—কাজেই মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া তখনই বলিয়া উঠিল ঃ

"তবে হে ভগবান্! বলিয়া দাও কি করিব। লজ্জাও তুমি গড়িয়াছ—যে আগুনে আমি পুড়িতেছি তাহাও তুমি গড়িয়াছ। এ আগুনে সে লজ্জা কি পুড়িবে না? তুমি এই সহায়হীন, অনাথাকে দয়া করিয়া পবিত্রতার আবরণে আমাকে আবৃত করিয়া লজ্জার আবরণ কাড়িয়া লও। তোমার কৃপায় যেন আমি এক দণ্ডের জন্য মুখরা হই।"[১]

রাধারাণীর চরিত্রচিত্রণ এইখানে একরকম শেষ করিয়া বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত গল্পের শেষ অধ্যায় গ্রন্থের সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। এই প্রসারণকার্য্য যে নিখুঁত হইয়াছে—এমন কথা অবশ্য বলি না; তবে সুতহিবুক যোগে কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধের পালা যে সুসম্পূর্ণ হইয়াছে তাহাতে আমরা পাঠক-সমাজ আনন্দিত। বসন্ত যে বিস্মৃত না হইয়া হীরার হারে ঘটকীবিদায় পাইল ইহাও সুখের বিষয় বটে। তবে সমাপ্তির এত হারবদলের মধ্যেও কিন্তু পাঠকের স্মরণে জাগে মাতৃবৎসল বালিকার সেই 'দু'পয়সার ফুলের মালা' যাহা বিকাইবার দিন হইতেই সে তাহার নির্ম্মল-মৃদুবাসস্নিগ্ধ ক্ষুদ্র হৃদয়খানি দুর্দ্দিনের ক্রেতার জন্য চিরদিনের মত তুলিয়া রাখিয়াছিল।

---

১ ৬।২২-২৩ পৃঃ।

# কৃষ্ণকান্তের উইল

# কৃষ্ণকান্তের উইল

( ১৮৭৮* )

কৃষ্ণকান্তের উইল সে কালের খুব জনপ্রিয় উপন্যাস না হইলেও[১] একালের একখানি সমধিক সমালোচিত উপন্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা বঙ্কিমের আর কোন উপন্যাস পাইয়াছে কি না সন্দেহ। কেহ কেহ এমনও বলেন "এমন অপরূপ শিল্পচাতুর্য্য, এমন সংযত ভাবপ্রকাশ, বৈজ্ঞানিক ঘটনাবিন্যাস এবং সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবোধ বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্য কোন উপন্যাসে দৃষ্ট হয় না। মনে হয় বঙ্কিমের লিপিচাতুর্য্য কৃষ্ণকান্তের উইলে চরমে পৌঁছিয়াছে।"[২] পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলিতে চাহেন ইহা সেকালের নীতিবাদের ভিত্তির উপরে রচিত আখ্যান, একালের লেখক বা পাঠকবর্গের হৃদ্য নহে।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র লিপিচাতুর্য্যে বিস্ময় মানিবার অবশ্য অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ, উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু অভাবনীয় বা অত্যাশ্চর্য্য বা নিতান্ত বিরল কিছু নহে।

---

* ১২৮২ ও ১২৮৪ সালের বঙ্গদর্শনে কৃষ্ণকান্তের উইল প্রথম প্রকাশিত হয়।

১ ইংরাজী ১৮৭৮ সাল হইতে ১৮৯২ সাল মধ্যে "কৃষ্ণকান্তের উইলের" মাত্র "চারিটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়"। ( শচীশচন্দ্র : বঙ্কিমজীবনী ২৬৯ পৃঃ )।

২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত বঙ্কিম-শতবার্ষিকী সংস্করণের ভূমিকা।

কেমন করিয়া প্রেমসুখশান্তিভরা এক ধনীর সংসার কামানলে দগ্ধ হইয়া প্রেতভূমি শ্মশানে পরিণত হইল গ্রন্থখানি তাহারই যেন একটি পরিচিত কাহিনী। অথচ যে কাহিনীর তুলনা মিলে, অন্ততঃ একদিন মিলিত, তাহা এমন অভিনব মাধুর্য্যমণ্ডিত হইল কেমন করিয়া? দ্বিতীয়তঃ, কোন আদর্শ চরিত্র আশ্রয় করিয়া এই কাহিনী অগ্রসর হইতেছে না (অন্য চরিত্র দূরের কথা, অভিমানিনী ভ্রমরকে কে আদর্শ বলিবে?) অথচ এই দোষে-গুণে-মণ্ডিতা রূপহীনা নায়িকার ব্যথায় গ্রন্থকার কেমন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিয়া রাখিলেন? তৃতীয়তঃ, ইহার প্রত্যেক চরিত্রটি গল্পধারাকে এক নিদারুণ পরিণামের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। ভ্রমর ও গোবিন্দলালের পরস্পরের প্রতি অভিমান, সংশয় ও বিরুদ্ধ ধারণার ত কথাই নাই, রোহিণীর চরিত্র ত ভ্রমর হইতে গোবিন্দলালকে বিযুক্ত করার জন্যই সৃষ্টি, এমন কি যাঁহারা গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহারাও অত্যন্ত সদভিপ্রায়ে উভয়ের বিচ্ছেদের কারণ বা মিলনের অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছেন। ক্ষীরী চাকরাণী বিচ্ছেদের প্রথম বীজ বপন করিল বটে (সামান্য দাসী-চরিত্রের কথা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল), গোবিন্দলালের মাতা আপন অদূরদর্শিতায় সেই বীজাঙ্কুরকে ছায়াঘন বনস্পতিতে পরিণত করিয়া দিলেন। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে কোন দিন কোন সৎপরামর্শ দিলেন না, উইল সংশোধন করিয়া শাসনের বা

সংশোধনের ভার দিয়া গেলেন ভ্রমরের উপরে। ফলে, তাহারা চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মাধবীনাথ এমন বন্ধু লইয়া জামাতা গোবিন্দলালকে উদ্ধার করিতে গেলেন যে তিনি গোবিন্দলাল ও রোহিণীর বিচ্ছেদ ঘটাইলেন বটে, কিন্তু গোবিন্দলালকে হত্যাকারীতে পরিণত করিয়া। আর, গোবিন্দলাল বিচারে মুক্তি পাইবার পরে জামাতার প্রতি মাধবীনাথের ক্রোধ যেন বাড়িতেই লাগিল, ফলে জামাতা-কন্যার পুনর্মিলনে আগ্রহ হ্রাস পাইল। এই ভাবে গ্রন্থখানি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যেন পুঞ্জীভূত ভ্রমের একটি বিয়োগান্ত কাহিনী—tragedy of errors। চতুর্থতঃ, এবং সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা, এই tragedy of errorsএর কেন্দ্রস্থ ব্যক্তি অর্থাৎ নায়ক গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপের আকর্ষণে ধাপের পর ধাপে গড়াইয়া পড়িতেছে, অথচ কি গভীর আত্মপ্রতারণা, সে দুর্ভাগা রোহিণীর দুঃখ বা বিপদ মোচনের মাত্র প্রয়াসী তবু কি না ভ্রমরের অবিশ্বাস! অন্ধ রূপতৃষ্ণা মনের অন্তস্থলে থাকিয়া কেমন করিয়া দয়ার পরে দয়া প্রকাশে রোহিণীর প্রতি আসক্তিতে পরিণত হইল, কেমন করিয়া কামাতুর গোবিন্দলাল ত্রুটির পর ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া ভ্রমরের প্রতি বিরক্ত অক্ষমায় উপনীত হইল, আবার কেমন করিয়া ভ্রমরের ভালবাসার অতীত সুখস্মৃতি রোহিণীর সঙ্গসুখে অতৃপ্তি আনিয়া দিল, ইহার অপরূপ বর্ণনাই না কৃষ্ণকান্তের উইলের অনুত্তম শিল্পচাতুর্য্য ?

কিন্তু তাহা হইলেও কৃষ্ণকান্তের উইল যে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের শিল্পপ্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ আমরা এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। ভ্রমরচরিত্রে ঐকান্তিক প্রেম ও দুর্জ্জয় অভিমানের দ্বন্দ্বাভিঘাত শেষ পর্য্যন্ত রহিয়া গেল, অতিক্রান্ত হইতে দেখিলাম না। অথচ সে চরিত্রের স্বর্গীয় সরলতা এমন আর একটি উপাদান ছিল যাহার প্রাচুর্য্য পাঠক-সম্প্রদায়কে বরাবর তাহার চরিত্রের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট এবং দুঃখে ব্যথাতুর করিয়াছে, এবং যাহার পরিপূর্ণতা হয়ত তাহাকে পূর্ব্বোক্ত দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে উঠাইয়া দিতে পারিত কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দিল না। আর, সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পরেও অনুতপ্ত গোবিন্দলালের ভিক্ষা প্রার্থনার উত্তরে ভ্রমরের লিখিত পত্র—"আপনার আসার সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যতদিন না আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই।"[১] —আমাদের কাছে কেমন বিসদৃশ মনে হয়। কোন আদর্শ হইতে বিচ্যুতির জন্য যে তাহা নহে। ভ্রমরের সরল হৃদয়ের অভিমানই ত তাহার চরিত্রে অধিকতর বাস্তবতা আনিয়া দিয়া তাহাকে আমাদেরই ঘরের সচরাচর দেখা মেয়ের মত অত্যন্ত সহানুভূতির পাত্রী করিয়াই তুলিয়াছে, কিন্তু গোবিন্দলালের উপেক্ষা ও অদর্শনে যে ভ্রমর মৃত্যুপথের পথিক তাহার পক্ষে

১ ২।১৩।১১২ পৃঃ।

এই পিত্রালয়ে যাওয়ার পুনরাবৃত্তি তাহার পূর্ব্বাপর উক্তির সহিত সুসঙ্গত হয় কিরূপে? গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধে বা প্রথম খণ্ডে ভ্রমরের যে শেষ উক্তি 'আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে,'[১] সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত ঐ পত্রের ভাব যেমন বেসুর, গোবিন্দলালকে দেখাইবার জন্য যামিনীর প্রতি ভ্রমরের অন্তিম প্রার্থনার—অর্থাৎ 'একবার দেখা দিদি! ইহজন্মে আর একবার দেখি! এই সময়ে আর একবার দেখা!'[২] —এই মিনতির সহিত তেমনই সঙ্গতিহীন। এই পত্র প্রাপ্তির পূর্ব্ব বৎসরেও অর্থাৎ 'পঞ্চম বৎসরে'ও 'ভ্রমর আবার শ্বশুরালয়ে গেল' এবং 'যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল' বলিয়া বর্ণনা দেখা যায়।[৩] হত্যার অভিযোগ হইতে গোবিন্দলালের মুক্তি এবং ভ্রমরের মৃত্যু দিনের মধ্যে দীর্ঘ-কালিক ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া কেন যে এই প্রত্যুত্তরের অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তাহা নিতান্তই দুর্ব্বোধ্য।

অবশ্য এই প্রত্যুত্তরের গল্পগত সার্থকতা বা প্রয়োজন যে নাই তাহা নহে। কৃষ্ণকান্তের উইলকে চিরবিচ্ছেদের আখ্যানে পরিণত এবং গ্রন্থের অন্তিম tragedyকে ঘনীভূত করিয়া তুলিবার জন্য উহা আবশ্যক হইয়াছে। এই প্রত্যুত্তরে ভ্রমরের উপেক্ষিত জীবনের অভিমান যেমন বাণীলাভ করিয়াছে, গোবিন্দলালের প্রতি অক্ষমার দণ্ডও তেমনই সুপ্রচারিত বটে।

১ ২।১২।১০৬ পৃঃ। ২ ১।০৩০।৭৮ পৃঃ। ৩ ২।১৪।১১৫.পৃঃ।

কিন্তু ইহা গোবিন্দলালের অন্যায় অভিমানের ন্যায্য 'উতোর' হইলেও, ইহার জন্যই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভ্রমর যে আশা জাগায়, দ্বিতীয় খণ্ডের ভ্রমর তাহা পূরণ করে না বলিয়া অপূর্ণতার একটা আক্ষেপ পাঠকের মনে থাকিয়া যায়।

আমরা কিন্তু ভ্রমরের চরিত্র অপেক্ষা রোহিণীর চরিত্র অনেক বেশী এবং আগাগোড়া সুসঙ্গত মনে করি। আধুনিক সমালোচকেরা কিন্তু বলেন রোহিণীচরিত্রের পরিণাম কল্পনায় সামাজিক বঙ্কিমের পরিচয় আছে, শিল্পী বঙ্কিমের পরিচয় নাই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত পরিষ্কার বলিয়াছেন এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের "কবিচিত্ত যেন তাঁহার সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা ক'রে ম'রেছে"। আমাদের অবশ্য একথা মানা দুষ্কর এবং ইহা সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ ভ্রান্ত ধারণা বলিয়াই মনে হয়। কৃষ্ণকান্তের উইল যত্ন সহকারে পাঠ করিলে যেমন দেখা যায় শরৎচন্দ্রের কথিতরূপ মনে হওয়া অযৌক্তিক, শরৎচন্দ্রের অপর উক্তি "আমার আজও যেন মনে হয় দুঃখে, সমবেদনায়, বঙ্কিমবাবুর দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে" তেমনই অলীক কল্পনাপ্রসূত। রোহিণীর অপঘাত মৃত্যু সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে বিরক্ত হইয়া বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন "অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'রোহিণীকে মারিলেন কেন'? অনেক সময়ে উত্তর দিতে বাধ্য হইয়াছি 'আমার ঘাট হইয়াছে'। কাব্যগ্রন্থ মনুষ্য-জীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র,

একথা যিনি না বুঝিয়া, একথা বিস্মৃত হইয়া, কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস-পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ-সকল উপন্যাস পাঠ না করিলে বাধ্য হই।" অতএব যাঁহাদের "ছেলেবেলায় কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণীচরিত্র অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল" তাঁহারা বড় হইয়া পুরাতন স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া উল্টা ধাক্কা দিয়াছেন কি না তাহা বিচার করিয়া দেখা দরকার।

রোহিণীচরিত্রস্রষ্টার অপরাধ কি? "হিন্দু-সমাজ ও নীতিপুস্তক পাপীর শাস্তিতে যে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো" কোন চরিত্রের বা গল্পের পরিণতি এমন যাহাতে না হয় সেরূপ একরার দিয়া উপন্যাস লেখা সকলের পক্ষে সম্ভব না হইতে পারে, যেহেতু "হিন্দু-সমাজের সুনীতির আদর্শে"র প্রতি অতিমাত্র অনাস্থা সকলের থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু রোহিণীর মরা উপন্যাসের দিক্ দিয়া সম্ভব বা অসম্ভব তাহা আলোচনার যোগ্য বটে। শরৎচন্দ্র ১৩৩০ সালের শ্রাবণ মাসে লিখিয়াছিলেন "তাহার (রোহিণীর) মরার সম্বন্ধে আধুনিক লেখক ও পাঠকগণের যে আপত্তি আছে তাহা নয়, কিন্তু আগ্রহও নাই, বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে আমরা অনেকটা উদাসীন"।[১] তিনি সেখানে থামিলেও হয়ত বঙ্কিমের সিদ্ধান্ত-সমর্থক কৃষ্ণকান্তের উইলের আলোচনাকারীর পক্ষে কোন উত্তর না দিয়া উদাসীন থাকাও চলিতে পারিত। কিন্তু

১ বঙ্গবাণী, ২য় বর্ষ শ্রাবণ ১৩৩০ : 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' ৬৮৪ পৃঃ।

বাসিবার পূর্ব্বে সে হরলালের বিধবাবিবাহ-প্রস্তাবে প্রলুব্ধ হইয়া কৃষ্ণকান্তের উইল চুরি করিয়া হরলালের উপকার করিতে প্রস্তুত হয় এবং চুরি করিয়াও আনে। যেরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া, চাতুরী করিয়া, সে কৃষ্ণকান্তের চাবি ও উইল রাখার স্থান দেখিয়া গিয়া হরলালের জন্য উইল চুরি করিয়া লইয়া যায়, তাহাতে তাহার ভালবাসিবার শক্তি অপেক্ষা অশুভ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কম মনে হয় না এবং এ দেশের সৌভাগ্যক্রমে সাধারণ ভদ্রনারীতে সে শ্রেণীর ভালবাসার শক্তি ও বুদ্ধির অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত সুলভ নহে। তবে ভালবাসার খাতিরে বা দায়ে, উইল চুরি করার জন্য কৃষ্ণকান্তের মত বাঘের ঘরে প্রবেশ করা যদি অসামান্য ভালবাসার প্রমাণ হয় তাহা হইলে গোবিন্দলাল সে 'অপরিসীম' ভালবাসার দ্বিতীয় পাত্র বা উপলক্ষ্য বটে। সে ভালবাসার প্রথম পাত্র বা লক্ষ্য হইয়াছিল হরলাল। আসল উইল যথাস্থানে রাখিয়া নকল উইল সে ফিরাইয়া আনিতে গিয়াছিল 'সহসা গোবিন্দলালের প্রতি' 'প্রণয়াসক্ত' হইবার পরে বটে, কিন্তু হরলাল তাহাকে বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় হরলালের প্রতি পূর্ব্ব বিরক্তির জন্য তাহার ভাল না করিবার উদ্দেশ্যেও নহে কি? রোহিণী কিন্তু হরলালকে আগেই কথা দিয়াছিল 'প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিব'।[১] তবে তাহার ভালবাসার নাকি "অপরিসীম শক্তি" কাজেই একথা

১ ১।৩।১২ পৃঃ।

বলা যাইতে পারে যে উইল বদলাইবার দিন যখন আসিল তখন তাহার প্রাণ আর তাহার আয়ত্তাধীন ছিল না। কিন্তু গ্রন্থে জাল উইল বদলাইবার অর্থাৎ জাল উইলের পরিবর্তে আসল উইল যথাস্থানে রাখিয়া আসিবার আরও একটি কারণের উল্লেখ আছে তাহা অন্ততঃ অনাধুনিক পাঠকের বিস্মৃত হইলে চলিবে না অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দকে ভবিষ্যৎ বিপদ্ হইতে রক্ষা করা।[২] অতএব সে কেবল গোবিন্দলালের ভাল করিবার জন্যই দ্বিতীয়বার উইল চুরি করিতে গিয়াছিল ইহা অত্যুক্তি এবং ইহা অত্যুক্তি হইলে রোহিণীর ভালবাসার "অপরিসীম শক্তি"র প্রথমোক্ত প্রমাণটি ভাসিয়া যায়।

রোহিণীর অসামান্য ভালবাসার দ্বিতীয় প্রমাণ হিসাবে বলা হইয়াছে সে "বারুণীর জলতলে প্রাণ দিতে গিয়াছিল এমনই প্রিয়তমের জন্য।" "প্রিয়তমের জন্য" কথার অর্থ কি? "এমনই" শব্দপ্রয়োগে বুঝিতে হয় প্রিয়তমের ভালর জন্য। কিন্তু কোন মতেই তাহা হইতে পারে না। যেহেতু প্রিয়তমের ভালর জন্য হইলে সে নিশ্চয়ই গোবিন্দলালের প্রস্তাব মত দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইতে রাজী হইত। বারুণীর জলতলে প্রবেশ করিয়া প্রিয়তমের ভাল করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রিয়তম গোবিন্দলালকে পাইবার জন্য এই অর্থ করাও চলে না যেহেতু আত্মহত্যা করিলে সে প্রিয়-প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না।

---

১ ১।৯।২৫ পৃঃ। ২ ১।৯।২৬ পৃঃ।

তবে রোহিণী বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল কেন? বাস্তবিক সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার রোহিণীর অন্তরের কোন খবর, অন্ততঃ ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বকালের বিশেষ কোন সংবাদ আমাদের দেন নাই। রোহিণীর তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মনোভাবের পরিচয় যতদূর দিয়াছেন তাহাতে গোবিন্দলালকে পাইবার পক্ষে তাহার আশাহত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না, বরং সে আশা ক্রমশঃ সফল হইবার ভরসাই সে পাইতেছিল বলিয়া মনে হয়। বারুণীতীরে প্রথম সাক্ষাতে সে যে সহানুভূতির বাণী গোবিন্দলালের নিকট শুনিয়াছিল তাহাতে যে আশার অঙ্কুরোদ্‌গম, পরবর্ত্তী ঘটনা-পরম্পরায় তাহা পল্লবে পল্লবে বিস্তার লাভই করিতেছিল। উইল বদলাইতে গিয়া ধরা পড়িবার পরদিনের সাক্ষাতে অর্থাৎ তৃতীয় সাক্ষাতে[১] সে তাহার মনের খবর দিয়া, গোবিন্দলাল তাহাকে কৃষ্ণকান্তের হাত হইতে রক্ষা করিতে যে প্রস্তুত শুধু তাহা বুঝে নাই, পরন্তু এমন কথা শুনিয়াছিল যে গোবিন্দলাল তাহার প্রতি আসক্ত হওয়াও সম্ভব। গ্রন্থকার তাহা এত স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছেন যে তাহাতে ভুল করিবার উপায় নাই।

'গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এই ভুজঙ্গীও সেই

---

১ ১।১২ পৃঃ।

মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার আহ্লাদ হইল না, রাগও হইল না—সমুদ্রবৎ সে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত হইয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল। বলিলেন 'রোহিণি, মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভাল, কিন্তু মরণে কাজ নাই'।* * *

গোবিন্দলাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রোহিণী বলিল, বলুন না?

গো। তোমাকে এ দেশ ত্যাগ করিতে হইবে।

রো। কেন?

গো। তুমি আপনিই ত বলিতেছিলে তুমি এ দেশ ত্যাগ করিতে চাও?

রো। আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়, আপনি বলেন কেন?

গো। তোমায় আমায় আর দেখাশুনা না হয়।

রোহিণী দেখিল গোবিন্দলাল সব বুঝিয়াছেন। মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইল;—বড় সুখী হইল। তাহার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। আবার তাহার বাঁচিতে সাধ হইল। আবার তাহার দেশে থাকিতে বাসনা জন্মিল। মনুষ্য বড়ই পরাধীন।"[১]

ঐ 'সুখের' 'সাধের' ও 'বাসনা'র অনুক্রমে, দেশে থাকার সঙ্কল্প স্থির করিয়া রোহিণী আসিয়া যখন চতুর্থ সাক্ষাতে গোবিন্দলালকে তাহা জানাইয়া গেল তখনও গোবিন্দলালকে পাইবার আশায় বঞ্চিত হইবার কোন কারণই হইল না। এমন কি, তাহার আশঙ্কা অনুযায়ী গোবিন্দলাল রাগ ত করিলই না

১ ১।১২।৩৭ পৃঃ।

বরং তাহার চোখের জলে অভিভূত, তাহার কথায় নিরুত্তরই হইয়া গেল। সে আসিয়াছিল কাঁদিতে কাঁদিতে কিন্তু ফিরিল অশ্রু মুছিয়া। গ্রন্থের বর্ণনা—

"রোহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে গোবিন্দলালের কাছে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন? কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল ত'?

রো। না।

গো। সে কি? এই মাত্র আমার কাছে স্বীকার করিয়াছিলে?

রো। যাইতে পারিব না।

গো। বলিতে পারি না। জোর করিবার আমার কোনই অধিকার নাই—কিন্তু গেলে ভাল হইত।"

রোহিণী দেখিল তাহার অবাধ্যতায় বা কথা পরিবর্ত্তনে গোবিন্দলাল রাগ করা দূরে থাক, নিজের দুর্ব্বলতায় বা গরজে গোবিন্দলাল যেন মিনতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাজেই রোহিণী যখন লজ্জার কোন ধারই ধারে না তখন জোর করিয়াই প্রশ্ন করিল ঃ—

" 'কিসে ভাল হইত'?

গোবিন্দলাল অধোবদন হইলেন। স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলিবার তিনি কে?

রোহিণী তখন চক্ষের জল লুকাইয়া মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়া গেল।"[১]

---

১ ১।১৪।৪৩ পৃঃ।

গোবিন্দলালকে পাইবার আশা তখন আর রোহিণীর কাছে দুরাশা নহে। উইলচুরির অপরাধমুক্ত, দেশে থাকার একপ্রকার অনুমতিপ্রাপ্ত, "বড় সুখী" ও উত্তরোত্তর আশান্বিত রোহিণীর আত্মহত্যা করিবার কোন কারণই হইতে পারে না। অথচ ইহার পরেই আমরা বারুণীর জলে আত্মবিসর্জ্জন-কারিণী রোহিণীর সাক্ষাৎ পাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বারুণীতে ডুবিবার পূর্ব্বে রোহিণীর মনের অবস্থা কি যে ছিল, কেন যে রোহিণী এই নিদারুণ সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহার কোন বিশদ বিবরণ গ্রন্থকার আমাদের দেন নাই। কাজেই রচনার এই দুর্ব্বলগ্রন্থির জন্য যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করা চলিতে পারে কিন্তু "প্রাণ দিতে গিয়াছিল এমনই প্রিয়তমের জন্য" ইহা সপ্রমাণ করা দুরূহ।

কিন্তু প্রাণ দেওয়া ত ছোটকথা নহে। অতএব প্রশ্ন হইবে—রোহিণী তবে এত বড় সঙ্কল্প করিল কেন? অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাধারার দিক্ দিয়া বলা যাইতে পারে ভ্রমরের নির্দ্দেশে[১]। কিন্তু সতীনের বা প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর নির্দ্দেশে আত্মহত্যা করা কি সম্ভবপর ঘটনা? বর্ণিত ঘটনার ভিত্তিমূলে একমাত্র সম্ভাবিত কারণ এই হইতে পারে যে রোহিণী তাহার যে মর্ম্মকথা গোপনে গোবিন্দলালকে বলিয়াছিল গোবিন্দলাল তাহার সে বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া অর্থাৎ অন্তরের অন্তঃপুরে নিভৃতে তাহার রসাস্বাদন না করিয়া, ভ্রমরের নিকট

১ ১।১৪।৪৫-৪৬ পৃঃ।

কিনা সে কথা প্রকাশ করিয়াছে। সে কারণ মনঃক্ষোভে বা গোবিন্দলালের প্রতি অভিমানে, তাহার তৃষিত জীবনের ব্যর্থতার নূতন উপলব্ধি ( sense of frustration ) মূলে আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিয়া থাকিবে [১]। তাহার সম্ভোগবিরহিত অথচ লালসাবিধুর জীবনের অতৃপ্তি ত পূর্ব্বেই তাহাকে অশ্রুময় ও তাহার জীবনভার দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছিল [২]। গোবিন্দলালের সাক্ষাৎ ও সহানুভূতি, সতর্কতা ও বিমূঢ়ব্যবহার, নূতন আশার সঞ্চার করিলেও, প্রণয়নিবেদনের পরেও যখন গোবিন্দলালকে ভ্রমর-বিমুখ করিতে পারিল না, তখন অভাগিনী মরণে শান্তি না খুঁজিয়া করে কি? কিন্তু তাহা হইলেও 'প্রিয়তমের জন্য প্রাণ দেওয়া' এমন অর্থ করা যায় না। ঐরূপ ব্যাখ্যা রোহিণীর কল্পিত প্রেমৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কিন্তু উল্লিখিত ভাবে যাঁহারা ভুল বুঝিতে বা বুঝাইতে চাহেন তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করিতে আমরা কোন আগ্রহ দেখাইতাম না যদি ঐ ভুলধারণার ভিত্তির উপরে রোহিণী-চরিত্রের পরিণাম সম্বন্ধে ভুলধারণা গঠিত না হইত এবং তাহার

---

১ Tolstoyএর Anna কতকটা তাহাই করিয়াছিল। "Galsworthy... said he had never been convinced that Anna in the circumstances shown would have committed suicide ". কিন্তু Aylmer Maude বলেন, "Having no other interest in life, she developed a passionate though causeless jealousy that quite unbalanced her". (Introduction to Anna Karenina). এখানে বরং jealousyরও যথেষ্ট কারণ দেখা যায়। (১।৭।২১)।

২ ১।৬, ৭, ৯ পঃ।

জন্য আবার রোহিণী বা গোবিন্দলালের স্থলে রোহিণী-স্রষ্টাকে বা হিন্দু সমাজের সুনীতির আদর্শকে আসামী সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা না হইত। রোহিণী-চরিত্রের বাদী সুর (dominant note) হইতেছে তাহার প্রবল সম্ভোগতৃষ্ণা যাহা তাহার দুর্ভাগ্যে এবং সংযমশিক্ষার অভাবে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। যে তৃষ্ণা মিটাইবার পক্ষে কোন পাত্র অপাত্র নহে—হরলালও সুপাত্র, কোন কার্য্য তাহার অকার্য্য নহে—চুরি করিতেও সে প্রস্তুত। এমন কি নারীসুলভ লজ্জাও তাহার লালসা-জ্ঞাপনে অন্তরায় সৃষ্টি করে না। এ দিক্ দিয়া তাহার চরিত্রে কোন 'দুর্ব্বলতা' নাই, বরং তাহার প্রণয়পাত্রের দুর্ব্বলতার প্রতি-আভাসে সে তাহার শক্তিজাল অধিকতর বিস্তার করিতে উদ্যত। যে দিন হইতে ( অর্থাৎ বারুণীতে জলমগ্ন হইবার রাত্রি হইতে ) সে বুঝিল গোবিন্দলাল তাহার রূপায়ত্ত বা রূপমুগ্ধ, সে দিন হইতে সে লোকলজ্জাও ত্যাগ করিল। সামান্যা পণ্যস্ত্রী যেমন প্রাপ্ত পণের প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, সেও তেমনই গোবিন্দলাল তাহাকে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছে বলিয়া অচিরে বিজয়িনীর গর্ব্বে ভ্রমরকে জানাইয়া ও জ্বালাইয়া আসিল। তাহার পরিণাম বুঝার পক্ষে তাহার এই বিজয়গর্ব্ব ভুলিলে চলিবে না।

তবু এ কথা বলি না যে গোবিন্দলালের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় রোহিণী যেমন অগ্রবর্ত্তী ছিল, গোবিন্দলালের সহিত বিচ্ছেদ-ঘটনায় সেই প্রথম অপরাধী। প্রসাদপুরের নবজীবনে

অতৃপ্তি প্রথমে গোবিন্দলালের মধ্যেই দেখা দেয়। 'হীরা হিরণতেজি রাঙ্গহি রঙ্গ' কত দিন চলিতে পারে? ভ্রমর দীর্ঘ দিন বৃথা ভালবাসে নাই। তাহাকে ত্যাগ করা সহজ, তাহাকে মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলা কঠিন। যতদূরে থাক, জীবিত ভ্রমর, যত দিন যাইতে লাগিল ততই রোহিণীর বৈপরীত্যে, গোবিন্দলালের মন পুনরধিকার করিতে লাগিল। গ্রন্থের বর্ণনা গোবিন্দলাল—

"রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দার-ঘর্ষণ-পীড়িত-বাসুকী-নিঃশ্বাস-নির্গত হলাহল। * * * * সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে—সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্ব্বপরিজ্ঞাতস্বাদ, বিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রণয়সুধা—স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্তপুষ্টিকর, সর্ব্বরোগের ঔষধ-স্বরূপ, দিবারাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখন ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধিশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে।[১]

আর 'রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ্, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্মে'র জন্য অনুশোচনাও উপভোগে শ্রান্ত গোবিন্দলালের হৃদয়ে ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিতেছিল। কাজেই যখন গোবিন্দলাল হয়ত ভাবিতেছিলেন—

"আমারি এ ভুল, বন্ধু, আমারি এ ভুল,
সে যে ছিল বরষার কুটজকুসুম হার

১ ২।১৫।১১৬ পৃঃ।

শরতে সোনার ক্ষেতে শেফালীর ফুল,
হেমন্তে কুন্দের হাস     বসন্তে বেলার বাস
নিদাঘে অপরাজিতা এলাইত চুল
আমারি এ ভুল, বন্ধু, আমারি এ ভুল।

*     *     *     *

আমারি এ ভুল, বন্ধু, বুঝিনু এখন
ছিঁড়িয়া কনকপট     ভাঙ্গিয়া মঙ্গলঘট
করিতেছি কাষ্ঠ লোষ্ট্রে দেবতাপূজন
দারুণ অবজ্ঞাভরে     দূর করি কমলারে
কামরূপা কুহকীর চরণবন্দন।”[১]

তখন গোবিন্দলাল অপেক্ষা অনেক বেশী অন্তর্দর্শী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি রোহিণী যে তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না ইহা কেমন করিয়া বলা যাইবে? ‘পূজাপরে বিসর্জ্জনের’ বাদ্যধ্বনির পূর্ব্বাভাস তাহার অন্তরে জাগুক আর নাই জাগুক, তাহার সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতা, তাহার তথাকথিত বিজয়ে পরাভবের দীনতা, নিশাচরের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বেও যে তাহার দর্পিত হৃদয়কে বিরক্ত করিয়া তুলিতেছিল, ইহা ত সহজেই অনুমেয়। প্রসাদপুরের প্রমোদগৃহে, বিলাসের বহুবিধ উপকরণ মধ্যে একপক্ষ যেদিন অন্যমনস্ক, এবং অপর পক্ষের তব্‌লা বেসুরা বলিতেছে সেদিনের সঙ্গতের অভাবের মধ্যেই ত আমরা নিশাকরের প্রবেশ দেখিতে পাই। কাজেই সে বিরক্ত অবস্থায় রোহিণীর

১ নিত্যকৃষ্ণ বসু: ‘ভুল’।

"নবীন যৌবনে" নবতর সুখের সন্ধানী হইবার বা "জীবনের চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলিই সত্য" এই অতি আধুনিক প্রেম (?) তত্ত্বে উপনীত হইবার কোন্ বাধা যে "উপন্যাসের আইনে" সৃষ্টি হইতে পারে তাহা সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্য নহে; বরং তাহার জীবননাট্যের পটপরিবর্ত্তনের প্রয়াস প্রস্তাবনার স্বভাবসঙ্গত পরিণতি বলিয়াই সাধারণ পাঠক মনে করিবে। আর, যে সময় গোবিন্দলাল তাঁহার প্রদত্ত বিপুল পণের ব্যর্থতা সম্যক্ উপলব্ধি করিলেন, সে সময় তাঁহার উদ্বেলিত অনুশোচনা তাঁহার মত ভাবপ্রবণ অভিমানী ব্যক্তিকে যে উন্মত্তবৎ আচরণ করাইল তাহাতেই বা বিস্ময়ের কি থাকিতে পারে? রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রণয়লীলার অবসান বঙ্কিম যে ভাবে দেখাইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে মনোবিজ্ঞানসম্মত ও "উপন্যাসের আইন" অনুমোদিত বলিয়াই আমরা মনে করি। ধর্ম্ম ও নীতির দাবীর সহিত Art-এর সিদ্ধান্ত বা conclusion মিলিয়া গিয়াছে বলিয়া "নীতির চোখ রাঙানিতে" তাহা ঘটিয়াছে মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই। যাঁহারা তত্ত্ববিচারে বলেন "যা immoral, যা অকল্যাণ কিছুতেই তা Art নয়"[১], কাব্য-সৃষ্টি বা বিচারের সময়, কোন ক্ষেত্রেই, সে কথা তাঁহারা বিস্মৃত হইতে পারেন না। বঙ্কিমের প্রতিভা উক্ত সিদ্ধান্তের উপেক্ষা বা অনাদর করে নাই বলিয়াই বঙ্কিমের সৃষ্টি এমন সর্ব্বাংশে অনবদ্য। অবশ্য তিনি গোবিন্দলাল-

১ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ 'সাহিত্য ও নীতি' ('বঙ্গবাণী' ১৩৩১, পৌষ, ৫৩২ পৃঃ)।

রোহিণীর প্রণয়কাহিনীর জোয়ার-ভাটার আরও বিস্তৃত বর্ণনা করিলে হয়ত "উপন্যাসের আইনের" ধারাগুলি আরও পরিস্ফুট হইতে পারিত। কেন যে তাহা করেন নাই তাহার কৈফিয়ৎও কিছু দিয়াছেন।[১]

কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইলের যে চরিত্র অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অনন্যসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে তাহা গোবিন্দলালের চরিত্র। গোবিন্দলাল ধনীর সন্তান, রূপবান্ যুবক, গুণবান্ পুরুষ। এমন গুণান্বিত ও সৎস্বভাব যে জ্যেষ্ঠতাত কৃষ্ণকান্ত নিজের সন্তান অপেক্ষা তাহাকে অনেক বেশী স্নেহ করেন এবং 'বাঘের মত' লোক হইয়াও তাহার অনুরোধের অন্যথা করিতে পারেন না। কালো ভ্রমর শুধু তাঁহার ভালবাসায় মুগ্ধ নহে, ভ্রমরের রূপের দৈন্য গোবিন্দলাল তাঁহার উদার, স্নেহময় প্রীতির প্রসাধনে এমন পূরণ করিয়া লইয়াছিলেন যে ভ্রমরকে কোনদিন এ আক্ষেপ করিতে হয় নাই যে—

"পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!"[২]

ভ্রমরের রূপ না থাকিলেও অনেক গুণ ছিল সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও ভ্রমরের রূপের অভাব, রূপবান্ গোবিন্দলাল তাঁহার যে প্রীতির প্লাবনে ঘুচাইয়া দিয়াছিলেন তাহার গৌরব কি বড়

---

১ "যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয় তাহাই বলিব" ২।৫।৯০

২ রবীন্দ্রনাথ—মানসী।

কম ? তাহাতে পরিস্নাত হইয়াই না সোহাগিনী ভ্রমর গরবিনী, অভিমানিনী ?

"তুমিই ত দেখালে আমায়
( স্বপ্নেও ছিল না এত আশা )
প্রেম দেয় কতখানি, কোন হাসি কোন বাণী,
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালবাসা।"১

সেই ভালবাসাই যে ভ্রমরকে 'সর্ব্বে সর্ব্বময়ী' ( dominant partner ) করিয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু কেমন করিয়া সেই প্রবল ভাবস্রোত ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া অবশেষে উপেক্ষার বালুকালীন হইয়া গেল, ইহাই ত কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রথম খণ্ডের মুখ্য ও মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী।

বঙ্কিমচন্দ্র সে কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন এমন ঘটনার পরে ঘটনা বিন্যাস করিয়া যে অভাবনীয় যাহা তাহাই ঘটিল যেন অবশ্যম্ভাবিরূপে, অথচ যেন গোবিন্দলালের সচেতন মনের অগোচরে। বারুণীতীরে অশ্রুময়ী রোহিণীর সহিত তাঁহার যে প্রথম সাক্ষাৎ তাহাতে গোবিন্দলাল ত শুধু বিধবা রোহিণীর অব্যক্ত বেদনার তরলধারায় সিক্ত হইয়া মাত্র একটু সহানুভূতিই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে হতভাগিনীর ব্যথার অশ্রুর জন্য করুণা ছাড়া কামনার কোন আভাস ত ফুটে নাই। তাহার পরে উইলচুরির অপরাধে অপরাধিনী রোহিণীর সহিত যে সাক্ষাৎ তাহাতে অবগুণ্ঠনবতী রোহিণীর

১ রবীন্দ্রনাথ—মানসী।

'কাতর কটাক্ষ' ( ইহলোকে যাহার সহায় কেহ নাই এমন ) 'আর্ত্তের ভিক্ষা'রূপেই প্রতীয়মান হইয়াছিল। কাজেই সে প্রার্থনা শোনাই কি হৃদয়বান্ মানুষের কর্ত্তব্য নহে ? তাহার পরে তৃতীয় সাক্ষাতে গোবিন্দলাল রোহিণীর মুখে যখন শুনিলেন যে তাঁহার অনুকূল উইলখানিই রোহিণী ফেরত দিতে আসিয়াছিল 'ইহ জন্মে যাহা কখনও পায় নাই' বারুণীতীরে প্রথম সাক্ষাতের দিনে তাহাই পাওয়ার জন্য, তখন 'দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেও' তাঁহার আহ্লাদ ত হয় নাই, 'সমুদ্রবৎ সে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস' উঠিয়াছিল মাত্র। কিন্তু এসকল ত তাঁহার জ্ঞানগোচর মনের কথা। জ্ঞানের অগোচর বা অবচেতন মনের খবর কি ? গ্রন্থকার তাহা ব্যঞ্জনায় রাখিয়া গিয়াছেন। রোহিণী যখন বলিল 'আমি দেশত্যাগের কথা বলিতেছিলাম লজ্জায়, আপনি সে কথা বলেন কেন ?' তখনও গোবিন্দলালের উত্তর হইল, 'তোমায় আমায় আর দেখাশুনা না হয়।' রোহিণী অবশ্য এই উত্তর শুনিয়া 'মনে মনে বড় অপ্রতিভ—বড় সুখী হইল'। রোহিণী নারীর সহজাত সংস্কারে যাহা বুঝিল, গোবিন্দলাল মার্জ্জিত বুদ্ধিতে যেন তাহার সন্ধানই পাইলেন না অথবা অনুভবে কিছু পাইলেও সতর্ক হইতেই চাহিলেন। গোবিন্দলালের সাধু সতর্কতার মধ্য দিয়া গ্রন্থকার তাঁহার দুর্ব্বল চিত্তের প্রথম সন্ধান দিলেন এবং ইহাও জানাইয়া দিলেন গোবিন্দলালের ভ্রমর হইতে বিযুক্ত হওয়া

এবং রোহিণীর প্রতি আসক্ত হওয়া তখনও সম্ভাব্য (probable) না হইলে অসম্ভব (impossible) নহে, এমন কি ইংরাজীতে যাহাকে বলে within the range of possibility.

গোবিন্দলালের সচেতন মন তখনও যে পরিবর্ত্তন কল্পনা করিতে প্রস্তুত নহে তাহার কারণ গোবিন্দলালের চিত্তের দৃঢ়তা নহে, পরন্তু তাঁহার ভরসা রোহিণী কলিকাতায় গেলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহার সাধু সঙ্কল্পের অনুকূল হইবে। কাজেই চতুর্থ সাক্ষাতে ( ১।১৪ পঃ ) রোহিণী আসিয়া যখন বলিয়া গেল 'কলিকাতায় যাইতে পারিব না' তখন গোবিন্দলাল নিরুত্তর হইয়া 'অধোবদন' ও 'নিতান্ত দুঃখিত' হইলেন। দুর্ব্বলের অধোবদন ও দুঃখিত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর কি ? পাঠক দেখিল সতর্ক গোবিন্দলাল আপন দুর্ব্বলতায় নিরুপায় গোবিন্দলালে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু তখনও গোবিন্দলালের আপন দুর্ব্বলতার স্বরূপ উপলব্ধি হয় নাই। রোহিণীর মত পরিবর্ত্তনের জন্য ভাবী অমঙ্গলের অস্ফুট ধারণা তাঁহাকে ( হয়ত বা তাহা রোহিণীর ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশার আশঙ্কায়ই অধিকতর ) চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। নতুবা নিজের পতন বা নিজের ও ভ্রমরের পরিণাম চিন্তা তখনও প্রস্ফুট হইয়া উঠে নাই। কাজেই সেই সময়ে যখন ভ্রমরকে আদর করিয়া 'কাতর কণ্ঠে' বলিতেছেন 'মিছে কথাই ভোমরা! আমি রোহিণীকে

ভালবাসি না।' 'রোহিণী আমায় ভালবাসে।'[১] তখন যে তিনি জ্ঞাতসারে ভ্রমরকে মিথ্যা বলিতেছেন তাহা নহে।

ঘটনাধারা কিন্তু অপ্রত্যাশিতরূপে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল! বারুণীর জলে রোহিণী ডুবিল, আর নিমজ্জিত রোহিণীকে বাঁচাইতে গিয়া তাহার অকালমৃত্যুর আশু সম্ভাবনায় করুণাবিহ্বল গোবিন্দলালকে আসিতে হইল রোহিণীর রূপজ্যোতির অতিসন্নিধানে। তাহার সদ্যঃস্নাত দেহকান্তির নিকট প্রভাবে গোবিন্দলাল যখন বিচলিত তখনই দেখিতে পাই তাঁহার নিজ দুর্ব্বলতার স্বরূপ বুঝিয়া পরিণাম চিন্তায় শিহরিয়া উঠিয়াছেন। একদিকে বিচারবিমূঢ় ভাবপ্রবণ ব্যক্তির দুর্ব্বলতার, অন্যদিকে নির্ব্বাণোন্মুখ বিবেকবুদ্ধির শেষ প্রোজ্জ্বল-শিখার, চিত্র হিসাবে সে সময়ের গোবিন্দলালের বর্ণনা মনস্তত্ত্ববিশারদ নিপুণতম শিল্পী বঙ্কিমেরই যোগ্য বটে—

"তখন গোবিন্দলাল সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া দরবিগলিত লোচনে ভাবিতে লাগিলেন 'হায় নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর। তুমি বল না দিলে কাহার বলে আমি বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইব? আমি মরিব, ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।"[২]

পরিণামের আশঙ্কায় ভগবানকে চিত্তে বিরাজ করিতে আহ্বান করিলেও আত্মজয়ে শক্তিহীন গোবিন্দলাল তাঁহার জীবনের যে দ্বিতীয় অঙ্ক সুরু করিলেন, গোপন ব্যবহারে তাহার

১ ১ খা।১৪ প

২ ১ খা।১৭ প

সূচনা এবং ভ্রমরের সহিত প্রকাশ্য বিচ্ছেদে তাহার শেষ। 'ভ্রমর হইতে যে তৃষ্ণা তৃপ্ত হয় নাই' কেমন করিয়া সে তৃষ্ণা 'নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীরূপ'ধ্যানে গোবিন্দলাল চাতকের পক্ষে দুর্নিবার হইয়া উঠিল, কেমন করিয়া জমিদারী পরিদর্শনের অবকাশে সে ধ্যানের অধিকতর সুযোগ মিলিল, সেই নীলমেঘপুঞ্জের অন্তরালে ভ্রমরপ্রীতির দীপ্তসূর্য্য অলক্ষিতে অস্ত গেল, আপনার পবিত্রতার প্রয়োজন অপেক্ষা 'ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী হইব না' যখন সিদ্ধান্তমাত্রে দাঁড়াইয়াছে, তখন ভ্রমরের দোষত্রুটি কেমন করিয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর আকারে দেখা দিতে লাগিল, যাহা ভ্রমরের ত্রুটিও নয় (যথা, কৃষ্ণকান্ত কর্ত্তৃক উইল পরিবর্ত্তন করিয়া গোবিন্দলালের স্থলে ভ্রমরের নাম লেখা) তাহার জন্যও ভ্রমর অমার্জ্জনীয় হইয়া উঠিল এবং অবশেষে সব মিলিয়া ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিবার প্রচুর কারণে পরিণত হইল, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে দেখা যায় তাহারই সকরুণ বিবৃতি। ভাবপ্রবণ গোবিন্দলাল অভিমান আশ্রয় করিয়া নূতন ভাবাবেগে তাড়িত হইয়া চলিয়াছেন। ভ্রমরের মিনতি দূরের কথা, মূর্চ্ছাও তখন আর মনে বাজে না। লালসা তখন এত প্রবল যে সে সম্বন্ধে আত্মপ্রতারণার আর উপায়ও নাই। কাজেই ভ্রমর যখন বলিল 'ধর্ম্ম নাই কি?' তখন 'বুঝি আমার তাও নাই' বলিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না। কিন্তু যেহেতু গোবিন্দলাল আধুনিক উপন্যাসের কোন কোন নায়কের মত নীতিবর্জ্জনতত্ত্ব

philosophy of immorality ) আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারেন নাই, আপনার অপরাধ সম্বন্ধে ধারণা আর অস্পষ্ট ছিল না, কাজেই ভ্রমরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যখন অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিলেন তখন 'চক্ষের জল মুছিতে মুছিতেই আসিলেন'। 'বালিকার অতি সরল যে প্রীতি—অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিনরাত্রি ছুটিতেছে' 'সে অমূল্য প্রীতি মনে পড়িল। মনে পড়িল যে যাহা ত্যাগ করিলেন তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না।'

এই যে ভালমন্দর ধারণা বা sense of values না হারাইয়া গোবিন্দলাল তাঁহার জীবনের তৃতীয় অঙ্ক প্রবর্ত্তন করিতে চলিলেন, রোহিণীর সহিত মিলন যাত্রায় ইহাই না তাঁহার পিছুডাক হইয়া রহিল ? ইহাই না অবশেষে রোহিণীর সহিত তাঁহার পূর্ণ মিলনের অন্তরায় সৃষ্টি করিল ? সে মিলনের সুরা যত পুরাতন হইতে লাগিল ততই সুপেয় হওয়া দূরে থাক, এক অভাবনীয় তিক্ততা তাহাতে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ইহা অভিভূত বিবেকবুদ্ধির নবজাগরণ ( moral resurrection ) নাই বা বলিলাম, বলিব ইহা ভ্রমরের 'অমূল্য প্রীতি'র সুখস্মৃতি। যাহা হোক গোবিন্দলালের জীবনের এই অঙ্ক সম্বন্ধে রোহিণী-চরিত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

তবে গোবিন্দলালের জীবনের চতুর্থ বা শেষ অঙ্কের অবসান বিষয়ে যে মতদ্বৈধ আছে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা

করা দরকার। অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার বহুপূর্ব্বে একবার এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন মনে হয় যে বঙ্কিম পরবর্ত্তী সংস্করণে গোবিন্দলালকে আত্মহত্যা হইতে বাঁচাইয়া কৃষ্ণকান্তের উইলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। যাঁহারা কৃষ্ণকান্তের উইলের নাটকোচিত যবনিকা-পতন চাহেন, তাঁহাদের অনেকেরই এইরূপ মত। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইলের সকল সৌন্দর্য্য তাহার সংশোধিত পরি-সমাপ্তিতে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এতটা অত্যুক্তি করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। তবে গোবিন্দলাল-চরিত্রের নবোদ্ভাবিত পরিণামের সঙ্গতি ও যাথার্থ্য সম্যক্ উপলব্ধি করা যে কঠিন ইহাও অস্বীকার করা যায় না। গোবিন্দলাল যে কত ভাবাবেগে কাজ করিতে পারেন গ্রন্থকার তাহা আমাদের ভাল করিয়াই দেখাইয়াছেন। কাজেই ভ্রমরের মৃত্যুতে বিকৃত-মস্তিষ্ক গোবিন্দলাল কেন যে আত্মহত্যা করিলেন না, অথবা সাময়িক বিকারের পরে কেমন করিয়া অভাবনীয় চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করিলেন তাহা অবর্ণিত, অতএব বুঝা দুরূহ। যে বারুণী-তীর তাঁহার জীবনের শুভাশুভ সকল দিনের সাক্ষী, যেখানে তাঁহার নৈতিক মৃত্যুর সূচনা বা ভ্রমরের মৃত্যুর বীজবপন, রোহিণীর প্রেতাত্মার নির্দ্দেশমত সেই বারুণীর "মৃত্যুসম নীল নীরে" গোবিন্দলালের সলিল-সমাধির যে কল্পনা বঙ্কিম প্রথমে করিয়াছিলেন তাহার নাটকীয় সুসঙ্গতি ও শিল্পগত সুষ্ঠুতা অস্বীকার করা যায় না। Mathew Arnold যাহাকে

'poetic justice' বলিয়াছেন, সেই কাব্যনীতির দিক্ দিয়াও দুইটি নারী-হত্যার অপরাধে অত্যন্ত অপরাধী গোবিন্দলাল, তাঁহার আত্মহত্যা বা মৃত্যুদণ্ড এড়াইতে না পারাই উচিত। অন্ততঃ বারুণীতীরস্থিত হতশ্রী জঙ্গলাকীর্ণ উদ্যানে জ্বালাময় মধ্যাহ্নে মানসিক বিকারগ্রস্ত গোবিন্দলালের প্রলাপে ও মূর্চ্ছায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে সুসঙ্গত হইত মনে হয়। নতুবা মানসিক ব্যাধি অতিক্রম করিয়া অন্তরের স্বাস্থ্য বা ভগবৎপ্রেম লাভের ও কৃপাপ্রাপ্তির যোগ্যতা গোবিন্দলাল কবে কি ভাবে অর্জ্জন করিলেন গ্রন্থকার তাহার কিছুই বর্ণনা করেন নাই। কাজেই সে দিক্ দিয়া গোবিন্দলাল বিগত জীবনের সমস্ত দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া, কেমন করিয়া যে 'ভ্রমরাধিক ভ্রমরের' অমৃত-স্পর্শ লাভ করিলেন তাহা নিতান্তই দুর্ব্বোধ্য। তবে বঙ্কিম হয়ত মনে করিয়াছিলেন নিজের পাপে সব হারাইয়া প্রবঞ্চিত জীবন যাপন করাই হইল যাহার যথাযোগ্য কাব্য-নিয়তি, আর, যাহার জীবন-তরণী রোহিণীর কূল ছাড়িয়া ভ্রমরের কূলে ফিরিয়াও ঘাটের সন্ধান পাইল না, তাহার পাপে ভারাক্রান্ত মজ্জমান তরণীর কাণ্ডারীপদে যদি সে পতিতপাবনকেই বরণ করে তাহাতেই বা বিস্ময়ের কি থাকিতে পারে? আর, মনীষী বঙ্কিমের অভিপ্রায় যদি Frazer সাহেব ঠিক বুঝিয়া থাকেন অর্থাৎ—

"Here the true workings of the novelist's mind are apparent, a deeper vein is touched. The love of the erring husband for his wife and the rival love by

which he is infatuated, typifies a struggle between Divine love and the ever-recurring phantasmal attraction of the soul to the objects of sense, from which freedom can only be reached by centring the mind on ideal perfection "[১]

তাহা হইলে ত পাশ্চাত্ত্য প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) পরিহার করিয়া যে শিল্পী কৃষ্ণতত্ত্বের শরণ লইতে চলিয়াছিলেন এখানে তাঁহারই দূর প্রসারিত দৃষ্টির পরিচয় পাই।[২]

"সম্মুখে অজ্ঞাতসিন্ধু ভাসে কৃষ্ণপদতরী
এই তীরে সন্ধ্যা ঊষা অন্যতীরে মুগ্ধকরী"।[৩]

অল্পায়ু বঙ্কিম চল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই জীবন-সন্ধ্যার ছায়াপাতের সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন কি না জানা যায় না, তবে একথা ঠিক দুর্গেশনন্দিনীতে যে শ্রেণীর রচনার আরম্ভ কৃষ্ণকান্তের উইলে তাহার শেষ। কৃষ্ণপদতরীর আশ্রয়ে পরপারের মুগ্ধকরী ঊষার আলোকে উদ্ভাসিত অন্তরের দিব্যদৃষ্টি-প্রভাবে বৃহত্তর জীবনের সফল ও বিফল সাধনার পথনির্দ্দেশক যে নূতন শ্রেণীর রচনাধারা উৎসারিত হয় আনন্দমঠ হইতে আমরা তাহার অভিনব রসের আস্বাদ পাইব।

---

১ Frazer : 'Literary History of India' P. 433.

২ ১৮৮২ সালে কৃষ্ণকান্তের উইলের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৮২ সালেই 'ভক্তি' মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আনন্দমঠ প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩ নবীনচন্দ্র সেন : 'প্রভাস'

"What is it for which we worship the name of Bankim to-day ? What was his message to us or what the vision which he saw and has helped us to see ? He was a great poet, a master of beautiful language and a creator of fair and gracious dream figures in the world of imagination ; but it is not as a poet, stylist or novelist that Bengal does honour to him to-day. It is probable that the literary critic of the future will reckon *Kapalkundala*, *Bishabriksha* and *Krishna Kanter Will* as his artistic masterpieces and speak with qualified praise of *Devi Chaudhurani*, *Ananda Math*, *Krishna Charit* or *Dharmatattva*, yet it is the Bankim of these latter works and not the Bankim of the great creative masterpieces who will rank among the Makers of Modern India. The earlier Bankim was only a poet and stylist—the later was a seer and nation builder. * * * Of the new spirit which is leading the nation to resurgence and independence he is the inspirer and political *guru*." * * * The supreme service of Bankim to his nation was that he gave us the vision of our Mother. * * * The mantra had been given and in a single day a whole people had been converted into the religion of patriotism."

SRI AUROBINDO :
'Rishi Bankim Chandra'
'*Bandemataram*'
16th April 1907.

"বঙ্গদর্শনে যে জিনিষটা সেদিন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্ব্বে বঙ্কিমের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা; মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজীতে যাকে বলে রোম্যান্স। * * *

বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে, যে পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে। সাহিত্য থেকে অস্পষ্টতার আবরণ এক পর্দ্দা উঠে গেল—ক্লাসিকাল অস্পষ্টতা বা রোম্যান্টিক অস্পষ্টতা। * * * কৃষ্ণকান্তের উইল সেই জাতেরই, যেন আরও স্পষ্ট।

তার পরে এলেন প্রচারক বঙ্কিম। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, একে একে আসরে এসে উপস্থিত, গল্প বলবার জন্যে নয়, উপদেশ দেবার জন্যে। আবার অস্পষ্টতা সাধু অভিপ্রায়ের গৌরবগর্ব্বে সাহিত্যে উচ্চ আসন অধিকার করে বসল।

আনন্দমঠ আদর পেয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যরসের আদর সে নয়, দেশাভিমানের। এক-এক সময়ে জনসাধারণের মন যখন রাষ্ট্রিক বা সামাজিক বা ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় বিচলিত হয়ে থাকে সেই সময়টা সাহিত্যের পক্ষে দুর্যোগের সময়। তখন পাঠকের মন অল্পেই ভোলানো চলে; শুঁট্‌কী মাছের প্রতি আসক্তি যদি অত্যন্ত বেশী হয় তা হ'লে রাঁধবার নৈপুণ্য অনাবশ্যক হয়ে ওঠে। ঐ জিনিষটার গন্ধ থাকলেই তরকারির আর অনাদর ঘটে না।"

( শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :
'শরৎচন্দ্র'—'প্রবাসী'
আশ্বিন ১৩৩৮ )

# আনন্দমঠ

# আনন্দমঠ

(১৮৮২ *)

বাঙ্গলা সাহিত্যে আনন্দমঠ একখানি অভিনব, অপ্রত্যাশিত ও যুগান্তরকারী উপন্যাস। অভিনব, কেন না আনন্দমঠ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে দেশপ্রীতির রসে পরিপূর্ণ এমন আর একখানি উপন্যাস বাঙ্গলাভাষায় লিখিত হয় নাই। অপ্রত্যাশিত, কেন না দেশাত্মবোধের যে গভীর অনুভূতি ইহাতে আছে তাহার তেমন কোন উন্মেষ, স্বদেশানুরাগের তেমন কোন বিকাশ তৎপূর্ব্বে ইংরাজ-আমলে এদেশের সাহিত্যে দেখা যায় নাই। আনন্দমঠ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় আমাদের জাতীয় মহাসভার (National Congress-এর) জন্মলাভের চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, আর 'স্বদেশী'যুগের প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে। অতএব এ কথা ঠিক নহে যে আনন্দমঠ কোন "রাষ্ট্রিক" "উত্তেজনার দিনে পাঠকের মন অল্পেই ভুলাইবার" জন্য লিখিত হইয়াছিল। ইহা গ্রন্থকারের অন্তরের প্রেরণাপ্রসূত, বাহিরের উদ্দীপনা-সঞ্জাত নহে। যে সময় প্রায় সকলেই দেশের কথা এক রকম বিস্মৃত হইয়াই

* সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে "১২৮৭ সালের চৈত্রে আরম্ভ হইয়া ১২৮৮ সালে শেষ হয়" (শচীশচন্দ্র : 'বঙ্কিম-জীবনী')। ইংরাজী ১৮৮২ সালে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ছিল—স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন ও প্রচেষ্টার কথা যখন কাহারও মনে জাগে নাই—সেই সময় মুক্তিমন্ত্রে অনুরণিত, দেশপ্রীতির রসনিসিক্ত, এমন উপন্যাসের পরিকল্পনা বিস্ময়ের বিষয় বটে। আর, উপদেশ মাত্র দিয়া নহে, বহুজনের হৃদয়ে দেশ-প্রীতি জাগাইয়া, বহুজনকে দেশমাতৃকার পূজায় অনুপ্রাণিত ও 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, আনন্দমঠ যে বাঙ্গলায় তথা ভারতে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, ইহা ত আধুনিক ভারত-ইতিহাসের সর্ব্বজন-বিদিত ঘটনা। ঐ অভাবনীয় ঘটনা কি সম্ভব হইত যদি আনন্দমঠ উপদেশ-মালাই হইত, ইহার আখ্যান দেশমাতৃকার সাক্ষাৎকার ও সেবার আনন্দ-বিকীরণে অসমর্থ হইত?

আনন্দমঠের উপক্রমে বঙ্কিম যেরূপ দুর্জ্জ্ঞেয়-রহস্যপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন তাহা যেমন অপূর্ব্ব তেমনই সার্থক। এমন অবতরণিকা তাঁহার আর কোন উপন্যাসে নাই। নিবিড় অরণ্য, পথহীন, আলোহীন, আলেকপ্রবেশের রন্ধ্রপর্য্যন্ত শূন্য; তাহার উপরে গভীর নিশীথে অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন—নিবাত, নিষ্কম্প, নিঃশব্দ। এমন স্থানে, এমন কালে, কোন অরণ্যসুলভ শব্দতরঙ্গ উঠিল না। সে 'অননুভবনীয় নিঃস্তব্ধতা' ভঙ্গ করিয়া সমীরিত হইল, সাধকের আকূতি, সিদ্ধির বাণী! কেমন প্রশ্নোত্তরে? গ্রন্থের বর্ণনা—

"আবার সেই নিঃস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, 'আমার মনস্কাম কি পূর্ণ হইবে না?'

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, 'তোমার পণ কি ?'

প্রত্যুত্তরে বলিল, 'পণ আমার জীবন সর্ব্বস্ব'। প্রতিশব্দ হইল, 'জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে'।

আর কি আছে ? আর কি দিব ? তখন উত্তর হইল, **'ভক্তি'**।"

প্রশ্ন কাহার, উত্তরই বা দিল কে, গ্রন্থকার তাহা বলেন নাই। তাঁহার অন্তরের এই প্রশ্নোত্তর কোন কল্পিত চরিত্রের মুখে সন্নিবেশ করিয়া তিনি যেন ইহার গৌরবহানি করিতে চাহেন নাই। পরবর্ত্তীকালে আনন্দমঠের বাণীর অচিন্ত্য প্রভাব দেখিয়া পাঠকের স্বতঃই মনে হয়, এ যেন কোন অপৌরুষের বাণী ঋষির ধ্যানে প্রকাশ পাইয়াছিল—যাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে 'আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা'।

কিন্তু আনন্দমঠের বাণী শুধু আরণ্যক আবেষ্টনে প্রচারিত করিয়া বঙ্কিম তাহাকে ভারতীয় রূপ দিবার চেষ্টা করেন নাই। দেশমাতৃকার সন্তানের নিকট হইতে যে সাধনার দাবী করা হইয়াছে তাহা ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের চিরন্তন সিদ্ধান্তের অনুরূপ। উপনিষৎ একদিকে যেমন বলিয়াছেন, ব্রহ্মসত্তার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বুদ্ধিময়, বিজ্ঞানময়, বা 'রসো বৈ সঃ', যে পরিচয়ই লইতে চাও 'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপোব্রহ্মেতি'[১] তেমনই অন্যদিকে ভরসা দিয়াছেন—

১ তৈত্তিরীয়ঃ ভৃগুবল্লী।

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ।[১]

তার পরে সমরক্ষেত্রে ভগবদ্‌গীতা বলিয়াছেন ( বঙ্কিম ত ভূমিকায়ই ভক্তিযোগাধ্যায় হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন )—

'যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ! ময্যাবেশিতচেতসাম্ ।
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ।[২]

ইহার সহিত সমান সুরেই আনন্দমঠের রচয়িতাও দাবী করিয়াছেন ভারতের স্বরাজ্যসাধনার ক্ষেত্রেও সিদ্ধিলাভের জন্য চাই অনন্যযোগ, অব্যভিচারিণী ভক্তি ।

কিন্তু এ কেমন ভক্তি আনন্দমঠের ন্যায় কর্ম্মাত্মক কাহিনীর সূচনায় যাহার দাবী করা হইল ? বঙ্কিম যে—

'এই মাটিতে মৃদঙ্গ হয় !'

বলিয়া ঢলিয়া পড়িবার লোক ছিলেন না, ভাবালুতা বা ভাবসর্ব্বস্বতা যে তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল, সে ত কৃষ্ণ-চরিত্রের পাঠক হিসাবে আমরা সকলেই জানি। কিন্তু অনুমানের কোন প্রয়োজন নাই। ভূমিকায় ভগবদ্‌গীতার

১ কঠ ১।২।২৩, মুণ্ডক ৩।২।২৩।

২ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা : ১২।৬-৮ শ্লোক ।

ভক্তিযোগাধ্যায় হইতে উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধার করিয়া গ্রন্থকার স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে গীতোক্ত ভক্তিই এখানে উদ্দিষ্ট অর্থাৎ যে ভক্তি জ্ঞান-বিরোধী নহে—জ্ঞান-সাধন, যে ভক্তি কর্ম্মবিমুখ নহে, কর্ম্মের সংশোধক—এমন ভক্তি যাহা সকল জ্ঞানের আহরণ করিবে ও সম্যগ্ জ্ঞানে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে—এমন ভক্তি যাহা সর্ব্বকর্ম্ম আরাধ্যকে সমর্পণ করিবে—যাহা ভাগবত কর্ম্ম ( "দিব্যকর্ম্ম" ) বরণ করিয়া লইবে।

আবার আরম্ভে শুধু ভক্তির দাবী জানাইয়াও বঙ্কিম দেশমাতৃকার সেবককে অব্যাহতি দেন নাই। এই ভক্তিতে দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্য 'সন্তানের' জীবনগঠনের পক্ষে এমন এক বিশিষ্ট সাধনপ্রণালীর, এক বিলক্ষণ নিয়মানুবর্ত্তিতার ব্যবস্থাও দিয়াছেন যাহা এযুগের ত্যাগব্রত মাতৃসন্তানগণেরও সিদ্ধান্ত-সম্মত বটে—অর্থাৎ যিনি পরাধীনতা বা দুর্গতি হইতে মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন করিতে চান, মাতৃসেবার অধিকারী হইতে চান, তাঁহাকে শুধু বাহুবলে বলবান্ হইলে চলিবে না, চরিত্রবলে ততোধিক বলীয়ান্ হইতে হইবে। তাঁহাকে সুসংযত, শুদ্ধচিত্ত, হইতে হইবে—এমন কি তাঁহার সাধনার মূলে, তপস্যার মূলে, চাই অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য। 'ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ'* সে কালের আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত হইলেও দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের বা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যে নিয়মানুবর্ত্তিতার ( discipline ) আবশ্যক

* যোগদর্শন : ২।৩৮ সূঃ।

ব্রহ্মচর্য্যপালন যে সে নিয়মের অপরিহার্য্য অঙ্গ এ যুগে মহাত্মা গান্ধী তাহা বলিবার বহুপূর্ব্বে, এমন কি সর্ব্বাগ্রে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা প্রচার করেন এবং বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অনেক দেশহিতব্রত কর্ম্মী তাহা অঙ্গীকার করিয়া লয়েন।

কিন্তু দেশের দুর্গতি মোচনের অথবা রাষ্ট্রনৈতিক অভ্যুদয়ের বা সর্ব্বোদয়ের কর্ম্মীর জন্য এমন আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজনই বা কি ? তাহা বুঝিতে হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বা হিন্দু সংস্কৃতির দিক্ দিয়া দেশ কি তাহা বুঝা দরকার। হিন্দুর চিরদিনের ধারণা এই যে

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'

সেই বিশ্বজননী আমার স্বদেশ বা দেশমাতৃকারূপে আমাকে জন্ম দিয়াছেন, আমাকে পালন করিতেছেন, মরণে আবার আমাকে বুকে তুলিয়া লইবেন। তাই বাৎসল্যরস-পিপাসু হিন্দু মাতৃপীঠসমন্বিত জন্মভূমিকে আত্মার বা বিশ্বজননীর বিশিষ্ট ব্যূহ বা বিগ্রহমূর্ত্তিরূপে কল্পনা করে। ইহা তাহার "ঈশাবাস্য" করিয়া জগদ্‌ভোগ করিবার অন্যতম উপায় মাত্র, ইহা chauvinism বা jingo-nationalism নহে। যাঁহারা স্বদেশনিষ্ঠা বিশ্ববোধের পরিপন্থী মনে করিয়া বঙ্কিমের আনন্দমঠকে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে লেখা ছেলে ভুলাইবার উপযোগী পাশ্চাত্ত্য দেশপ্রীতিমূলক (patriotic) উপন্যাস মাত্র মনে করেন, তাঁহারা বঙ্কিমের প্রচারিত স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ ও সাধন শ্রদ্ধাসহকারে বুঝিবার

চেষ্টা করেন না; বরং যেহেতু বঙ্কিম প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছেন 'যে সকল অমূল্যরত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি তাহার মধ্যে দুইটির আমরা উল্লেখ করিলাম —স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা,' অতএব তাঁহারা মনে করেন আনন্দমঠে বঙ্কিম বিলাতী nationalism বা জাতীয়তাবাদ এ দেশে আমদানি করিয়াছেন। বঙ্কিম যে ইউরোপীয় সাহিত্য বা চিন্তাধারা হইতে মননের বস্তু পাইলেও স্বকীয় ধ্যানধারণা-বলে তাহার শোধন করিয়া লইয়া দেশীয় সিদ্ধান্ত ও সংস্কৃতি সম্মত নূতন সামগ্রী অর্পণ করিবার অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাহা তাঁহারা ভাবিতেও পারেন না। কিন্তু 'ইউরোপীয় patriotism যে একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ'* পক্ষান্তরে প্রতীচ্য patriotism এর দুষ্প্রবৃত্তি-বিরহিত ও ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার অঙ্গীভূত দেশাত্মবোধ যে পরমাত্মতত্ত্বে বা বিশ্বাত্মায় উপনীত হইবার পরিপন্থী নহে পরন্তু মধ্যপথের পান্থশালা, এমন ভূমি যাহা জয় করিবার ত্যাগ স্বীকারে ঊর্দ্ধতর ভূমিজয়ের যোগ্যতা বা অধিকার লাভ করিতে হয়, বঙ্কিমই প্রথম সেই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া এ যুগে আধ্যাত্মিক রাজনীতিবাদের (spiritual

*"ইয়ুরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইয়ুরোপীয় patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবাসীদের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য-ধর্ম্ম না লিখেন" ('অনুশীলন': চতুর্বিংশ অধ্যায়)।

politics এর ) ভিত্তিস্থাপন করিয়া যান। আনন্দমঠ রচনার পর হইতে আত্মলাভের সাধনা দেশাত্মবোধ বা দেশাত্মতালাভের উপযোগী সাধনা বলিয়া মাতৃভূমির শ্রেষ্ঠ ত্যাগী সন্তানগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃতও বিহিত হইয়া আসিয়াছে।

তাই আনন্দমঠের সূচনায় দেশমাতৃকার সাধক বা সন্তানের নিকট দাবী হইল ভাববিহ্বলতায় জীবনত্যাগরূপ বাহ্যত্যাগের বা বিলাতী sacrifice এর নহে, পরন্তু যাহাতে অন্তরের 'সন্ন্যাস' লাভ হয় এমন অনন্যভক্তির। আর, সন্তানের জীবনগঠনের জন্য বিধান হইল ব্রহ্মচর্য্যপালনের।

কিন্তু দেশাত্মবোধসাধকের পন্থা ও নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াও আনন্দমঠের ঋষি ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আরও দিয়াছেন স্বদেশ-আত্মার ধ্যানমূর্ত্তি। সে কি মায়ের অপূর্ব্ব ত্রিমূর্ত্তির কল্পনা! অতীতে ভুবনমনোমোহিনী 'জগদ্ধাত্রী', বর্ত্তমানে 'হৃতসর্ব্বস্বা নগ্নিকা' 'কালিকা,' আর ভবিষ্যতে 'দিগ্‌ভুজা নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ'। মূর্ত্তি বলিলেই যাঁহারা মারমুখো হইয়া উঠেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, নতুবা বাঙ্গালী হিন্দু, যে অদ্বৈতশক্তিবাদের ভিত্তির উপরে দশমহাবিদ্যার কল্পনা করিয়াছে এবং নবপত্রিকার জন্মোৎসবকে দুর্গোৎসবে পরিণত করিয়াছে সে, ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া পারিবে না।

আবার কি শুধু দেশমাতৃকার ধ্যানমূর্ত্তিই প্রকাশ করিয়াছেন ? প্রতীকে প্রাণপ্রতিষ্ঠার, বিগ্রহকে জাগ্রত করিবার, দেবতার সাক্ষাৎ দর্শন পাইবার, বীজমন্ত্রস্বরূপ, মাতৃযজ্ঞের উদ্‌গীথ-স্বরূপ, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রও দান করিয়াছেন।

বঙ্কিম যে অন্তরের কতবড় প্রেরণামূলে এই মহাসঙ্গীত রচনা করেন তাহার কোন পরিচয় তিনি রাখিয়া যান নাই ; শুধু এই কথা শুনা যায় যে তাঁহার কন্যাকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন "বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখিবে এই গান লইয়া বাঙ্গলা উন্মত্ত হইয়াছে—বাঙ্গালী মাতিয়াছে"*। আরও জানা যায় তাঁহার সহযোগী সাহিত্যিকদিগের মধ্যে কেহ যখন এই মিশ্র ভাষায় রচিত গানের মাধুর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন তখন তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, 'তোমার ইচ্ছা না হয় পড়িও না বা গাহিও না'। 'বন্দে মাতরম্' গানের অমোঘশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও ইহার প্রতি যাঁহারা বিদ্বেষ বা অনাদর প্রকাশ করেন বা সে বিদ্বেষের প্রতি যাঁহারা সহানুভূতিসম্পন্ন, বাঙ্গালীর মুখপাত্রেরা অবশ্যই সে আপত্তি-কারীদিগকে বলিতে পারেন সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করা চলে, মন্ত্রের নহে, অতএব তোমাদের ইচ্ছা না হয় গাহিও না। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ব্যতীত তুমি যদি দেশমাতৃকার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে, তাঁহার জন্য শ্রেষ্ঠ ত্যাগস্বীকারের প্রেরণা ও আনন্দ-

---

* শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বঙ্কিম কাহিনী' ৫২ পৃঃ।

পরিস্থিতি প্রভাবে আত্মঘাতী বিদ্রোহের যে ধ্বংসবার্ত্তা ছন্দিত বা রুদ্ররূপ প্রকটিত, 'বন্দে মাতরম্' গানে তাহার কোন আভাসই নাই। ইংরেজ ভাষাতত্ত্ববিদেরা বিদ্বেষ বা আশঙ্কায় যতই বলুন না কেন 'বন্দে মাতরম্' মা কালীর আবাহন গান,* প্রত্যুত ইহাতে নৃমুণ্ডমালিনী রুদ্রাণীকে জাগ্রত করিবার কোন অভিপ্রায় নাই। গ্রন্থের বর্ণনা এই যে একটি খণ্ডযুদ্ধের অবসানে সমস্ত বৈরিতা পরিহার করিয়া, ভবানন্দ 'চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের মত' প্রশান্তচিত্তে ও আনন্দোচ্ছল অশ্রুসিক্ত হইয়া গাহিতেছেন—

'বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্রজোৎস্নাপুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদল-শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।'

* "According to Dr. G. A. Grierson (The Times, Sept. 12, 1906) *it can have no other possible meaning* than an invocation of one of the 'mother' goddesses of Hinduism, in his opinion Kali 'the goddess of death and destruction'." (Encyclopædia Britannica, 11th Edition, Vol. VI) এই দৃঢ় মন্তব্যকে কিছু নরম করিয়া উক্ত মহাকোষের চতুর্দ্দশ সংস্করণের ৩য় খণ্ডের ৩২৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে "The words Bande Mataram" Hail to thee, Mother "*are usually held* to be an invocation to Kali, the goddess of death and destruction". কেন না "The poet sings the praise of the

এ পর্য্যন্ত মায়ের ক্ষুধাতৃষ্ণাহরা, নয়নমনভুলানো, রূপরসগন্ধ-শব্দাত্মক প্রকৃতির বর্ণনা। মায়ের বাহ্য সৌন্দর্য্যের অধিক যদি প্রবুদ্ধ সন্তানের চক্ষে প্রতিভাত না হইত তাহা হইলে এইখানেই গানের শেষ হইতে পারিত। কিন্তু শক্তিসাধকের নিকট তাঁহার শক্তিরূপ অপ্রকাশ থাকিতে পারে না, কাজেই পরবর্ত্তী শ্লোক দুইটিতে মায়ের সন্তানশক্তির প্রাচুর্য্য-বর্ণনা আসিয়া পড়িয়াছে—

'সপ্তকোটী-কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটী ভুজৈর্ধৃত খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে !
বহুবলধারিণীম্
নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীম্
মাতরম্।'

কিন্তু 'এহো বাহ্য আগে কহ আর'। কাজেই ইহার পরে আসিতেছে, আর প্রত্যক্ষের নহে, অপরোক্ষানুভূতির কথা—

'Mother', as Lachmi bowered in the flower that in the water grows, but he also praises her as Durga bearing ten weapons." মহাকোষের এই লেখকটি যে হিন্দুর দেবতত্ত্বে ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে—উভয় বিষয়েই মহাপণ্ডিত তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যখন তিনি অব্যবহিত পরেই লিখিয়াছেন: "In his earlier years Bankim Chandra served his apprenticeship in literature under Iswar Chandra Vidyasagar, the chief poet and satirist of Bengal during the earlier half of the 19th century."

'তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।'

অর্থাৎ তুমি পরমা বিদ্যা, শ্রেষ্ঠজ্ঞান, তুমি জাতির ধর্ম্ম ('ethos of the people'), তুমি অন্তরের অন্তরতম বস্তু—স্ব-স্বরূপা। তুমি সর্ব্বদেহব্যাপী প্রাণবায়ু, তুমি বাহুতে উপলব্ধ শক্তি, হৃদয়ে উৎসারিত ভক্তি, এবং ভক্তিনিবেদন গ্রহণ করিবার জন্য মন্দিরে মন্দিরে উপাস্য দেবতা। আবার দেশকালে পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিরও অতীত, সাধকের ধ্যানায়ত্ত ত্রিশক্তি—

'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাম্।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।'

শক্তি প্রার্থনায় দুর্গারূপে, সম্পদ্ প্রার্থনায় লক্ষ্মীরূপে, বিদ্যা কামনায় বাগ্‌দেবীরূপে তোমারই পূজা করি। অতএব হে

ঐশ্বর্য্যময়ী, অপাপবিদ্ধা, অতুলনীয়া দেশমাতৃকা তোমায় নমস্কার করি—বার বার নমস্কার করি। তুমি যেমন শ্যামল, তেমনই সরল, তেমনই সুহাস ও সালঙ্কারা, তুমি জগৎপালিনী—তোমায় নমস্কার।

অতএব ইহা সহজেই বুঝা যায় যে গানের পঞ্চম শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া শেষের শ্লোকগুলি সমস্তই বাদ দিলে যে ভক্তিবাদ 'বন্দে মাতরম্' গানের প্রাণ, আনন্দমঠে প্রচারিত স্বদেশসেবাধর্ম্মের কার্য্যকরী শক্তি ( active principle ) তাহারই অপহ্নব ঘটে। যাঁহারা ভারতীয় শক্তি উপাসনার বা ভক্তিবাদের ধার ধারেন না, তাঁহারা সহজেই ঐ শ্লোকগুলি পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু যে মাতৃসন্তান স্বদেশকে বিশ্বাত্মার বিশিষ্ট নামরূপ বলিয়া গ্রহণ করিবে, দেশপ্রীতিকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মানিবে, 'বন্দে মাতরম্'কে একটি গানমাত্র মনে না করিয়া মন্ত্রবুদ্ধিতে দেখিবে, মাতৃসেবায় উহা তাহার সাধনার অবলম্বন, সিদ্ধির সহায়, বলিয়া মনে করিবে, সে এই মাতৃস্তোত্রের প্রাণান্তকর অঙ্গহানিতে সম্মত হইবে কেন? যাঁহাদের পরমপিতা স্বর্গস্থ, যাঁহাদের প্রভু জগৎ ছাড়া মহত্ত্বে বিরাজ করেন, আর যাঁহারা একেবারে বিশ্বাত্মায় বসতি করেন অথবা ধর্ম্মের নামমাত্রেই শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা স্বদেশপ্রীতিকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কাজেই জন্মভূমিকে 'তুমি ধর্ম্ম' বলিতে তাঁহাদের বাধিতে পারে। কিন্তু বঙ্কিমের সম্যগ্ দৃষ্টি তথাকথিত পৌত্তলিক হিন্দুদের সে

দ্বিধা ঘুচাইয়া তাহাদের স্বদেশপ্রীতি ও ভগবৎপ্রীতিকে অদ্বৈতশক্তিবাদের হেমশৃঙ্খলে চিরদিনের মত বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছে। মাধুর্য্যরসলিপ্সু কবি যেমন বলেন—

"যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভ'রে দিলে
এমন গানে গানে।
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা
কেন দখিন-হাওয়া গোপন কথা
জানায় কানে কানে ?"

তেমনই বাৎসল্যরসপিপাসু সন্তান বলিবেঃ কি হইবে মায়ের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সুষমায়, মলয়বীজনে, বা জ্যোৎস্নাধারা-বর্ষণে অথবা ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভায় ? কি হইবে তাঁহার সন্তানের বা আমাদের সংখ্যাগুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, এমন কি মাতৃদত্ত শক্তি ও ভক্তি অনুভব করিয়া, যদি সে ভক্তির উপচয়ে বিশ্বমাতার সহিত দেশমাতৃকার একাত্মতা উপলব্ধি করিয়া মন্দিরে মন্দিরে পীঠে পীঠে তাঁহার বিগ্রহমূর্ত্তি প্রকটিত দেখিতে না পাই, যদি তাঁহাকে সকলদুর্গতিনাশিনী, নিখিলঐশ্বর্য্যশালিনী, ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনী রূপে অঙ্গীকার করিতে না পারি এবং অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সহিত একাত্মতাসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে না পারি ? এমন ভক্তিলাভ যদি না হইল যাহাতে জন্মভূমিরূপিণী মা পরমার্থ বা সকল সাধনার সাধ্য

হইতে পারেন, তবে দেশমৃত্তিকা বা ভৌগলিক দেশটিকে 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি' বা 'সারে জেহানমে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা' বলিয়া compliment দিয়া তাঁহার কতটুকু সম্বর্দ্ধনাই বা করা হইবে ?

কিন্তু সাহিত্যানুরাগী পাঠক বলিবেন এসব ত তত্ত্বকথা উপন্যাসের সার্থকতা কোথায় ? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, মুখবন্ধে গ্রন্থের মর্ম্মবাণী স্মরণ রাখিয়া যদি আমরা উপন্যাসখানি পাঠ করি তবে কোন তত্ত্বকে বঙ্কিম রসরূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব এবং রসরচনা হিসাবেও ইহার প্রভূত সার্থকতা উপলব্ধি করা যাইবে। নতুবা আনন্দমঠ হইবে একটি বিশিষ্ট যুগের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সমৃদ্ধ কবিকল্পনার লীলারঞ্জিত একটি ব্যর্থ সন্ন্যাসি-বিদ্রোহের আখ্যায়িকা বা মহেন্দ্র-কল্যাণীর ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের বা জীবানন্দশান্তির অসিধার ব্রতের কাহিনী।

কিন্তু আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় যে ততোধিক বস্তু, তাহার বাণী যে অনেক উচ্চতর সুরে বাঁধা, তাহা উপন্যাসখানির সম্বন্ধে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিলেই আমরা সহজে বুঝিতে পারি। প্রশ্নটি হইতেছে আনন্দমঠের এমন নায়ক বা নায়িকা কে যাঁহার কেন্দ্রস্থ আকর্ষণে সকল পাত্রপাত্রীর গতিচ্ছন্দঃ নিয়ন্ত্রিত, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র গল্পধারা প্রবাহিত এবং যাঁহার শুভাশুভ পাঠকের সুখদুঃখ বা কামনাবেদনার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে ?

## মহেন্দ্র ও কল্যাণী ?

আনন্দমঠের আরম্ভে আমরা মহেন্দ্র, কল্যাণী ও তাহাদের শিশু-কন্যার সাক্ষাৎ পাই। সম্ভ্রান্ত পরিবার, নিদারুণ অভাবের তাড়নায় স্বগ্রাম ও স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া পথ হাঁটিয়া নগরে যাইতে পথিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কল্যাণী ও তাহার কন্যা অনশনে উন্মত্ত নরমাংসলোভী দস্যুদিগের হস্তে পড়িয়াও ঘটনাতরঙ্গে আনন্দারণ্যের কূলে গিয়া আশ্রয় লাভ করিল। মহেন্দ্রও পৃথক্ তরঙ্গশীর্ষে সেখানে আসিয়া পড়িল। কিন্তু মিলনে বিধি হইলেন বাদী। মাতৃমূর্ত্তি দর্শনের ফলে এবং সত্যানন্দের প্রভাবে মহেন্দ্র 'সন্তান' ধর্ম্ম অর্থাৎ মাতৃসেবায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে উৎসুক হইলেন, কিন্তু স্ত্রী ও কন্যাকে সে দুর্দ্দিনে কোথায় বা কাহার নিকট রাখিবেন। কল্যাণী স্বপ্নে ভগবানের আদেশ পাইলেন স্বামীর মাতৃসেবার অন্তরায় হইও না, 'স্বামী ছাড়িয়া আমার কাছে এস', 'আমি স্বামী, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি কন্যা'। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে—পারিবারিক জীবনে—গৃহীর জীবনে—এ কি সমস্যা ? মহেন্দ্র 'বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত,' কল্যাণী ত কোন পথই দেখিতে পাইল না, সে সন্তানের জননী, গৃহলক্ষ্মীর শিক্ষাই তাহার আয়ত্ত, শান্তির মত পুরুষোচিত শিক্ষা বা অভ্যাস জীবনে কোন দিন তাহার অর্জ্জন করিবার কারণ হয় নাই। কাজেই সে যখন বুঝিল মহেন্দ্রের মহাব্রতপালনে তাহার সহযোগিতার স্থান নাই, স্থানান্তরে থাকিবারও উপায় নাই, তখন আপনাকে

লুপ্ত করিয়া মহেন্দ্রকে মুক্তি দেওয়াই তাহার কর্ত্তব্য মনে হইল। বাঙ্গালী হইলেও হিন্দুর মেয়ে সেকালে যে মরিতে জানিত না তাহা নহে, কিন্তু সে মরা বিরোধের মরা নহে—বিশ্বাসের মরা, জাতিবৈরের মরা নহে—আত্মসম্ভ্রম রক্ষার জন্য মরা, uniform পরিয়া উন্মাদনার মরা নহে—জীবনের শেষ কর্ত্তব্য ধারণায় দৃঢ়নিষ্ঠায় মরা। তেমন মরার প্রয়োজন হইতে পারে মনে করিয়াই ত কল্যাণী বিষের কৌটা সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু শিশু সুকুমারীর কি হইবে? কাজেই অসাবধানে ন্যস্ত কৌটা খুলিয়া গিয়া তাহার বিষের বড়ি মুখে পূরিয়া সুকুমারী যখন পথ দেখাইল, তখন তাহার মুখের বড়ি কাড়িয়া লইয়া নিজের মুখে পূরিয়া মৃত্যুপথে অগ্রবর্ত্তী হইতে কল্যাণীর আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইল না। এমন অবস্থায় মহেন্দ্র সিপাহীদিগের হস্তে বন্দী হইল। যদিও কল্যাণী ও সুকুমারী পরে বাঁচিল এবং মহেন্দ্রও মুক্তি পাইল, তবুও তাহারা দূরান্তরিত হইয়া রহিল। যতদিন না দেশমাতৃকার উদ্ধার হয় ততদিন গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক সন্তানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মহেন্দ্র স্বধামে দেশের কার্য্যে নিযুক্ত রহিল, আর কল্যাণী দূর নগরে, আর তাহার কন্যা তৃতীয় স্থানে, অবস্থান করিতে লাগিল। আনন্দমঠের ঘটনাধারা যেন তাহাদের বিভিন্ন সৈকতে তুলিয়া দিয়া বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিত হইয়া চলিল। গল্পশেষে মহেন্দ্র ও কল্যাণী আবার মিলিত হইল বটে, কিন্তু গ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা

ঘটনাবহুল অংশে তাহাদের আর দেখা নাই। কল্যাণী একবার দেখা দিলেও সে তাহার অবিচল পাতিব্রত্যে ভবানন্দের অধঃপতন প্রস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য। নতুবা আরম্ভে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা ও সন্তানধর্ম্মের কঠোর সাধনা ও দীক্ষার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া ব্যতীত আনন্দমঠের গল্প তাহাদের আশ্রয় করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। অতএব তাহারা উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা নহে।

অবশ্য এই কথা বলিয়া আমরা কল্যাণীচরিত্রের মাধুর্য্য ও গৌরব যে উপেক্ষা করিতেছি তাহা নহে। বঙ্কিম কল্যাণীকে বাঙ্গলার কল্যাণী সম্প্রদায়ের প্রতিভূ বা প্রতিচ্ছবি হিসাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন। এই যে প্রেমবাৎসল্যপরায়ণা সর্ব্বাবস্থায় স্বামী ও সন্তানের কল্যাণচিকীর্ষু, যুদ্ধবিগ্রহে অপটু, কিন্তু আত্মত্যাগে অকুণ্ঠিত, গৃহলক্ষ্মীর চিত্র—এই চিত্রের চিরন্তন সৌন্দর্য্য পাছে আমরা কোন দিন ভুলিয়া যাই, পাছে আপদ্ধর্ম্মকে সনাতন বলিয়া ভুল করি, তাই যেন ইহাকে গ্রন্থের প্রস্তাবনা স্বরূপে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তদনন্তর আনন্দমঠের দুর্দ্দিনের বিশেষ দ্বন্দ্বকাহিনী বর্ণনায় গ্রন্থকার অগ্রসর হইয়াছেন। আর, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মত দুর্দ্দিনে বাঙ্গালী অন্নহারা হইয়াও যে লক্ষ্মীছাড়া হয় নাই তাহার নিদর্শন হিসাবেও যেন কল্যাণীর সৃষ্টি ও অবতারণা। সে নিজে না খাইয়া সন্তান ও স্বামীর ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, অনশনে বা অর্দ্ধাশনে ক্ষীণ, তবু সন্তানের

বিপদ্ সম্ভাবনায় তাহাকে বুকে করিয়া ছুটিতে গিয়া শারীরিক অপটুতায় ও প্রবল আবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, জ্ঞানোদয়ে ভূলুণ্ঠিতার প্রথম চিন্তা সন্তান ও স্বামী, সন্তান ও স্বামীকে ছাড়িয়া সে বৈকুণ্ঠেও যাইতে চাহে না অথচ স্বামীকে 'সন্তান'-ধর্ম্মাচরণে উৎসাহিত করে এবং জাতীয় সংস্কৃতির এমনই 'কুফল' যে আপনাকে অপসারিত করিয়াও স্বামীকে কর্ত্তব্য পথে বা বৃহত্তর জীবনে অগ্রসর করিয়া দিতে চাহে; আর, জীবনের চেয়েও সে ধর্ম্ম বড় বলিয়া মানে, সে কারণে জীবন-দাতাকেও ধর্ম্ম বিকাইতে প্রস্তুত নহে। তাহার প্রেমবাৎসল্যও ধর্ম্মনিষ্ঠার সম্মুখে কত ছোটই না হইয়া গিয়াছে তথাকথিত বীরধর্ম্ম ও নিষ্ঠাহীন স্বদেশপ্রীতি! যে জ্ঞান মানুষকে চিত্তসংযম শেখায় না, সেই পুঁথীগত জ্ঞানের মুখে সে কি পদাঘাত যখন তাহার নিকট হইতে ভবানন্দের শুনিতে হইল 'আপনার মত পণ্ডিতও যখন মহাপাপিষ্ঠ তখন লেখাপড়া না করাই ভাল'![1]

কিন্তু তবু বলিতে হইবে কল্যাণীচরিত্র যত মনোজ্ঞ চরিত্রই হোক, মহেন্দ্রের 'সন্তান' সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার প্রথম অন্তরায় স্বরূপে এবং পরে ভবানন্দের মোহসৃষ্টি করিয়া সে মোটের উপর আনন্দমঠের সমস্যাসৃষ্টি ও শক্তিক্ষয়ই করিয়াছে। অতএব সে উপন্যাসের নায়িকা নহে।

---

১ ৩।৪।৮৭ পৃঃ।

## সত্যানন্দ ও ভবানন্দ ?

সত্যানন্দ আনন্দমঠের মঠাধ্যক্ষ ও সঙ্ঘগুরু। তিনি নিজে সুসংযত সাধক, দেশমাতৃকা তাঁহার ভক্তিপূত ধ্যানে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। বৈষ্ণবী শক্তিবাদের ভিত্তিতে বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্ম্মের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া লইয়া তিনি 'সন্তান'দিগকে মাতৃসেবায় দীক্ষিত করিয়াছেন। কিন্তু নিজের ঐকান্তিক মাতৃভক্তিতে আর সকলকে নিঃশেষে ডুবাইতে পারিয়াছেন কই? সকলকে দূরের কথা, তাঁহার বামহস্ত ভবানন্দ, দক্ষিণহস্ত জীবানন্দের মধ্যে এত চরিত্রগত দুর্ব্বলতা রহিল কিরূপে? তিনি খুব সতর্ক নেতা, সকলেরই দোষত্রুটির সংবাদ রাখেন, কিন্তু ব্রতভঙ্গকারীকে উরগক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় ত্যাগ করিবার শক্তি তাঁহার কোথায়? তিনি 'সন্তান' সকলকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষিত করিতেছেন, স্ত্রী-পুত্র গৃহধর্ম্ম-ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইতেছেন, কিন্তু শান্তিকে সঙ্ঘে স্থান দিলেন শুধু তাহার শক্তি পরীক্ষা করিয়া, যেন জীবানন্দকে হাতে রাখার জন্য বা হারাইবার আশঙ্কায়। ফলে Thomas সাহেবের দল যখন সন্ন্যাসীদের অতি নিকটে ঘুরিতেছে, 'একটা ঘোরতর যুদ্ধের আর বিলম্ব নাই', তখন জীবানন্দ লতাকুঞ্জে সারঙ্গে সুরসংযোগ করিতেছেন। সত্যানন্দ নিজে নিষ্কাম, বিদ্রোহ জয়যুক্ত হইলে তিনি বিজয়মুকুট চাহেন না, কিন্তু তাঁহার নিষ্কামতার কোন ধারই তাঁহার সৈন্যেরা ধারে না। Thomas এর সৈন্যদলের পরাজয়ের পরে "নগর

অধিকার” পড়িয়া রহিল, 'সন্তান' সৈন্যেরা গ্রাম লুঠিতে ব্যাপৃত হইল! যাঁহার অক্ষম নেতৃত্বে আনন্দমঠের প্রচেষ্টা, বাহ্যদৃষ্টিতে ক্ষণিক সফলতা লাভ করিলেও বাস্তবিক বিড়ম্বিত ও ব্যর্থ হইয়াছে, নায়কত্বের গৌরব তাঁহার প্রাপ্য হইবে কিরূপে? প্রত্যুত আনন্দমঠের missionএর তুলনায় তিনি যোগ্য মঠাধীশ কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

আর ভবানন্দ? যেমন বীর তেমনই কৌশলী। যেমন পণ্ডিত, তেমনই ভাবুক, দেশমাতৃকার দুঃখস্মরণে তাহার চোখে অশ্রু ফুঠিয়া উঠে। কিন্তু কল্যাণীকে দেখিবামাত্র রূপের নেশায় যাহার মহাব্রত ভাঙ্গিয়া গেল তাহার সাধনেরই বা দৃঢ়তা কোথায়, আর দেশমাতৃকার প্রতি তাহার ভক্তিই বা কেমন ঐকান্তিক? প্রায়শ্চিত্ত মানত করিয়া রাখিলে বা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে জীবন দান করিলে না হয় বীরত্বের অভিনয় করা যাইতে পারে, দেশাত্মতা লাভ বা দেশমাতৃকার সেবা সত্য হইবে কেমন করিয়া? তবে নাকি কল্যাণীর মত রূপরাশি কখন চক্ষে দেখিবেন জানিলে তিনি সন্তান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন না।* ইহা যদি কুসুমশরাহতের প্রলাপ বা 'উপচারপদম্' না হয়, প্রকৃত কথা হয়, তাহা হইলে ভবানন্দ ঠাকুর নিতান্তই গোড়ায় গলদ করিয়াছেন মনে হয়। যাহা হোক, তিনি যখন মহাব্রতধারী পরিচয়েই চলিয়াছেন তখন তাঁহার সম্বন্ধে কল্যাণীর উক্তি 'ব্রতচ্যুত অধর্ম্মী বলিয়া মনে রাখিব' সকল

* ৩।৪।৮৯ পৃঃ।

### সত্যানন্দ ও ভবানন্দ ?

সত্যানন্দ আনন্দমঠের মঠাধ্যক্ষ ও সঙ্ঘগুরু। তিনি নিজে সুসংযত সাধক, দেশমাতৃকা তাঁহার ভক্তিপূত ধ্যানে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। বৈষ্ণবী শক্তিবাদের ভিত্তিতে বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্ম্মের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া লইয়া তিনি 'সন্তান'দিগকে মাতৃসেবায় দীক্ষিত করিয়াছেন। কিন্তু নিজের ঐকান্তিক মাতৃভক্তিতে আর সকলকে নিঃশেষে ডুবাইতে পারিয়াছেন কই? সকলকে দূরের কথা, তাঁহার বামহস্ত ভবানন্দ, দক্ষিণহস্ত জীবানন্দের মধ্যে এত চরিত্রগত দুর্ব্বলতা রহিল কিরূপে? তিনি খুব সতর্ক নেতা, সকলেরই দোষক্রটির সংবাদ রাখেন, কিন্তু ব্রতভঙ্গকারীকে উরগক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় ত্যাগ করিবার শক্তি তাঁহার কোথায়? তিনি 'সন্তান' সকলকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষিত করিতেছেন, স্ত্রী-পুত্র গৃহধর্ম্ম-ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইতেছেন, কিন্তু শান্তিকে সঙ্ঘে স্থান দিলেন শুধু তাহার শক্তি পরীক্ষা করিয়া, যেন জীবানন্দকে হাতে রাখার জন্য বা হারাইবার আশঙ্কায়। ফলে Thomas সাহেবের দল যখন সন্ন্যাসীদের অতি নিকটে ঘুরিতেছে, 'একটা ঘোরতর যুদ্ধের আর বিলম্ব নাই', তখন জীবানন্দ লতাকুঞ্জে সারঙ্গে সুরসংযোগ করিতেছেন। সত্যানন্দ নিজে নিষ্কাম, বিদ্রোহ জয়যুক্ত হইলে তিনি বিজয়মুকুট চাহেন না, কিন্তু তাঁহার নিষ্কামতার কোন ধারই তাঁহার সৈন্যেরা ধারে না। Thomas এর সৈন্যদলের পরাজয়ের পরে "নগর

অধিকার” পড়িয়া রহিল, ‘সন্তান’ সৈন্যেরা গ্রাম লুঠিতে ব্যাপৃত হইল! যাঁহার অক্ষম নেতৃত্বে আনন্দমঠের প্রচেষ্টা, বাহ্যদৃষ্টিতে ক্ষণিক সফলতা লাভ করিলেও বাস্তবিক বিড়ম্বিত ও ব্যর্থ হইয়াছে, নায়কত্বের গৌরব তাঁহার প্রাপ্য হইবে কিরূপে? প্রত্যুত আনন্দমঠের missionএর তুলনায় তিনি যোগ্য মঠাধীশ কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

আর ভবানন্দ? যেমন বীর তেমনই কৌশলী। যেমন পণ্ডিত, তেমনই ভাবুক, দেশমাতৃকার দুঃখস্মরণে তাহার চোখে অশ্রু ফুটিয়া উঠে। কিন্তু কল্যাণীকে দেখিবামাত্র রূপের নেশায় যাহার মহাব্রত ভাঙ্গিয়া গেল তাহার সাধনেরই বা দৃঢ়তা কোথায়, আর দেশমাতৃকার প্রতি তাহার ভক্তিই বা কেমন ঐকান্তিক? প্রায়শ্চিত্ত মানত করিয়া রাখিলে বা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে জীবন দান করিলে না হয় বীরত্বের অভিনয় করা যাইতে পারে, দেশাত্মতা লাভ বা দেশমাতৃকার সেবা সত্য হইবে কেমন করিয়া? তবে নাকি কল্যাণীর মত রূপরাশি কখন চক্ষে দেখিবেন জানিলে তিনি সন্তান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন না।* ইহা যদি কুসুমশরাহতের প্রলাপ বা ‘উপচারপদম্’ না হয়, প্রকৃত কথা হয়, তাহা হইলে ভবানন্দ ঠাকুর নিতান্তই গোড়ায় গলদ করিয়াছেন মনে হয়। যাহা হোক, তিনি যখন মহাব্রতধারী পরিচয়েই চলিয়াছেন তখন তাঁহার সম্বন্ধে কল্যাণীর উক্তি ‘ব্রতচ্যুত অধর্ম্মী বলিয়া মনে রাখিব’ সকল

* ৩।৪।৮৯ পৃঃ।

পাঠকই ত যথার্থ বলিয়া প্রতিধ্বনি করিবে। এমন চরিত্রকে আনন্দমঠের উপনেতৃপদই বা দিবে কে? আর তাহার প্রাণত্যাগে কাহারই বা গুরুতর আক্ষেপ উপস্থিত হইবে?

জীবানন্দ ও শান্তি?

জীবানন্দ ও শান্তি আনন্দমঠের অনেকখানি অধিকার করিয়াছে এবং গ্রন্থকারও জীবানন্দ ও শান্তির মত দেশ-মাতৃকার সুসন্তান যাহাতে যুগে যুগে ফিরিয়া আসে তাহার প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু শান্তির মত সহধর্ম্মিণী না থাকিলে জীবানন্দ গোঁসাইজীর দ্বারা সন্তানধর্ম্ম রক্ষা বা অসিধার ব্রতপালন কতদূর সম্ভব হইত বলা কঠিন।[১] তবে শান্তি যে সুসংযত প্রেমশক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহাতে সে আদর্শ নারী-চরিত্র বটে। গ্রন্থকার তাহার চরিত্রের অনন্যসাধারণতা,, তাহার শৈশবে মাতৃবিয়োগ, তাহার পিতার টোলের ছাত্রদের নিত্যসহচররূপে ছেলের মত বাড়িয়া ওঠা, বিবাহের পরে শ্বশুরালয়ে গৃহস্থবধূর সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে অপ্রীতির জন্য তাহার শ্বশুরালয় ত্যাগ, সন্ন্যাসিদলের সহিত থাকিয়া তাহার অস্ত্রশিক্ষা, 'ব্যায়ামাদির দ্বারা পুরুষের দুর্লভ' বললাভ ও অবিচল সংযমনিষ্ঠা প্রভৃতি প্রাক্তন কাহিনীর উপর গড়িয়া তুলিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন সন্দেহ নাই।[২] তাহাতে ক্যাপ্টেন টমাস ও মেজর এড্ওয়ার্ডস্‌এর সহিত নির্ভয়ে

১ কঠিনই বা কেন? ২।৮।৭১ পৃঃ দ্রষ্টব্য

২ ২।১ পৃঃ।

রহস্যালাপ ও লিণ্ড্লের অশ্বপৃষ্ঠে অকস্মাৎ উঠিয়া পড়িয়া তাহাকে ফেলিয়া দিয়া অশ্ব ছুটাইয়া পলায়ন ইত্যাদি বিশ্বাসের বহির্ভূত বিষয় না হইয়া সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শান্তি সন্তান-সম্প্রদায়ের অগ্রণীদের অন্যতম হইলেও সে যে সন্তানধর্ম্ম-পালন উদ্দেশ্যে কতটা কাজ করিয়াছে না করিয়াছে তাহা বলা কঠিন। বরং তাহার সকল কাজই সহধর্ম্মিণী হিসাবে, স্বামিপ্রীতিমূলেই করা, মুখ্যতঃ দেশপ্রীতিমূলে হয়ত নয়, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। জীবানন্দের ব্রতভঙ্গের কারণ হইয়া শান্তি যখন বুঝিল জীবানন্দ তাহার প্রতি অনুরাগ বহন করিয়াই আসিতেছে, আর স্বামীর জীবন সে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে, তখন তাহার পূর্ব্বতন শিক্ষা ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহার কর্ত্তব্য অন্যরূপ স্থির করিল। 'রমণীতে নাহি সাধ রণজয় গাওরে' বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল বটে, কিন্তু ঠিক অর্থাৎ ষোল আনা রণোন্মাদনায় নহে। স্বামী যে 'অতিশয় গুরুতর ধর্ম্ম গ্রহণ' করিয়াছেন 'সেই ধর্ম্মের সহায়তার জন্য', আর তাঁহার নিকটে থাকিয়া প্রতিশ্রুতিভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত নিবারণের গূঢ় উদ্দেশ্যেও বটে। সত্যানন্দ যখন তাহাকে নারী বলিয়া চিনিতে পারিয়া বলিলেন 'জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ', শান্তি তখন যে বলিল 'আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ব্রহ্মচারিণী, প্রভুর

কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্য আসিয়াছি, স্বামিদর্শনের জন্য নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় কাতর নহি। স্বামী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন আমি তাহার ভাগিনী কেন হইব না? তাই আমি আসিয়াছি।'[১] তাহা মঠে আসার কৈফিয়ৎ হিসাবে সত্য হইলেও বিরহে সে যে কাতর নহে এমন কথা বলা যাইবে কেমন করিয়া? সে ত নিজেই জীবানন্দকে বলিবে 'দুই জনে একত্র ধর্ম্মাচরণ করিব বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া বনে বাস করিতেছি'।[২] আর যে সত্যানন্দ একদিন শান্তিকে সন্দেহ করিয়া তাহাকে আনন্দমঠে প্রবেশাধিকার দিতে চাহেন নাই, তিনি যখন জীবানন্দের উপরে তাহার প্রভাব দেখিয়া জীবানন্দের আত্মবিসর্জ্জনে বাধা দিবার জন্য তাহাকে কাতর অনুরোধ করিতেছেন, তখন শান্তি হাস্য-সম্বরণ করিয়া যতই তাঁহাকে বলুক 'মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না' [৩], সে যে তৎপূর্ব্বে জীবানন্দকে প্রায়শ্চিত্ত না করিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াছে তাহা ত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদের অন্তে বর্ণিত শান্তি জীবানন্দের কথোপকথনেই প্রকাশ।[৪] ফল আনন্দমঠে প্রবেশলাভের জন্য তাহার 'সফল আশার' যাত্রায়, স্বামীর সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষায়, বার বার জীবানন্দকে মৃত্যু-সঙ্কল্প পরিহার করিবার অনুরোধে,

---

১ ২।৭।৭৩ পৃঃ। ২ ৩।৩।৮৪ পৃঃ।
৩ ৩।৭।৯ পৃঃ। ৪ ৩।৩।৮৪ পৃঃ।

জীবানন্দের মৃত্যুবরণে সাধারণ গৃহস্থ রমণীর ন্যায় শোকাকুল ক্রন্দনে,[১] মহাপুরুষের কৃপায় জীবানন্দের জীবন-লাভের পরে তাহাকে সন্তান-ধর্ম্মত্যাগে প্রবোধ দিয়া সংসারাতীত নবজীবনের পথে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়ায়, আমরা শান্তির মধ্যে আনন্দমঠের পতাকা-বাহিনীর অপেক্ষা জীবানন্দের সাধ্বী সহধর্ম্মিণীরই পরিচয় বেশী পাই।

কিন্তু দেশমাতৃকার আহ্বান তাহা হইলে কি শান্তির কাণে পৌঁছে নাই, তাহার মনে কোন সাড়া জাগায় নাই? পৌঁছিয়াছে, জাগাইয়াছে বৈ কি, এমন কি মাতাইয়াছে। কিন্তু জীবানন্দের মারফতে। জীবানন্দের বৃহত্তর জীবানাদর্শ তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে আর জীবানন্দের আদর্শ ও ইষ্ট সে একেবারেই আপনার করিয়া লইয়াছে। লইতে পারিয়াছে তাহার জীবনের পূর্ব্বার্দ্ধের শিক্ষা ও অভ্যাস বলে, আর দাম্পত্যজীবন যে অদ্বৈত এ ধারণা[২] বা সংস্কার তাহার অসাধারণ জীবনগতির মধ্যেও সে হারায় নাই বলিয়া। সে সংযমশক্তির সাধনা করিয়াছে কিন্তু না হইয়াছে সন্ন্যাসিনী, না করিয়াছে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব-বিকাশের চর্চ্চা বা ইংরাজীতে যাহাকে বলে differentiated personality develop করিবার চেষ্টা। কাজেই তাহার চেয়ে, তাহার ধর্ম্ম বড়, তাহার ধর্ম্মের চেয়েও তাহার 'স্বামীর ধর্ম্ম বড়',[৩] তাহার এ ধারণার কোন ব্যত্যয়

---

১ ৪।৭।১২৬ পৃঃ। ২ ৩।৭ ৩ ঐ

হয় নাই। অতএব পুনর্মিলনের দিনে জীবানন্দের আদর্শ সে যেমন সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছে, জীবানন্দের সন্ন্যাসী জীবনধারায় আপনার অকামী জীবনপ্রবাহ যেমন সম্পূর্ণরূপে মিলাইয়া দিয়াছে, তেমনই তাহাদের সম্মিলিত বা যৌথ জীবনে আনিয়া দিয়াছে আদর্শ অনুসরণের বা মহাব্রত উদ্‌যাপনের অনুকূল সাধনা, আর নারীহৃদয়ের দৃঢ়বিশ্বাস ( faith )—যে বিশ্বাসে তাহার দেহের আকুলতাও প্রার্থনার সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে—

'এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?
হরে মুরারে ! হরে মুরারে !'

বিচার-বুদ্ধি তত্ত্বের সন্ধান দিতে পারে, আদর্শের ধারণা করিতে পারে, কিন্তু সাধনশক্তি আসে আস্তিক্য হইতে, গভীর বিশ্বাস হইতে। বিশ্বাসের দৈন্য করে ভুল, দেখে প্রায়শ্চিত্তের বিভীষিকা। আর বিশ্বাসের প্রাচুর্য্য চায় আত্মপরিমার্জ্জনার সুযোগ, নিয়ত ত্যাগের আনন্দ। তাই দেখি যখন সত্যানন্দের বামহস্ত ( ভবানন্দ ) শক্তিহারা, দক্ষিণহস্ত ( জীবানন্দ ) মোহাবেশে দুর্ব্বলতার আভাস দিতেছে, তখন শান্তি অবিচল নিষ্ঠায় আনন্দমঠের অঙ্গনে ব্রহ্মচর্য্যের পবিত্রধারা প্রবাহিত রাখিতে সতর্ক ও সচেষ্ট। সে ধারার উৎস যে কেমন সরল ধর্ম্মবিশ্বাসের আনন্দলোকে অবস্থিত শান্তির নিম্নলিখিত উক্তিতে গ্রন্থকার তাহার পরিচয় দিয়াছেন। শান্তি জীবানন্দকে বলিতেছে—

'ধর্ম্মপত্নী হইয়া তোমার ধর্ম্মের বিঘ্ন করিব কেন? বিবাহ ইহকালের জন্য এবং বিবাহ পরকালের জন্য। ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর তাহা আমাদের হয় নাই * * * পরকালে দ্বিগুণ ফল ফলিবে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন? তুমি কি পাপ করিয়াছ? * * * আরও দেখ গোঁসাই, ইহকালেই কি আমাদের বিবাহ নিষ্ফল? তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, ইহা অপেক্ষা ইহকালে আর কি গুরুতর ফল আছে?"[১]

শান্তির এই উক্তিতে শুধু যে শক্তি ও বিশ্বাস স্ফুরিত তাহা নহে, ইহাতে আদর্শানুসারিণী কামনামুক্ত ভালবাসার অন্যফল-নিরপেক্ষ আনন্দের যে অভিব্যক্তি আছে তাহা প্রকৃতই অপরূপ। আর,

'ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি'[২]

বলিয়া সে কালের মহাকবি যাহা পুরাকালের ঋষির পক্ষে অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন একালের ঋষি যেন তাঁহার মানসকন্যায় তাহা সুসম্ভব করিয়াই তুলিয়াছেন।

মাধুর্য্য ও শক্তির সমাহারে, তৃষ্ণাজয়ী প্রেমের ও দেশ-সেবিকার কর্ত্তব্যপালনের দৃষ্টান্তস্বরূপে, শান্তি আনন্দমঠের অপূর্ব্ব সুন্দর চরিত্রই বটে। কিন্তু তবুও শান্তিকে যে আনন্দমঠের নায়িকা বলা যাইতে পারে না তাহার কারণ এই

---

১ ৩।৭।২৬ পৃঃ।

২ কালিদাস: 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' ১।৪৮ শ্লোক।

যে আনন্দমঠের কাহিনী ও বাণী শান্তি-জীবানন্দের জীবন-লীলার অতিবর্ত্তী। শান্তি আনন্দমঠের নায়িকা হইলে, জীবানন্দ ও শান্তির গ্রন্থোক্ত পরিণামে আনন্দমঠের আনন্দময় অবসানই হইত। কিন্তু কে বলিবে আনন্দমঠ tragedy নহে? কে বলিবে আনন্দমঠের সমাপ্তিতে যখন 'বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল' তখন এক বিজয়াদশমীর করুণ সুরে পাঠকের হৃদয় মর্ম্মরিত হইয়া উঠে না?

সে ব্যথা যাঁহার জন্য পাঠকের বুকে বাজে তিনিই আনন্দমঠের নায়িকা—দেশমাতৃকা। যাঁহার দুর্দ্দশার বর্ণনায় গ্রন্থের আরম্ভ, যাঁহার দুর্গতিমোচনের সঙ্কল্প দিয়াছে মুখ্য চরিত্রগুলির কর্ম্মপ্রেরণা, 'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি', 'বন্দে মাতরম্' যাঁহার আবাহন ও প্রণামমন্ত্র, যাঁহার ত্রিমূর্ত্তির কল্পনায় গ্রন্থের ঐশ্বর্য্য, যাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী ধ্যানমূর্ত্তি বাস্তবে পরিণত করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা গ্রন্থের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় এবং সেই প্রচেষ্টায় অমার্জ্জনীয় দুর্ব্বলতা ও মালিন্য যাঁহার আগমনীর আনন্দকে বিসর্জ্জনের অশ্রুতে পরিণত করিয়া দিল আনন্দমঠের নায়িকাপদ তাঁহারই প্রাপ্য বটে।

অতএব Victor Hugoর Ninety Threeর মত উপায়-বিশেষ উদ্দেশ্যের স্থান অধিকার করিয়া ( means end হইয়া দাঁড়াইয়া) বিপ্লব আনন্দমঠে নায়কের স্থান অধিকার করে নাই। বিপ্লব মাত্র এখানে লক্ষ্য নহে—লক্ষ্য দেশমাতৃকার দুর্গতিনাশ—প্রতিপাদ্য মাতৃযজ্ঞে সন্ন্যাসের, সর্ব্বত্যাগের, প্রতিষ্ঠা। মা-ভোলা

ছেলেকে মায়ের পরিচয় দেওয়া, দেশমাতৃকার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি উদ্দীপন করা, মাতৃসেবকের সাধনবৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করা, সে সাধনার দুর্ব্বলতার বা বিফলতার কারণ নির্দ্দেশ করা, আনন্দমঠ রচয়িতার আনুষঙ্গিক ( concomitant ) উদ্দেশ্য —বিপ্লবের চিত্র মাত্র অগ্নিবর্ণে চিত্রিত করা নহে। প্রতীক এখানে গৈরিক পতাকা, রুধিরাক্ত guillotine নহে। তাই আনন্দমঠ পাশ্চাত্যভাবে "austere" হয় নাই। "ঘন কালো background এর উপরে লাল রংএ অগ্নিকাণ্ডের ছবি" ইহাতে ফুটিয়া উঠে নাই।[১] তেমন হিংস্র নিষ্ঠুরতার বা ধ্বংসের চিত্র, আনন্দমঠের spiritual background এর সহিত, মানুষের বা দেশসেবকের অন্তর গঠনের পরিকল্পনার সহিত, খাপ খাইত না। তবে একহিসাবে কঠোরতার ( austerityর ) দাবী

---

১ 'সবুজ পত্রে'র ১৩২৬ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় আনন্দমঠের সমালোচনা প্রসঙ্গে কিরণশঙ্কর রায় বলেন "আনন্দমঠ বঙ্কিমের হাতে কঠিন নির্ম্মম হওয়া উচিত ছিল।" * * * "কিন্তু আনন্দমঠ austere হয় নি।" "ঘন কালো back ground এর উপরে রক্তের মত লাল রংএ অগ্নিকাণ্ডের ছবি আঁকা" বঙ্কিমের "উচিত ছিল," "কিন্তু আকাশের কালো রং ফিকে হওয়াতে আগুনের রং লাল না হয়ে সুখ স্বপ্নের মত গোলাপী হয়েছে।" তদ্ব্যতীত কিরণবাবু সত্যানন্দের গীতগোবিন্দ গান করা ও গীতা পড়ানর উপর যথেষ্ট কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ করিয়াছেন। কিরণবাবু যে সময়ে ঐ সমালোচনা লিখিয়াছিলেন সে সময় তিনি জানিতেন না যে অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাকে এমন এক পুরুষসিংহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে যিনি গীতগোবিন্দের যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন, আর ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ভবিষ্যৎ নেতার প্রতি-সান্ধ্য-উপাসনায় বৈষ্ণব ভজন গীত হইবে। আর লোক-মান্য তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, এবং মহাত্মা গান্ধী সকলেই যদি গীতার তত্ত্ব ব্যাখ্যায় উৎসাহবোধ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সত্যানন্দের এই অপরাধ বোধ হয় মার্জ্জনীয়।

তাঁহার কম নহে যিনি দেশ-মাতৃকার জন্য সর্ব্বত্যাগের বিধান করিয়াছেন, আর তুলি ভিজাইয়াছেন গৈরিকে। গৈরিক যদি কোথাও 'গোলাপী' হইয়া ফুটিয়া থাকে, সাধনা যদি কোথাও সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া থাকে, বা ত্যাগের সঙ্কল্প কোথাও লালসায় লুপ্ত হইয়া থাকে, সেখানেই ত ব্যর্থতার কারণ, tragedyর আভাস, সুস্পষ্ট। তাহা পরিকল্পনার অঙ্গ, রচনার বা অঙ্কনের ত্রুটি নহে। দেশের দুর্গতি মোচনে আত্মত্যাগের আনন্দ ও ব্যর্থ সাধনার বেদনা—উভয়ই পাঠকের মনে সঞ্চার করিবার শক্তিতে আনন্দমঠের কবিকল্পনার চিরন্তন সার্থকতা।

আনন্দমঠের বিরুদ্ধ সমালোচনা বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধ কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু মহাকাল তাহার জবাব দিতে দিতে চলিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর সূচনায়ও শুনা যাইত ইহা বঙ্কিমের দুর্ব্বল মস্তিষ্কের অদ্ভুত কল্পনা। গেরুয়ায় যুদ্ধ! মলের গুঁতায় ঘোড়া চালানো! আর, বাঙ্গালীর দেশকে মা বলিয়া অজ্ঞান হওয়া! সমস্তই অভাবনীয়, অসম্ভব। ১৯০৫ সালের পরে এ শ্রেণীর সমালোচনা স্তব্ধ হইয়া গেল। বাঙ্গালী দেশমাতৃকার জন্য কাঁদিল—অনেকে 'কাতরে কাঁদিল, মায়ের পায়ে দিল সকল প্রাণের কামনা!' শান্তির পায়ের মলের সমালোচনা, গৈরিকের প্রতি অশ্রদ্ধা একদিনে ঘুচিয়া গেল। বঙ্কিম শুধু 'বন্দে মাতরমে'র ঋষি বলিয়া অভিহিত হইলেন না, আনন্দমঠ সেদিনকার নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক 'বন্দে

মাতরমে'র ভাষ্যরূপে অভিনন্দিত হইল। আর, বাঙ্গালী মহাকবি সেই সাহিত্যের পক্ষে দুর্যোগের দিনে বঙ্কিমের ছন্দে শুধু গাহিলেন না—

'কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে
কে বৃথা আশাভরে চাহিছে মুখের পরে
সে যে আমার জননীরে'।

কাব্যচ্ছন্দে উপদেশও দিলেন—

'বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিও
কহিলেন গুরু রামদাস।'

তাহার পরে 'গোলাপী' 'ফিকে' (anaemic), আনন্দমঠ কত না নির্য্যাতনই সহিল, অবশ্য in the best of company শ্রীমদ্‌-ভগবদ্‌গীতার সহিত। বাঙ্গালী আনন্দমঠ ভুলিল না, বাঙ্গালী যুবক প্রতি বেত্রাঘাতে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তুলিয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে ছাড়িল না*, ভারতবাসী আনন্দমঠ মাথায় তুলিয়া লইল, কিন্তু কাব্য-সমালোচক আবার মাথা তুলিলেন, প্রচার করিলেন "ভারতবর্ষে যত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় আছে আনন্দমঠের সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় তাহার কোন আদর্শের অনুকূল নহে।" বিলাতী Lake poets দিগের Utopiaর কথা তাঁহার মনে পড়িল তবু মহারাষ্ট্রে রামদাসের শিষ্য-সম্প্রদায়ের কথা, তাঁহার 'আনন্দ বন ভুবনে'র কথা, একেবারেই মনে পড়িল না। আর যেহেতু "বাঙ্গালীর মেয়ে যে সত্যই লড়াই করিতে পারিত, পাঠানদের সহিত লড়াই করিয়াছিল, রঘু ডাকাতকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে

*"আমার বেত মেরে কি মা ভুলাবি আমি কি মা'র সেই ছেলে" ?

খবর" সমালোচক মহাশয়ের জানা থাকিলেও "তিনি (অর্থাৎ গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্র) ঠিকমত জানিতেন না"; অতএব শান্তি প্রভৃতির চিত্র "ঠিক বাঙ্গলার চিত্র নহে" "বাঙ্গলায় ফুটিবারও নহে"।[১] মহাকালই তাহার উত্তর দিয়াছেন, দিতেছেন ও দিবেন।

আরও এক কথা—সাহিত্যের দিক দিয়া বড় কথা—সমালোচক মহাশয়ের মতে আনন্দমঠে "চরিত্রোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত কথাগুলি আপনি ফুটিয়া উঠে নাই।" অথচ সেই সমালোচকপ্রবরই বলিতেছেন "বঙ্কিম আনন্দমঠের চরিত্র-চিত্রণে গোটা কয়েক কলঙ্করেখা স্পষ্ট রাখিয়াছেন। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, সমষ্টির কল্যাণ-সাধন করিতে হইলে ব্যষ্টি বা ব্যক্তি বিশেষের মুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না।" "যেন তিনি (বঙ্কিম) বাঙ্গালীকে বারবার বলিয়াছেন যে এই আদিরসের গুপ্ত পাহাড়ের সংঘাতে তোমার তন্ত্রধর্ম্ম, তোমার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম—তোমার সকল ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায়,—চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। যদি ইউরোপের আদর্শে দেশাত্মবোধের অর্ণবযান বাঙ্গলার ভাবের লহরের উপর ভাসাইতে হয়, তাহা হইলে সাবধান! আদিরসের চোরাবালির উপর, ডোবা পাহাড়ের উপর দিয়া নৌকা চালাইও না, পূর্ব্বেকার অনেক সাধের সামগ্রীর মতন উহাও

১ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' 'নারায়ণ' বৈশাখ ১৩২২, ৫৩৪-৫৩৫ পৃঃ।

ফাঁসিয়া যাইতে পারে।" সমালোচক মহাশয় যাহা বুঝিয়াছেন আনন্দমঠের হাজার হাজার পাঠক তাহাই বুঝিয়াছে—চরিত্রচিত্রণে সিদ্ধান্ত বাক্য এমনই অস্ফুট রহিয়া গিয়াছে !

পরিশেষে সমগ্র গ্রন্থের বাণী বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণার সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার—যে ভ্রান্ত ধারণার জন্য আনন্দ-মঠের নবনির্য্যাতনের দিন অখণ্ড বাঙ্গলায় কিছু পূর্ব্বে আসিয়াছিল এবং পূর্ব্ববঙ্গে কায়েমী হইয়াছে। Earl of Ronaldshay (Marquess of Zetland) পুস্তকখানি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা লিপিবদ্ধ করিবার পরে ইংরাজদিগের প্রতিকূল মতের কিছু পরিবর্ত্তন যদি বা হইয়াছিল, "over-throw of the Muslim rule" আনন্দমঠের লক্ষ্য[২] এই শ্রেণীর তাৎপর্য্য ব্যাখার ফলে সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষ হইতে গ্রন্থখানি দগ্ধ করিয়া New order বা নবতন্ত্রের সূচনা করা হইয়াছিল। অথচ সহজেই বুঝিতে পারা যায় 'এ দেশে যখন রাজা নাই। মুসলমান রাজ্য লোপ পাইয়াছে। ইঙ্গরেজ—সম্প্রতি ঢুকিতেছে তাহারা রাজ্যশাসন করিতে জানেও না, করেও না।'[৩] ফলে দেশ যখন উৎপীড়িত, অন্নহারা, আনন্দমঠ

---

১ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' 'নারায়ণ' বৈশাখ ১৩২২—৫৩৭ পৃঃ।

২ Earl of Ronaldshay : 'The Heart of Aryavarta' Ch. X. Pp. 113-114।

৩ 'দেবীচৌধুরাণী'—১।১৬।৫৮ পৃঃ।

তখন সেই দুর্গত দেশের প্রতি দেশের সন্তানের দৃষ্টি, চিত্ত, প্রীতি ও সেবা আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছে। আর, আনন্দমঠ মুক্তিসংগ্রামের গুরুত্ব ও গৌরব নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ইহাও বলিয়াছে যে, ভারতে সকলক্ষেত্রে মুক্তির সাধনায় অখণ্ড একতানতা বজায় রাখিতে হইবে। সে সাধন-পথের পাথেয় হইবে ভক্তি, সুসংযত অনন্যভক্তি কিন্তু জ্ঞানাত্মকভক্তি—এমন ভক্তি যাহা জ্ঞানকে, পরাবিদ্যাকে, সাধ্যস্বীকারে গৌরবের আসন দিবে এবং 'বহির্বিষয়ক জ্ঞান'কেও উপাদেয় মনে করিবে, যাহা ভুলিবে না—

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।[১]

আর, যে ভক্তি কর্ম্ম পরিহার করা দূরের কথা ত্যাগাত্মক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবে, কিন্তু লুঠেড়ার হেয় বৃত্তি বিমুখ করিবে।

"চিকিৎসক বলিলেন, 'সত্যানন্দ কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছে। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না।"[২]

আমরা দেখিয়াছি পরবর্ত্তী যুগে মহাত্মা গান্ধী আসমুদ্র হিমাচল এই প্রকার বাণী প্রচার করিয়াছেন।

---

১ ঈশোপনিষৎ ১।১ শ্লোক।

২ ৪।৮।১৩১ পৃঃ।

কিন্তু এযুগের সাহিত্যসমালোচক হয়ত বলিবেন ইহা উপদেশ বিতরণ—রসপরিবেশন নহে। কিন্তু বঙ্কিমের উল্লিখিত উপদেশ যে ততটা কার্য্যকর হয় নাই, পক্ষান্তরে আনন্দমঠের স্বদেশপ্রেমের মন্ত্র ও বীররসের চিত্র যে দেশমাতৃকার মুক্তি-সংগ্রামে ও সেবায় অভূতপূর্ব্ব এবং স্থায়ী উৎসাহ উদ্দীপন করিয়াছিল ইহা অপেক্ষা অধিকতর সত্যও এদেশের ইদানীন্তন ইতিহাসে আর কিছু নাই।

---

# দেবী চৌধুরাণী

# দেবী চৌধুরাণী

( ১৮৮৪* )

দেবী চৌধুরাণী বঙ্কিমচন্দ্রের আধ্যাত্মিক উপন্যাসত্রয়ের দ্বিতীয় উপন্যাস—তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব বা অনুশীলনতত্ত্বের প্রতিপাদনই নাকি এই গ্রন্থ-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, ইহা যখন রসরচনার অর্থাৎ উপন্যাসের রূপলাভ করিয়াছে তখন প্রধানতঃ উপন্যাস হিসাবে, অপূর্ব্ব চরিত্রসৃষ্টির নিদর্শন হিসাবে, আমরা ইহার আলোচনা করিব।

উপন্যাসখানির আখ্যানবস্তু হইতেছে সেকালের এক পিতৃভক্ত, বহুপত্নীক পুত্রের—ব্রজেশ্বরের—প্রথমা স্ত্রী প্রফুল্লের, সহিত বিচ্ছেদ ও মিলন। সূচনা কিন্তু সেকালের মায়ের ও মেয়ের কথোপকথনে। মেয়ের বিবাহিত জীবনের দুর্ভাগ্য-চিন্তায় মা তিক্তমনা ও কটূভাষিণী, রাধারাণীর মায়ের মত নয়। মেয়ে প্রফুল্ল কিন্তু রাধারাণী অপেক্ষা বয়স্কা, প্রাপ্তযৌবনা, সহিষ্ণু ও মিষ্টভাষিণী। গরীবের ঘরে জন্ম হইলেও প্রফুল্লের বিবাহ হইয়াছে এক প্রাচীন জমিদারের ঘরে। বিবাহ কিন্তু

---

* ১৮৮২ সালের আগষ্ট মাসে বঙ্কিম অস্থায়িভাবে যাজপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া যান। দেবী চৌধুরাণী ১২৮৯ সালের পৌষ হইতে ১২৯০ সালের মাঘ পর্য্যন্ত বঙ্গদর্শনে ক্রমশঃ প্রকাশিত হয় কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নাই। ১৮৮৪ সালে বঙ্কিম হাওড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালে ‘দেবী চৌধুরাণী’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

বিচ্ছেদে পরিণত হইয়াছে, আর বিচ্ছেদের কারণ, প্রফুল্লের মাতার কলঙ্কপ্রচার হেতু ব্রজেশ্বরের পিতার আদেশক্রমে প্রফুল্লের শ্বশুরগৃহে যাওয়া নিষিদ্ধ। দুঃস্থ, অন্নহীন, প্রফুল্ল আশ্রয় লাভের আশায় শ্বশুরালয়ে আসিয়াও স্থান পাইল না—শ্বশুর রাগের বশে বলিলেন চুরি, ডাকাতি বা ভিক্ষা করিয়া খাইতে। কিন্তু স্বামীর সহিত অতি সংক্ষিপ্ত মিলনের ফলে প্রফুল্ল ফিরিল নবজাগ্রত প্রেমের সুখস্বপ্ন লইয়া। যেকালে পিতার আদেশ নির্ব্বিচারে পালন করাই পুত্রের পক্ষে অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইত[১],

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ

---

১ শচীশচন্দ্র 'বঙ্কিমজীবনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর পিতৃভক্তির অনেক উদাহরণ দিয়াছেন ; তাহার মধ্যে পিতার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সসম্ভ্রম ব্যবহারের নিদর্শন হিসাবে নিম্নলিখিত বিবরণটি উল্লেখ করা যাইতে পারে—

"একদা বঙ্কিমচন্দ্র পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে দালানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যাদবচন্দ্র তখন নিম্নমুখে বঙ্গদর্শনের হিসাব লিখিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইলেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। মৃত্যুর কয়েক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে তিনি কাণে কম শুনিতেন। * * বঙ্কিমচন্দ্রের পদশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশলাভ করিল না। * * * বঙ্কিমচন্দ্র নীরবে, নিঃশব্দে পিতার অদূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। * * অবশেষে যাদবচন্দ্রের একজন বৃদ্ধা দাসী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঈদৃশ বিপদাপন্ন দেখিয়া হাঁসিয়া উঠিল এবং উচ্চৈঃস্বরে 'ডাকিল কর্ত্তা-মহাশয়, ও কর্ত্তামহাশয় সেজবাবু এসে দাঁড়িয়ে আছেন যে'! কর্ত্তামহাশয় তখন মাথা তুলিয়া দেখিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে * * বসিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।" অতএব ব্রজেশ্বরচরিত্র সৃষ্টি করিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে কষ্টকল্পনা করিতে হয় নাই।

কেবল মাত্র শ্রাদ্ধকার্য্যের সমাপ্তিমন্ত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই, পক্ষান্তরে সহবাস থাকুক আর নাই থাকুক, বিবাহবিচ্ছেদ ভদ্রনারীর মনে আসিত না, সমাজে অনুমোদিত হওয়া দূরের কথা, আলোচ্য বিষয় পর্য্যন্ত ছিল না—সে কালে পিতার আদেশ ও বিধানজনিত বিচ্ছেদের সঙ্কট নায়ক-নায়িকার পরস্পরের নূতন অনুভূত আকর্ষণে আরও গভীর ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়া দেখা দিল।[১] এই ঘনীভূত সঙ্কটে (deepened crisisএ) যেমন, গ্রন্থের না হোক, গল্পের আরম্ভ, তেমনই আখ্যায়িকাটির পরিসমাপ্তি ইহার মিলনান্ত সমাধানে।

কিন্তু এ মিলনস্থাপন বা বিচ্ছেদসমস্যার সমাধান বঙ্কিম কেবল বিস্ময়কর ঘটনা-পরম্পরা গ্রথিত করিয়াই করেন নাই। করিলে, তাহা বড় জোর আধুনিক ছায়াচিত্রের বিষয় হইতে পারিত, আমাদর জাতীয় সাহিত্যের এক মাধুর্য্যময়ী অথচ মহিমান্বিতা সৃষ্টিতে, পরিণত হইত না। অতএব এই গ্রন্থের নায়ক-নায়িকার অন্তরের বিবর্ত্তন বা বিকাশ তিনি কেমন করিয়া অন্ত্যমিলনের অনুকূল করিয়া তুলিয়াছেন, কেমন করিয়া সে মিলনকে এক অভাবনীয় মর্য্যাদা দান করিয়াছেন, কেমন করিয়া সাধারণ নারীর ‘কাঠামে’ দেবীপ্রতিমা গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহাই আলোচনার ও উপভোগের বিষয়।

---

১ জনৈক সমালোচক যে বলিয়াছেন ‘প্রফুল্লের জীবনসমস্যা খাঁটি আধুনিক যুগের জিনিষ’ আমাদের মতে তাহা ঠিক নহে। প্রফুল্লের জীবনসমস্যা সেকালের সামাজিক রীতিনীতি ও মনোভাব হইতে উদ্ভূত, তবে তাহার উপন্যাসবর্ণিত জীবনের বাণী চিরন্তন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রফুল্ল শ্বশুরালয়ে আশ্রয়লাভের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া ফিরিল; কিন্তু দিয়া গেল তাহার স্বামীকে এক নিষিদ্ধ ফলের, অর্থাৎ তাহার অসূয়া-বিদ্বেষহীন অপূর্ব্ব প্রেমের আস্বাদ, আর লইয়া গেল এক অনন্ত মুহূর্ত্তের পরিচয়ে চিরমিলনের আকাঙ্ক্ষা। প্রফুল্লের আত্মাভিমান ও ব্যক্তিগত অধিকারবোধ যদি আধুনিক রকমের হইত, তাহা হইলে কখনই তাহা ঘটিত না। ব্রজেশ্বরের বিচার করিয়া, তাহার পিতৃভক্তির সমুচিত দণ্ড দিয়া, অর্থাৎ এমন বাপে-পাওয়া বহুবিবাহিত অপদার্থ স্বামী ত্যাগ করাই আশু ও অবশ্য কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, চলিয়া যাইত। কিন্তু সে কালের মনোবৃত্তিতে বিরোধের সৃষ্টি না হইয়া পরস্পরের বোঝাপড়ায় ফল হইয়াছে বিপরীত। যাহারা ছিল বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত তাহারা হইল মিলনেচ্ছু বিরহী। সেই বিরহ ও মিলনাকাঙ্ক্ষা কেমন মর্য্যাদার সহিতই না তাহারা বরণ ও লালন করিল! একদিকে, পাওয়া প্রফুল্লকে হারাইয়া ব্রজেশ্বরের জীবন হইল খিন্ন ও দুর্ব্বহ, তবু পিতার প্রতি কর্ত্তব্যবোধ রহিল অটুট। অন্যদিকে, প্রফুল্ল লাভ করিল এক অদ্ভুত চরিত্র, সুপণ্ডিত, শক্তিধর ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে দশবৎসরব্যাপী ব্যায়াম ও সংযমশিক্ষা, তত্ত্বোপদেশ ও নিষ্কাম কর্ম্মে দীক্ষা[১]—তবু কিছুতে

১ বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পিত দেবীর শিক্ষা প্রণালীতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে সংযম ও অনাসক্তি অভ্যাসের সহিত দেহ, মন ও আত্মশক্তির অনুশীলন। পুরুষের মত নারীরও যে শারীরিক ব্যায়াম ও মানসিক অনাসক্তি অভ্যাসের প্রয়োজন

ছাড়িল না একাদশীতে মাছ খাওয়া।[১] ভবানীপাঠক তাঁহার দস্যুদলের আদর্শনেত্রী গড়িতে গিয়া এটুকু উপেক্ষা করিলেন, অথবা ভাবিলেন তাঁহার শিক্ষায় ও সন্ন্যাসিনী নিশির সাহচর্য্যে প্রফুল্লের বিগতজীবনের এই জেরটুকু ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহা কিন্তু প্রফুল্লের প্রেমজীবনের অভগ্ন সেতু হইয়াই রহিল।

দীর্ঘ দশ বৎসর পরে নায়ক-নায়িকার পুনঃ সাক্ষাৎ (ব্রজেশ্বর কিছু না জানিয়া, প্রফুল্লের কিন্তু জ্ঞাতসারে) এক জ্যোৎস্না নিশীথে ত্রিস্রোতা নদীবক্ষে সাগরবৌয়ের মানভঞ্জন উপলক্ষ্যে। সে সাক্ষাতের দৃশ্যরচনায় এবং দৃশ্যের কেন্দ্রস্থ নায়িকার বর্ণনায় যে চারুত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে রূপ ও জ্যোৎস্না, স্মৃতি ও অন্ধকার, ভাবের প্রবাহ ও নদীর স্রোত, বীণার নিক্কণ এবং জলের কল্লোল, জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধন-সংযম এবং উভয় তটের কঠিন বন্ধন, প্রশান্ত চিত্তের স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য ও নিস্তব্ধ প্রকৃতির অটুট শান্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংগ্রথিত হইয়া মানুষ ও প্রকৃতিকে যেন পরস্পরের একান্ত অন্তরঙ্গ সহযোগী

---

আছে—এ যুগে বঙ্কিমের পূর্ব্বে কেহ তাহার নির্দ্দেশ দেন নাই। আজ যখন মেয়েদের শিক্ষায়তনগুলিতে ব্যায়াম-চর্চ্চার ব্যবস্থা হইয়াছে এমন কি সামরিক শিক্ষাও মেয়েরা গ্রহণ করিতে যাইতেছে তখন বঙ্কিমের প্রথম অপরাধ বোধ হয় মার্জ্জনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতীচ্য ব্যবহারের অনুকরণমোহ না কাটা পর্য্যন্ত অনাসক্তি অভ্যাসের আবশ্যকতা নির্দ্দেশের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের যে দ্বিতীয় অপরাধ তাহা হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা অবশ্য নাই।

১ ১।১৪।৫৩ পৃঃ।

করিয়া তুলিয়াছে। যাহা হোক ব্রজেশ্বরের পুনঃ সাক্ষাতে দেবীর ভাবের প্রবাহ কূল ছাপাইল, সঞ্চিত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, আর, সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, যে শ্বশুর প্রফুল্লকে লাঞ্ছিত করিয়া বিদায় দেওয়াই প্রফুল্লের বঞ্চিত জীবনের মূল কারণ তাঁহার ইজ্জত রক্ষার জন্য দেবী দিল পঞ্চাশ হাজার টাকার মোহর! পক্ষান্তরে যে প্রফুল্ল দশ বৎসর পরে দেখা দিল নবজীবনের ঐশ্বর্য্যে ও সঞ্চিত প্রেমের পূর্ণতায় তাহার ডাকাতি অপবাদ হইল কি না ব্রজেশ্বরের দিক্ দিয়া মিলনের অনতিক্রমণীয় অন্তরায়![1]

কিন্তু তখনও চরিত্রগুলির পূর্ণতায় পৌঁছিতে অনেক বাকী —বাকী ব্রজেশ্বরের হারাণো মাণিক উদ্ধারের জন্য জীবনপণ, বাকী দুরাশয়তার অধস্তম সোপানে হরবল্লভের অবতরণ, বাকী অসংসারী প্রফুল্লের সংসারে ফেরা বা দেবী রাণীর গৃহক্ষেত্রে অভ্যুদয়। অর্থাৎ তত্ত্বের দিক্ দিয়া (পাশ্চাত্ত্য দর্শনের পরিভাষায়) প্রফুল্ল যে চরিত্রের thesis, দেবী চৌধুরাণী যাহার anti-thesis, বাকী তাহার synthesis।

ব্রজেশ্বর যখন ডাকাতির ধন শীঘ্র ফিরাইয়া দিতে আগ্রহান্বিত হইয়াও টাকা সংগ্রহের জন্য সময় চাহিতে চলিলেন, হরবল্লভ তখন উপকার বিস্মৃত হইয়া ডাকাতদের রাণীকে ধরাইয়া দিতে সচেষ্ট হইলেন। প্রফুল্ল কিন্তু ব্রজেশ্বরকে শেষ দেখার উদ্দেশ্যে এবং নবজীবনে অনাস্থাহেতু[2]

১ ২।৯।৯০ পৃঃ।

২ ২।১০।৯৩-৯৫ পৃঃ।

আত্মবিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকলেই মিলিল—হরবল্লভের সংবাদে কোম্পানীর সিপাহীসৈন্য, এমন কি ইংরেজ সেনানায়ক পর্য্যন্ত। প্রফুল্লের উদ্দেশ্য সফল হইল, ব্রজেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইল, কাজেই প্রফুল্ল ভাবিল তবে আর নিজের জীবনরক্ষার জন্য বহু লোকক্ষয়ের প্রয়োজন কি? গ্রন্থকারের ইঙ্গিত প্রফুল্ল শুধু ভগবদ্গীতা পড়ে নাই, 'শরণং ব্রজ' সাধন করিতে, ভগবানে একান্ত নির্ভর করিতে শিখিয়াছিল। অতএব আদেশ দিল তাহার রক্ষার জন্য কোন বিরোধের বা বৃথা আয়োজনের আবশ্যক নাই। বাহ্য সঙ্কটের ঝঞ্ঝাবহ মেঘমালা একাধিক অর্থে যখন পুঞ্জীভূত ও বর্ষণোন্মুখ তখন তাহারই সুনিবিড় ছায়ায় গ্রন্থকার নায়ক-নায়িকার হৃদয়দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া দিয়া তাহাদের অন্তরের যে সংবাদ আমাদের দিয়াছেন তাহা এইরূপ—

"ব্র। কেন এত সিপাহী এ দিকে আসিতেছে? তোমাকে ধরিবার জন্য?

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার কথায় বোধ হইতেছে, তুমি পূর্ব্ব হইতে এই সংবাদ জানিতে।'

প্র। জানিতাম, আমার সর্ব্বত্র চর আছে।

ব্র। এ ঘাটে আসিয়া জানিয়াছ, না আগে জানিয়াছ?

প্র। আগে জানিয়াছিলাম।

ব্র। তবে জানিয়া শুনিয়া এখানে আসিলে কেন?

প্র। তোমাকে আর একবার দেখিব বলিয়া।

ব্র। তোমার লোকজন কোথায়?

প্র। বিদায় দিয়াছি। তারা কেন আমার জন্য মরিবে ?

ব্র। নিশ্চিত ধরা দিবে স্থির করিয়াছ ?

প্র। আর বাঁচিয়া কি হইবে ? তোমার দেখা পাইলাম, তোমাকে মনের কথা বলিলাম, তুমি আমায় ভালবাস তাহা শুনিলাম। আমার যে কিছু ধন ছিল, তাহা ত বিলাইয়া শেষ করিয়াছি। আর এখন বাঁচিয়া কোন কাজ করিব বা কোন সাধ মিটাইব ? আর বাঁচিব কেন ?

ব্র। বাঁচিয়া, আমার ঘরে গিয়া, আমার ঘর করিবে।

প্র। সত্য বলিতেছ ?

ব্র। তুমি আমার কাছে শপথ করিয়াছ, আমিও তোমার কাছে শপথ করিতেছি। আজ যদি তুমি প্রাণ রাখ, আমি তোমাকে আমার ঘরণী গৃহিণী করিব।

প্র। আমার শ্বশুর কি বলিবেন ?

ব্র। আমার বাপের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করিব।

* * * * *

ব্রজেশ্বর আপনার পাল্কী ডাকিল। পাল্কীওয়ালা নিকটে আসিলে ব্রজেশ্বর বলিল, "তোরা শীঘ্র পলা, ঐ কোম্পানীর সিপাহীর ছিপ আসিতেছে, তোদের দেখিলে উহারা বেগার ধরিবে। * * *" পাল্কীর মাঝি মহাশয় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ পাল্কী খুলিয়া প্রস্থান করিলেন।

পাল্কী চলিয়া গেল দেখিয়া প্রফুল্ল বলিল, 'তুমি গেলে না ?'

ব্র। কেন, তুমি মরিতে জান, আমি জানি না ? তুমি আমার স্ত্রী —আমি তোমায় শতবার ত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু আমি তোমার স্বামী—আমিই ধর্ম্মতঃ তোমার রক্ষাকর্ত্তা। আমি রক্ষা

করিতে পারিব না—তাই বলিয়া কি বিপৎকালে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব ?

প্র। তবে কাজেই আমি স্বীকার করিলাম, প্রাণরক্ষার যদি কোন উপায় হয় তা' আমি করিব। * * * * কিন্তু আমার প্রাণরক্ষায় আর এক অমঙ্গল আছে।

ব্র। কি ?

প্র। এ কথা তোমায় বলিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর না বলিলে নয়। এই সিপাহীদের সঙ্গে আমার শ্বশুর আছেন। আমি ধরা না পড়িলে তাঁর বিপদ্ ঘটিলেও ঘটিতে পারে।

ব্রজেশ্বর শিহরিল—মাথায় করাঘাত করিল। বলিল 'তবে তিনিই কি গোইন্দা' ?

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল।

* * * * *

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে বলিলেন, 'আমি মরি কোন ক্ষতি নাই, তুমি মরিলে আমার মরার অধিক হইবে, কিন্তু আমি দেখিতে আসিব না। তোমার আত্মরক্ষার আগে, আমার ছার প্রাণ রাখিবার আগে, আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।'

প্র। সেজন্য চিন্তা নাই। আমার রক্ষা হইবে না, অতএব তাঁর কোন ভয় নাই। তিনি তোমায় রক্ষা করিলেও করিতে পারিবেন। তবে ইহাও তোমার মনস্তুষ্টির জন্য আমি স্বীকার করিতেছি যে, তাঁর অমঙ্গল সম্ভাবনা থাকিতে, আমি আত্মরক্ষার কোন উপায় করিব না। তুমি বলিলেও করিতাম না, না বলিলেও করিতাম না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।"[১]

---

১ ৩।৩ পঃ।

এই কথোপকথনের মধ্যে আমরা উভয় চরিত্রেরই অভাবনীয় উৎকর্ষ দেখিতে পাই। দেখি ব্রজেশ্বর এখন শুধু মিলনাকাঙ্ক্ষী নহে, প্রফুল্লের জন্য মৃত্যুবরণ করিতেও প্রস্তুত, পক্ষান্তরে, পিতার নীচাশয়তার পরিচয় পাইয়াও সে আসন্ন সঙ্কটে সকলের আগে তাহার পিতাকে রক্ষা করিতে চায়। আর, প্রফুল্ল? দস্যুতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত রাণীগিরিতে সে যে শুধু বীতশ্রদ্ধ তাহা নহে, কর্ম্মের বড় আকারে, বাহিরের ব্যাপ্তিতে মাত্র সে আর ভুলিতে চাহে না। যে সাধন-রহস্যের সন্ধান সে পাইয়াছে তাহাতে সে বুঝিয়াছে, কর্ম্মবৃত্তকে শুধু বাড়াইলেই জীবনের সম্যক্ সার্থকতা সম্পাদন হইতে পারে না, আত্ম-নিগ্রহের ভিত্তির উপরেও জীবনের গঠনকার্য্য চলিতে পারে না। কর্ম্মের সার্থকতা যখন অন্তরের উন্নতিতে বা 'হওয়ায়', তখন কর্ম্মক্ষেত্র ছোট হোক আর বড় হোক তাহাতে কিছু আসে যায় না, বরং স্বধর্ম্ম বিচার করিয়া অহঙ্কার, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া 'নিয়ত কর্ম্ম'ই করণীয়। তাহার উপরে প্রফুল্লের ধারণা হইয়াছিল 'কর্ম্ম তাঁহার' (অর্থাৎ ভগবানের) 'আমার নহে'। অতএব ব্রজেশ্বর যখন তাহাকে একেবারে অপ্রত্যাশিত কথা শুনাইল, 'আমার ঘরে চল, গৃহিণী হইবে' তখন রাণীগিরিতে ইস্তফা দেওয়া[১] ঊর্দ্ধমুখী প্রফুল্লের কাছে সে কথা একরূপ ভগবানের নির্দ্দেশ বলিয়াই মনে হইল এবং

১ ২।১০।৯৩, ৯৫ পৃঃ।

আত্মরক্ষা-বিষয়ে ভগবানের উপর নির্ভর রাখিয়া, যে হরবল্লভ 'প্রফুল্লের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, এখন দেবীর সর্ব্বনাশ করিতে নিযুক্ত,' নিজে ধরা দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হইল।[১]

বঙ্কিম তত্ত্বের দিক্ দিয়া ইহা প্রফুল্লের 'নিষ্কাম ধর্ম্ম'[২] সাধনায় সিদ্ধির লক্ষণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। উপন্যাস পাঠকেরা কিন্তু ইহা প্রফুল্লের প্রেমসাধনায়ও সিদ্ধির লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিবে। প্রফুল্লের হৃদয় শুধু আজ বিদ্বেষহীন নহে, পরন্তু এমন প্রেমঘন হইয়া উঠিয়াছে যে সে আজ তাহার স্বামীর প্রীত্যর্থে ও কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহধর্ম্মিনী হিসাবে অপকারী শ্বশুরের শত অপকার্য্য ভুলিতে, এমন কি তাঁহার ইষ্টসাধন জন্য নিজের অনিষ্ট বরণ করিতেও প্রস্তুত।

সকল অভ্যাসযোগের মধ্যেও প্রফুল্ল প্রেমের যে তপশ্চরণ করিয়াছিল[৩], যুগব্যাপী বিচ্ছেদের মধ্যে প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের যে অখণ্ড কামনা আহিতাগ্নিকের নিষ্ঠায় অন্তরে পোষণ করিয়া আসিয়াছিল, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে প্রফুল্লের মুখেই আমরা একাধিকবার পাইয়াছি। ত্রিস্রোতার বক্ষে প্রথম সাক্ষাতের পরে, 'দুই রত্নাধার' লইয়া ব্রজেশ্বর চলিয়া

---

১ ৩।৪।১১৬ পৃঃ।

২ আমাদের মনে রাখিতে হইবে বঙ্কিমের "নিষ্কামধর্ম্ম" জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমুচ্চয়—ত্রিস্রোতের যুক্ত বেণী।

৩ প্রফুল্লের শিক্ষার পঞ্চম বৎসরের আচরণ লক্ষ্যণীয়।

গেলে, নৌকার পাটাতনে লুণ্ঠিত অশ্রুপ্লুত দেবীর চোখের জল মুছাইতে নিশি যখন বলিল 'এই কি মা, তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম? এই কি সন্ন্যাস?' 'তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও', তখন দেবীই না বলিয়াছিল 'সে পথ খোলা থাকিলে, আমি এ পথে আসিতাম না'?[১] তারপরে সেই নদীবক্ষে দ্বিতীয় মিলনের দিনে ব্রজেশ্বরের নিকট আত্মপরিচয় দিতে গিয়া প্রফুল্লই না বলিয়াছিল 'তুমি আমার দেবতা, আমি অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিতে শিখিতেছিলাম—শিখিতে পারি নাই; তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ—তুমিই একমাত্র আমার দেবতা, আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি—আমি ডাকাইত নই'?[২] অতএব যে আকর্ষণ প্রফুল্লকে ঘরে বা পরিণীতার স্বধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, যে আকর্ষণের বিলয় শ্রীকে তাহার বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্যপথে সহজে ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই, তাহা অটুট প্রেমের আকর্ষণ—যদিও কবি বঙ্কিম ও মনীষী বঙ্কিম একত্র মিলিয়া ইহাকে অন্তর্যামী বা 'অনুমন্তা'র অনুমোদিত ও আশীর্ব্বাদপূত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতে কবি বা তত্ত্বদর্শী কাহার বিজয় বা পরাভব ঘটিয়াছে সে আলোচনা এখানে সঙ্গত হইবে না, যেহেতু প্রফুল্লের প্রেম কত যে স্বার্থশূন্য ও নিস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছে

---

১ ২।৮।৮৮ পৃঃ। প্রফুল্ল নিজের 'station in life' বা স্বধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী নহে।

২ ৩।২।১০৯ পৃঃ।

তাহার পরিচয় এখনও বাকী। ভগবৎকৃপায় হরবল্লভ, ব্রজেশ্বর, প্রফুল্ল সকলেই যখন সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিল তখন দেখিলাম ব্রজেশ্বরের জীবনপণে অর্জ্জিত প্রফুল্ল ফিরিয়া আসিল তাহারই বর্জ্জনের ক্ষেত্রে। যে গৃহে সে বাহিরের রূপের কিরণ বিস্তার করিয়াও একদিন স্থানলাভ করিতে পারে নাই, সেই গৃহে অন্তরের জ্যোতির্ম্ময়ী প্রফুল্ল ফিরিল—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।"[১]

প্রফুল্লের প্রত্যাবর্ত্তনে ইংরেজ কবি Wordsworthএর মহাবাক্য

"Type of the wise who soar but never roam
True to the kindred points of heaven and home".

স্বতঃই আমাদের মনে পড়িতে পারে, প্রাচ্য তত্ত্ববিত্থার সমসিদ্ধান্ত—পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের doctrine of 'My Station in Life'[২] হয়ত আমাদের স্মরণে আসিতেও পারে, কিন্তু সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া প্রফুল্ল যতই তত্ত্বদর্শী বা wise হোক, যে হৃদয় প্রফুল্লকে ঘরে ফিরাইয়া আনিয়াছিল তাহা 'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা' পণ্ডিতের নয়, তাহা প্রেমাঙ্গীকৃতকর্ম্মা মাধুর্য্যময়ী নারীর। আর প্রফুল্ল যে সিদ্ধান্তের রসরূপ তাহার অনুসন্ধানে বিদেশে যাইবারও

১ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২।১৩ শ্লোক।

২ Bradley : 'Ethical Studies'. Essay V.

কোন প্রয়োজন নাই। ত্রিস্রোতার বক্ষে প্রথম সাক্ষাতের পর ব্রজেশ্বর চলিয়া গেলে প্রফুল্লকে অশ্রুময়ী দেখিয়া নিশিঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'ভগবদ্-বাক্য কোথায় মা এখন?'[১] প্রফুল্ল তখন নূতন অনুভূত বিচ্ছেদের বেদনায় নিশিকে "যমের বাড়ী যাও" বলা ছাড়া যথাযথ উত্তর দিতে পারে নাই। নতুবা নিশি যখন আপনাকে মেয়েমানুষের অধিক মনে করিয়া বলিয়াছিল 'নিষ্কাম ধর্ম্ম,' 'সন্ন্যাস,' 'ও সকল ব্রত মেয়েমানুষের নহে', তখন প্রফুল্ল বলিতে পারিত মেয়েমানুষের ওসকল ব্রত গ্রহণযোগ্য কি না জানি না তবে 'ভগবদ্‌বাক্য' স্মরণ করিয়াই ত তোমাদের রাণীগিরি ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। গীতার অমৃত বাণীই যে—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয়! সদোষমপি ন ত্যজেৎ
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥"[২]

বঙ্কিম কিন্তু তত্ত্বকথা সবিস্তারে না তুলিয়া, ইঙ্গিত মাত্র করিয়া, তাঁহার নায়িকার ভাবজীবনকে এমন পরিণতি দিয়াছেন যে প্রফুল্ল, নারী প্রফুল্ল, পরিণীতা প্রফুল্ল, যেন অতিসহজেই

১ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ২।৮।৮৮

২ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ১৮।৪৭-৪৮ শ্লোক। পরে ৩ খণ্ডের ১৪ পরিচ্ছেদে সাগরের প্রশ্নোত্তরে প্রফুল্লকে বলিতে দেখিব "এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার ধর্ম্ম।"

ফিরিল নিষ্কাম গার্হস্থ্য জীবনের আনন্দলোকে। কিন্তু পুরাতন পথে ফিরিয়া আসিলেও তাহার পথহারা জীবনের সাধনায় যে অপূর্ব্ব শক্তি সে সঞ্চয় করিয়াছিল তাহাতে নবজীবনের বিজয়-যাত্রায় সিদ্ধিলাভ কত যে সহজসাধ্য হইয়াছিল গ্রন্থকার শেষ পরিচ্ছেদে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। সে সিদ্ধি অবশ্য সন্ন্যাসের সিদ্ধি নহে, স্বার্থশূন্য নিষ্কামকর্ম্মকুশল প্রেমের অর্জ্জিত সিদ্ধি—যে প্রেমের পূর্ণতায় সংসার হইল মধুময়—'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'—সকলেই হইল তাহার অনুকূল ও অনুরক্ত, প্রীতিমুগ্ধ ও আপন। প্রফুল্লের প্রেম আত্মসুখান্বেষী বা সম্ভোগের প্রেম হইলে কখনই তাহা হইত না। লৌকিক বা সাংসারিক প্রেমের সহিত এই অলৌকিক বা অসংসারী প্রেমের পার্থক্য যে কত, তাহা পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে গ্রন্থকার একদিকে নয়নতারার বর্ণনাচ্ছলে বলিতেছেন—

"সাপকে হাঁড়ির ভিতর পুরিলে, সে যেমন গর্জ্জিতে থাকে; প্রফুল্ল আসা অবধি নয়নতারা সেইরূপ করিতেছিল, একবার মাত্র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, গালির চোটে ব্রজেশ্বর পলাইল, আর আসিল না। প্রফুল্ল ভাব করিতে গিয়াছিল কিন্তু তারও সেই দশা ঘটিল। * * * নয়নতারার কতকগুলি ছেলেমেয়ে হইয়াছিল * * * এ কয়দিন মার খাইতে খাইতে তাহাদের প্রাণ বাহির হইয়া গেল।"

পক্ষান্তরে, নবজাত প্রফুল্লের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"প্রফুল্লের যাহা কিছু বিবাদ সে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে। প্রফুল্ল বলিত 'আমি একা তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের,

তেমনি নয়ানবৌয়ের। আমি একা তোমায় ভোগ-দখল করিব না। স্ত্রীলোকের পতি দেবতা, তোমাকে ওরা পূজা করিতে পায় না কেন?' 'আমায় যেমন ভালবাস উহাদিগকেও তেমনি ভাল না বাসিলে, আমার উপর তোমার ভালবাসা সম্পূর্ণ হইবে না। ওরাও আমি।'"[১]

দুইটি ছোট-কথায় প্রফুল্লের বাণী প্রায় সমাপ্তিতে পৌঁছিয়াছে। যাহাদের সম্বন্ধে কিছু না কিছু অসূয়া শেষ পর্য্যন্ত থাকিবার কথা গ্রন্থকারের লিপিকুশলতায় তাহাদের মধ্যেও প্রফুল্লের আত্মদৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে, অপরের সম্বন্ধে ত কথাই নাই। প্রফুল্ল এমন কি চরিত্র যে ভারতের আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটি চরম কথা যথাযোগ্য ভাবেই তাহার প্রায় অন্তিম উক্তিতে স্থান পাইয়াছে? 'অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়ের শিষ্য' বলিয়াই তাহার মুখে যে একথা মানাইয়াছে এমন বলি না, তবে একনিষ্ঠ প্রেম, চিরানুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্য, অপকারীর উপচিকীর্ষা, পরিপূর্ণ ক্ষমা, হিংসায় অপ্রবৃত্তি, ভগবানে একান্ত নির্ভর, রাণীগিরি পরিহার, অহঙ্কার পরিত্যাগ, যাহার পক্ষে জীবনের ক্রমোর্দ্ধগতিতে সুসম্ভব হইয়াছে তাহার পক্ষে—

'আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ'।[২]

—সর্ব্বত্র সমদর্শনের এই চরম সিদ্ধির পথও খুলিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। আর নবজীবন লাভ করা ব্যতীত দেবী

১ ৩।১৪।১৪৮ পৃঃ।

২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬।৩২ শ্লোক।

যে মন্ত্রে নাই যোগারূঢ় প্রফুল্লের কর্ম্মচ্ছন্দেও তাহার পরিচয় পাই।

"বিষয় ব্রজেশ্বরের হইল। * * * তখন প্রফুল্ল বলিল, 'আমার সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা শোধ কর'।

ব্র। কেন, তুমি টাকা লইয়া কি করিবে?

প্র। আমি কিছু করিব না। কিন্তু টাকা আমার না—শ্রীকৃষ্ণের—কাঙ্গাল গরিবের—কাঙ্গাল গরিবকে দিতে হইবে।

ব্র। কি প্রকারে?

প্র। পঞ্চাশ হাজার টাকায় এক অতিথিশালা কর।

ব্রজেশ্বর তাহাই করিল। অতিথিশালা মধ্যে এক অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, অতিথিশালার নাম দিল, "দেবীনিবাস"।[১]

অতিথিশালা অনেকেই করে, অন্ততঃ সেকালে করিত, ইহা সত্য। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে প্রফুল্লের এই অতিথিশালা-নির্ম্মাণ দাতার দান নহে, প্রতিনিধির সমর্পণ—যে সমর্পণের দীক্ষা ভবানীঠাকুরের নিকট হইতে সে লাভ করিয়াছিল। আজ 'দরিদ্র নারায়ণ' কথাটা খুবই চল হইয়াছে, কিন্তু যে দিন দেবীচৌধুরাণী লিখিত হইয়াছিল সে দিন উহা প্রচলিত বাক্যে পরিণত হয় নাই।

বাস্তবিক, শান্তি ও প্রফুল্ল উভয়েরই জীবন বিচ্ছেদের দিনের সাধনায় এমন শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে যে, তাহাদের চরিত্রের মিলনের দিনের মহত্তর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়—যদিও

---

১ ১।১৪।১৪৯ পৃঃ।

একজনের সাধনালব্ধ সম্পদ্ প্রযুক্ত 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মাতৃভূমির সেবার গৌরবরক্ষায়, অপরের 'kindred point of heaven' যে 'home' সেই গৃহাশ্রমের উন্নয়নে। আর, প্রিয়জনকে আমরা ত সকলেই ভালবাসিয়া থাকি, কিন্তু—

'তোমারি পুণ্য আলোকে বসিয়া
প্রিয়জনে বাসি ভালো'[১]

কবির এই প্রার্থনার অর্থ যে কি, যে আলোক বা আলোকের উৎস সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে 'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি,' সে অপার্থিব আলোকে উদ্ভাসিত প্রেমের মাধুর্য্য যে কেমন, বঙ্কিমপরিকল্পিত প্রফুল্লের জীবনের চরম পরিণতিতে আমরা যেন তাহারই সন্ধান পাই।

প্রফুল্লের সুদীর্ঘ শিক্ষাপর্ব্বের কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা তাঁহারা দেখিতে পাইবেন না, পক্ষান্তরে উহা "লঘুক্রিয়ার বহ্বারম্ভ" "উপন্যাসটির মধ্যে পর্ব্বতের মূষিকপ্রসবের ন্যায় একটি হাস্যজনক অসঙ্গতি"[২] মনে করিবেন, সূচনার সামান্য প্রফুল্ল এবং সমাপ্তির সাধনসম্পন্না মহিমময়ী (sublimated) প্রফুল্লের মধ্যে বিপুল বিভিন্নতা যাঁহারা দেখিতে অক্ষম বা অপ্রস্তুত। তাঁহারা এমনও বলিতে পারেন যেহেতু অবশেষে অর্জ্জুনের যুদ্ধই করিতে হইল, অতএব ভগবদ্গীতার অধ্যায়ের পর অধ্যায়-ব্যাপী হিমালয়সদৃশ যোগোপদেশ অষ্টাদশ

---

১ রবীন্দ্রনাথ—'নৈবেদ্য'।

১ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ১২৬ পৃঃ।

অধ্যায়ান্তে মূষিকই প্রসব করিয়াছে। আর, শ্রীকৃষ্ণের গুরুগিরির পর্য্যবসান যদি হইয়া থাকে অর্জ্জুনের তীরন্দাজীতে, তাহা হইলে "ভবানীপাঠকের গুরুগিরির পর্য্যবসান হইল সাদামাঠা গৃহস্থের কুলাঙ্গনার ঘর-গৃহস্থালীর কার্য্যে—বাসন-মাজায় ও সপত্নী-বশীকরণে"[১] ইহাতে আর বেশী বিড়ম্বনা কি হইতে পারে? সে যাহা হোক প্রেমময়ী প্রফুল্ল যেমন উপন্যাসের জাতি রক্ষা করিয়াছে, তেমনই ভগবদ্‌ভক্তির সহিত গভীর জ্ঞান ও 'লোক-সংগ্রহার্থ' কর্ম্মের সমুচ্চয় অর্থাৎ বঙ্কিম যাহাকে 'নিষ্কামধর্ম্ম' বলেন সেই নিষ্কাম-ধর্ম্মের সাধনপরায়ণা প্রফুল্ল উপন্যাসখানিকে গুরু গৌরব দান করিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

---

১ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী'—('নারায়ণ'—বৈশাখ ১৩২২, ৫৫০ পৃঃ)।

# সীতারাম

# সীতারাম

( ১৮৮৭* )

বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম সাধারণতঃ দুই প্রকার প্রতিকূল সমালোচনার বিষয় হইয়াছে। একদিকে স্বদেশ ও স্বদেশের ইতিহাসের প্রতি যে অনুরাগ বঙ্কিমচন্দ্রই উদ্দীপিত করিয়াছিলেন, সেই অনুরাগের আতিশয্যে কোন কোন ঐতিহাসিক বা ইতিহাস-দরদীর পরিবাদ, অন্যদিকে ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতি বিদ্বেষ-মূলে অথবা সীতারামের ব্যঞ্জিতার্থ বুঝিবার প্রযত্ন-অভাবে সাহিত্যরসিকের বিরুদ্ধ সমালোচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বস্বীকৃতি তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর সমালোচনার রূঢ় আঘাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাঁহার অসতর্কতা ও চিন্তার প্রগাঢ়তা দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচনার কারণ হইয়াছে।

সীতারামের নাম ব্যবহারে উপন্যাস লিখিয়া বঙ্কিম সবিনয়ে ও সরলভাবে বিজ্ঞাপনেই জানাইয়াছিলেন 'গ্রন্থে

---

* বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্ত্তিত 'প্রচার' মাসিকপত্রের ১২৯১-৯২ সালের প্রথম সংখ্যায় সীতারাম প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহার আদিরূপের দশম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত সপ্তমসংখ্যায় প্রকাশিত হইবার পরে "একেবারে এক পরিচ্ছেদের বেশী দিবার স্থান হয় না," "ইহাতে উপন্যাসের মর্য্যাদা থাকে না" বলিয়া অষ্টম সংখ্যা হইতে সীতারাম প্রকাশ বন্ধ হয় এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে "প্রচারের গ্রাহকবর্গকে অর্দ্ধেক মূল্যে পুস্তক দিবেন গ্রন্থকারের এমন অভিপ্রায়" বিজ্ঞাপিত হয়। ( সম্পাদকীয় উক্তি ২৯২ পৃষ্ঠা )। ইংরাজী ১৮৮৭ সালে ইহা গ্রন্থাকারে প্রথম মুদ্রিত হয়।

সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা যায় নাই, গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।' তবুও ঐতিহাসিক সীতারামের গৌরব হানি করা হইয়াছে, এমন কি "গ্রন্থের উদ্দেশ্য বোধ হয়" "লেখকের অর্থাগমের সোপান-নির্ম্মাণ"[১] ইত্যাদি অভিযোগ তিনি এড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু বঙ্কিমের সীতারাম রচনার দশ বৎসর পরেও ঐতিহাসিক সমালোচক-প্রবর 'সীতারামের ইতিহাস সংকলনের উপাদানের বড়ই অভাব'[২] উল্লেখে 'জনশ্রুতি' ও 'সহৃদয় ইংরাজ-রাজ-পুরুষ'দের রচনার উপর নির্ভর করিয়া চতুর্দ্দশ অধ্যায়ব্যাপী যে সীতারাম-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন তাহাতে বঙ্কিম যে কোথায় ইতিহাসের সীতারামকে কতদূর খর্ব্ব করিয়াছেন তাহার কোন বিবরণ নাই; পক্ষান্তরে বলা হইয়াছে 'ইংরাজ কেবল সীতারামকে দস্যুদলপতি বিদ্রোহী বলিয়াই গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন'[৩]। কাজেই আমরা উপন্যাসের সাধারণ পাঠকবর্গ যখন দেখিতে পাই বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন সীতারামের রাজোচিতগুণ বর্ণনা করিয়া, সীতারামকে সেকালের বাঙ্গালীর স্বাধীনতা-কামনার প্রতীকরূপে অঙ্কিত

---

১ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়: 'সীতারাম' ('সাহিত্য' ১৩০২, কার্ত্তিক সংখ্যা ৪৮৬ পৃ:)। 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয় অবশ্য পাদটীকায় ঐ উক্তির প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন: "সীতারামের উদ্দেশ্য আর যাহাই হউক, 'অর্থাগমের সোপান নির্ম্মাণ' যে বঙ্গের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমবাবুর উদ্দেশ্য ছিল ইহা বোধ হয় না। নিঃস্বার্থ সাহিত্যবীর বঙ্কিম বঙ্গের এই সামান্য সাহিত্যমন্দিরের কেবল 'সোপান' নহে চূড়াও নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন।" ইত্যাদি

২ ঐ, ৪৮৮ পৃঃ। ৩ ঐ, ৪৮৮ পৃঃ।

করিয়া তখন, Hazlit কথিত[১] "over-informing power"-এর পরিচয় পাওয়া ব্যতীত, তাঁহার অপরাধের গুরুত্ব ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বরং বঙ্কিম সীতারামকে যত বড় করিয়া পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন ঐতিহাসিক মহাশয়েরা তাহার উপযোগী প্রমাণ বঙ্কিমের লেখার বহুদিন পরেও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই অথচ ঔপন্যাসিকের সমালোচনায় পঞ্চমুখ। আবার যখন দেখা যায় শুধু ঐতিহাসিক নহেন, অনৈতিহাসিক সাহিত্য-ব্যবসায়ীও বঙ্কিমের 'ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ব-জ্ঞানের' সমালোচনায় তৎপর তখন মনে হয় স্যার যদুনাথের মন্তব্য[২] প্রকৃতই অনেক মিথ্যা গবেষণার মূলোচ্ছেদ করিয়াছে।

---

১ "Sir Walter's mind is full of information but the over-informing power is not there. Shakespeare's spirit, like fire, shines through him." ( Hazlit : 'Essay on Shakespeare, Scott and Racine').

২ "বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে এমন পদার্থ আছে যাহা 'পাথুরে বিজ্ঞানসম্মত' ইতিহাসে কখন পাওয়া যায় না—সেটি সে যুগের প্রাণ"। "আমরা সেই সেই যুগের ভারতের গ্রাম-নগর, নরনারী, অবিস্মরণীয় কোন কোন মহাপুরুষের চাক্ষুষ সাক্ষাৎ পাইতেছি, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের সময়কে নিজ-পাড়া প্রতিবাসীর নিজের ঘরের লোকের মত চিনিতে পারিতেছি"। (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংস্করণে স্যার যদুনাথ সরকার লিখিত 'আনন্দমঠের' ভূমিকা)। T.S. Eliot Shakespeare সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, অর্থাৎ 'Shakespeare acquired more essential history from Plutarch than most men could from the whole British museum" ('Selected Essays' p, 27 ), বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও প্রায় তাহাই বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচনার একটি উদাহরণ দিয়া সীতারাম সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব। শত বার্ষিকীর সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদের এক তরুণ বন্ধু একদিন বলিলেন, 'সীতারাম আবার উপন্যাস! উহা ত গীতার কয়েকটি শ্লোকের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মাত্র!' শুনিয়া মনে হইল বঙ্কিম ভূমিকায় গীতার শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত করিয়া ঔপন্যাসিক হিসাবে কি ভুলই না করিয়াছেন! তাঁহার 'সমানধর্ম্মা' পাঠকের প্রত্যাশা না করিয়া, আমাদের মত অল্পবুদ্ধি সাধারণ পাঠকদিগের সুবিধার জন্য সঙ্কেত হিসাবে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া সাজঘরের সংবাদ না দিলেই পারিতেন। ভারতের কৃষ্টিবিযুক্ত যে শিক্ষার প্রভাবে দেশীয় সংস্কৃতি ও সাধনার প্রতি আমাদের অনাস্থা ও বিদ্বেষ ক্রমশঃ বাড়িয়াছে বই কমে নাই, সেই শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের কাছে উপন্যাস-গ্রন্থের পরিচয় দিতে ধর্ম্মগ্রন্থের শ্লোক উদ্ধার করিয়া সে কালের পদ্ধতি অনুসারে আহারের পূর্ব্বে একেবারে তিক্তরস পরিবেশন না করাই উচিত ছিল। যাহা হোক বন্ধুটিকে বলিলাম গীতার উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে যদি কোন আধ্যাত্মিক সত্য থাকে তাহা ত জীবন-ছাড়া-সত্য নহে, অতএব উপন্যাস যদি জীবনের প্রতিচ্ছবি হয় গীতার কথিত সত্যই বা তাহাতে প্রতিভাত হইবে না কেন? ভূমিকায় গীতার শ্লোক উদ্ধার করাতেই কি উপন্যাস হিসাবে সীতারামের জাত যাইবে? বন্ধুটি স্মিতমুখে বলিলেন 'ঠিক তা নয়, তবে spiritual breakdownএর কাহিনী লিখিতে গিয়া

ভালবাসার এত লাঞ্ছনা উপন্যাসের অযোগ্য'। উত্তরে বলিলাম তাহা হইলে Anatole France এর Thais কি উপন্যাস নয়? ভালবাসিয়াই না Saint Paphnutius অবশেষে 'vampire' আখ্যা পাইল? তবে, Paphnutius এর পতন কি একজন ধর্ম্মধ্বজীর পতন বলিয়াই উপভোগ্য? বন্ধুটি উত্তর এড়াইয়া প্রতিপ্রশ্ন করিলেন 'আপনি সীতারামকে Nobel Prize দিতে চান না কি?' পরিহাসে সে তর্কের শেষ হইল, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে আজও সে প্রশ্নের উত্তর পাই না, Thais সমাদরের যোগ্য হইলে সীতারাম অনাদরের উপযুক্ত কিসে? দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের মিসরের খৃষ্টান সাধুদিগের তপঃক্ষেত্র Thebaid এর অথবা Alexandria-র অখৃষ্টান শিক্ষিত ও মার্জ্জিত সমাজের বর্ণনায় যে কৃতিত্ব Anatole France দেখাইয়াছেন তাহা প্রাচীন যুগের প্রশংসনীয় পুনরুদ্ধার ('a really great re-conquest of antiquity') বটে। আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত—

"It is much more. In it a word-wizard pictures cities, palaces, philosophers, actors, courtezans and naked vine-wreathed corybantes dancing, full of life, to drones and shrieks of the syrinx, sullen clank of brass, and the murmur of harps beneath a golden plectrum."*

---

* Monkshood লিখিত ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা।

কিন্তু প্রায় সার্দ্ধ দুইশত বৎসর পূর্ব্বের ভাগ্যহত বাঙ্গলার ভূষণা বা মহম্মদপুর যে গল্পের পরিবেশ তাহাতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মিসরের অনুরূপ কিছুর প্রত্যাশা করিতে পারি কি? নতুবা word-wizard বঙ্কিম যে কাহারও অপেক্ষা কম ছিলেন তাহা ত নহে; আর Thais রচনাকালে মিসরের দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের ইতিহাস ও অবস্থা যতটা জানা গিয়াছিল, আওরংজীবের আমলের বাংলার ইতিহাসে সেদিনও বোধ হয় ততটা আলোকসম্পাত হয় নাই। কাজেই সীতারামের যুগকে জীবন্ত ও বাঙ্ময় করিয়া তুলিতে বঙ্কিম বাহির হইতে সে সাহায্য পান নাই Thais রচনায় France যাহা পাইয়াছিলেন। অথচ আওরংজীবের বাদ্‌শাহী বা মুর্শিদ্‌কুলি খাঁর শাসনকালে বাঙ্গলায় যে শক্তি-সংঘর্ষ চলিতেছিল[১] সীতারামে তাহার সুস্পষ্ট ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। অধিকন্তু প্রসঙ্গক্রমে পুরীর পথে হিন্দু-ভাস্কর্য্যের যে গৌরবচ্ছবি বঙ্কিমের লেখনীমুখে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে[২] তাহা যুগে যুগে এক অধঃপতিত জাতির মনে প্রেরণা সঞ্চার করিবে সন্দেহ নাই।

---

১ "মোগল বাদশাহের যে সকল সেনানী দাউদকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কতলু খাঁ ও ওসমানের বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন, এবং বিক্রমপুরের কেদার রায়ের ও যশোহরের প্রতাপাদিত্যের ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাঁহারা বঙ্গবিজেতা বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন কিনা সন্দেহ। প্রকৃত বঙ্গবিজেতা মুর্শিদকুলি খাঁ। কারণ মুর্শিদকুলি খাঁই বাঙ্গালার মাটীকে মোগলের পদানত করিয়াছিলেন। এইরূপ বৃহৎ কার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইতে পারে না।" রমাপ্রসাদ চন্দ—'সীতারাম প্রসঙ্গ' 'সাহিত্য' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, ১০১ পৃঃ।

২ ১।১৩।৪০ পৃঃ।

চিত্রের কথা ছাড়িয়া চরিত্রের কথায় আসা যাক। যাঁহারা বলেন সীতারাম উপন্যাস নহে উদাহরণ গ্রন্থ মাত্র, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে অন্ধরূপতৃষ্ণার অধোগতি প্রদর্শন ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইলে, সে উদ্দেশ্য গঙ্গারামের চরিত্র চিত্রিত করিয়াই সিদ্ধ হইতে পারিত, তাহার জন্য 'সীতারামে'র ন্যায় multiple tragedy রচনার প্রয়োজন হইত না। উপন্যাসের সীতারামের পতনের হেতু ও ক্রম না হয়

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।"[১]

কিন্তু এই উপদেশটুকুই সীতারামের চিত্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে রসের অনুপানে প্রাণবান হয় নাই ইহা কি বলা যায়? বঙ্কিম গ্রন্থারম্ভে সীতারামকে যে শরণাগতরক্ষক, মহাপ্রাণ, বীর্য্যবান ও মহৎসঙ্কল্পের অধিকারী করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, অন্যায়ের প্রতিরোধকারী, ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠাকামী বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, সীতারামের মূল অপরাধে সমাজ বা নীতিবিগর্হিত কিছু কল্পনা না করিয়া প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাহার চরিত্রের যে অধোগতি দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমরা যখন সীতারামকে ক্রমশঃ কামাতুর ও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট এবং অবশেষে পত্নীঘাতক ও নারীনির্য্যাতকরূপে দেখিতে পাই তখন

১ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—২।৬২-৬৩ শ্লোক।

তাহার প্রতি যত বীতশ্রদ্ধ হই না কেন, তাহার দুর্ম্মতি ও দুরাচার যত হেয় ও নিন্দনীয় মনে করি না কেন, তাহার অতীত মহচ্চরিত্রের অভাবনীয় অবনতি ও সুবৃহৎ পরিকল্পনার নিদারুণ নিষ্ফলতার জন্য কিছু কম ব্যথিত হই না। সীতারাম-পাঠের সময় তত্ত্বোপদেশে কেবল আমাদের মস্তিষ্ক ভরিয়া যায়, গল্পরসে হৃদয় অভিষিক্ত হয় না ইহা প্রকৃত কথা নহে। বরং মহতের দুর্গতিতে যে স্বাভাবিক করুণাধারা ফল্গুস্রোতের মত আমাদের অন্তরের অধস্তরে অলক্ষ্যে বহিয়া যায় তাহা অনুতপ্ত সীতারামের অন্তিম চৈতন্যোদয়ে ও আত্মোৎসর্গে আমাদের ব্যথার অশ্রুতে রচনার প্রশস্তিরূপেই ফুটিয়া উঠে। Paphnutius এর নিরুদ্ধ রিরংসার বাঁধ পরিণামে ভাঙিয়া দিয়া France যেখানে Paphnutius এর প্রতি পাঠকের পুঞ্জীভূত ঘৃণাই জাগাইয়া তুলিয়াছেন, সেখানে জয়ন্তীর দ্বারা ক্ষমা করাইয়া বঙ্কিম তাঁহার অনুতপ্ত ও মোহমুক্ত নায়কের আত্মোৎসর্গের চরম মুহূর্ত্তে তাহার প্রতি পাঠকের অনুকম্পাই আকর্ষণ করিয়াছেন। ফলে সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াও, মানুষের দুর্ব্বলতার প্রতি Paphnutius এর স্রষ্টা অপেক্ষা সীতারামের স্রষ্টা যথেষ্ট কম রূঢ়তাই প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকন্তু মোহাবিষ্ট আত্মবিস্মৃত মহত্ত্বের মোহনাশ ও স্মৃতিলাভের চিত্র দেখাইতেও ত্রুটী করেন নাই।

তারপরে নারী-চরিত্র। Thais সে হিসাবে, যত সুধাবর্ষী হোক না কেন, একতারা। পক্ষান্তরে সীতারাম বহুতন্ত্রীর বীণা।

নিভৃতগুহার নির্ঝরিণী রমা, উভয়তটশোভিনী প্রশস্তহৃদয়া নন্দা, কূলবিধ্বংসিনী শ্রী, সাগরসঙ্গমে প্রায় উপনীতা বিলুপ্ত-তটরেখা জয়ন্তী—সকলেরই কলকল্লোল সে বীণার ঝঙ্কারে স্থান লাভ করিয়াছে।

বিশেষভাবে উভয় গ্রন্থের নায়িকা দুইটির চিত্র আলোচনা করিলেই বা কি দেখিতে পাই? Thais নূতন তুলিকায় পুরাতন বিষয়ের ছবি। শ্রী সম্পূর্ণ অভিনব কল্পনা। রূপচর্চ্চায় ক্লান্ত নয়ন নিমীলিত হইল, ফুটিল অন্তর্দ্দৃষ্টি, জাগিল রূপাতীতের আকাঙ্ক্ষা, অথবা সম্ভোগে ক্লান্ত জীবন মৃত্যুর শঙ্কায় সন্ন্যাসে অনন্তজীবনের সন্ধান পাইল, ইহা এই পুরাতন জগতে কি নূতন কল্পনা?

"জনম অবধি হম রূপ নিহারল নয়ন ন তিরপিত ভেল
সেহো মধুর বোল শ্রবণহি শুনল শ্রুতিপথে পরশ ন গেল।
কত মধু যামিনিয় রভসে গমাওল ন বুঝল কৈসন কেল
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল তইও হিয়া জুড়ল ন গেল।
কত বিদগধ জন রস অনুগমন অনুভব কাহু ন পেখ
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত লাখে ন মিলল এক।"

এই 'অনুভবে'র অপূর্ণতা ও অতৃপ্তিতে যুগে যুগে অনেক 'খোলা আঁখি'হইত অবশেষে 'আকুল আঁখির নীরে' বদ্ধ হইয়াছে; অথবা—

"...শেষ শমন ভয় তুয়া বিনু গতি নহি আরা
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি অব তারণ ভার তোহারা"

বলিয়া শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাহাতে বিষয়ের নূতনত্ব নাই, তবে নূতন রেখায় ও রঙে এই চিরন্তন সত্য Thaisএ যে ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে তাহাতে Franceএর অসাধারণ কৃতিত্ব অস্বীকার করিবার নহে।

কিন্তু বঙ্কিম যে 'শ্রী'র পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা এক হিসাবে Thais এর পরিকল্পনার বিপরীত—যে সন্ন্যাস কর্ম্ম-জীবনের প্রত্যাহার, antithesis, তাহার প্রতিবাদ। প্রেমময়ী শ্রী, সন্ন্যাসিনী শ্রী, অনুতপ্তা শ্রী—তিন অঙ্কে বঙ্কিম 'শ্রী'র জীবনকাহিনী সম্পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন, শেষ অঙ্ক যত সংক্ষিপ্তই হোক। পতিপরিত্যক্তা অথচ একান্ত অনুরাগিণী শ্রী, স্বামীর মিলনাহ্বান না শুনিয়া, 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' হইবার আশঙ্কায়, স্বেচ্ছায় আপনাকে সুদূরে নির্ব্বাসিত করিল। 'সহবাস থাকুক আর না থাকুক', সীতারাম যে তাহার প্রিয়, কি না প্রিয়তম, সে সম্বন্ধে যখন শ্রী নিঃসংশয়, তখন সীতারামের জন্ম-পত্রিকার নির্দ্দিষ্ট ফল সে কেমন করিয়া নিকটে থাকিয়া ফেলিতে দিবে? হিন্দু স্ত্রী হইয়া সে কিনা স্বামিবধের হেতু হইবে? অতএব সীতারামকে বলিয়া গেল, 'তুমি আমার চিরপ্রিয়—এ কথা লুকানো আমার আর উচিত নহে। আমি এখন হইতে তোমার শতযোজন তফাতে থাকিব।' শতযোজন তফাতেই শ্রী চলিয়া গেল।

তার পরে শ্রীক্ষেত্রের পথে দেখি মর্ম্মভেদী বিরহবেদনার পূর্ণপ্রকাশ! সঙ্গিনী জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দিন কাটাইবে কি প্রকারে কখনও কি ভাবিয়াছ ?

শ্রী। না। ভাবি নাই। কিন্তু এতদিন ত কাটিয়া গেল।

জয়ন্তী। কিরূপে কাটিল ?

শ্রী। বড় কষ্টে—পৃথিবীতে এমন দুঃখ বুঝি আর নাই।

জয়ন্তী। ইহার এক উপায় আছে—আর কিছুতে মন দাও।

শ্রী। কিসে মন দিব ?.........পাপে ?

জয়ন্তী। না। পুণ্যে।

শ্রী। স্ত্রীলোকের একমাত্র পুণ্য স্বামীসেবা। যখন তাই ছাড়িয়া আসিয়াছি—তখন আমার আবার পুণ্য কি আছে ?

জয়ন্তী। স্বামীর একজন স্বামী আছেন।

শ্রী। তিনি স্বামীর স্বামী—আমার নন। * * *

জয়ন্তী। যিনি তোমার স্বামীর স্বামী, তিনি তোমারও স্বামী —কেন না তিনি সকলের স্বামী।

শ্রী। আমি ঈশ্বরও জানি না—স্বামীই জানি।

জয়ন্তী। জানিবে ? জানিলে এত দুঃখ থাকিবে না।

শ্রী। না, স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে আমার স্বামিবিরহদুঃখই আমি ভালবাসি।"

* * * * * *

"জয়ন্তী। এত ভাল বাসিয়াছিলে কিসে ?"

* * * * * *

"শ্রী বলিতে লাগিল 'যদি একত্র ঘর সংসার করিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমনটা ঘটিত না। মানুষ মাত্রেরই দোষগুণ আছে। তাঁরও

দোষ থাকিতে পারে। না থাকিলেও আমার দোষে আমি তাঁর দোষ দেখিতাম। কখন না কখন, কথান্তর, মনভার, অকৌশল ঘটিত। তা হইলে, এ আগুন এত জ্বলিত না। কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘষিয়া দেয়ালে লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তাঁর অঙ্গে মাখাইলাম। বাগানে ফুল চুরি করিয়া তুলিয়া, দিনভোর কাজকর্ম্ম ফেলিয়া অনেক পরিশ্রমে মনের মত মালা গাঁথিয়া, ফুলভরা গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে করিয়াছি তাঁর গলায় দিলাম। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটি করিয়া রন্ধন করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি, তাঁকে খাইতে দিলাম। ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া কখনও মনে হয় নাই যে ঠাকুর প্রণাম করিতেছি—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি। তারপরে জয়ন্তী—তাঁকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ডাকিলেন, তবু ছাড়িয়া আসিয়াছি।'

শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

জয়ন্তীরও চক্ষু ছল ছল করিল।" * * * *[১]

শ্রীর জীবনের প্রথমাঙ্কের এই যে পরিচয় আমরা এখানে পাই তাহাতে আমাদের চোখেও যদি বা অশ্রু ফুটিয়া উঠে তাহা হইলেও লক্ষ্যহারা হইলে চলিবে না। এই কল্পনাবহুল, ভাবোচ্ছল, বিরহলালিত ভালবাসার বিচ্ছেদবিধুরতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ফুটিয়াছে তাহা অনুধাবনযোগ্য। শ্রীর 'বড়কষ্টে দিন কাটিতেছে' 'পৃথিবীতে এমন দুঃখ বুঝি আর নাই'। অথচ শ্রী

১ খ: ১৪ প: ৪৩—৪৫ পৃ:

বলিতে চায় ঈশ্বর পাইলে যে সুখ তদপেক্ষা স্বামিবিরহ-দুঃখই বেশী ভালবাসে। তা' যতই ভালবাসুক এই দ্বন্দ্বে মানুষের মন টিকিয়া থাকা অসম্ভব। ইহার নিরসনের উপায়, হয় আত্মহত্যা নয় আত্মজয়। জয়ন্তীকে না পাইলে, হয়ত বৈতরণীতীরে আত্মহত্যায় শ্রী তাহার দুঃসহ 'জ্বালা' জুড়াইত। কিন্তু জয়ন্তী আনিয়া দিল শ্রীর নিঃসঙ্গ জীবনে নিত্যসঙ্গিনীর স্নেহস্পর্শ; আর নির্দ্বন্দ্বজীবনের প্রাণবান আদর্শ। তাহার স্নেহময় শিক্ষায় ও সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তের প্রেরণায় ভূষণার শ্রী মরিয়া পুরুষোত্তমে জন্মান্তর গ্রহণ করিল।

কেহ কেহ বলেন শ্রীর এই পরিবর্ত্তনের ধারা বা ক্রম বঙ্কিম একপ্রকার উহ্য রাখিয়া গিয়াছেন। জয়ন্তীর আধ্যাত্মিক উপদেশ ও সন্ন্যাসিনী-জীবনের প্রভাবের বিস্তৃত বর্ণনা করিলে তাঁহারাই হয়ত আবার বলিতেন অভ্যাসযোগের ব্যাখ্যা বা গীতার—

'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে'

শ্লোকাংশের ভাষ্য লেখা হইয়াছে। নিত্য সাধুসঙ্গ দূরের কথা সাধুজনের সমাধিস্থলের পুণ্যপ্রভাব একদিনে মানুষের মনে কত বড় ভাবান্তর উপস্থিত করিতে পারে আমরা Thaisএর চরিত্রেই ত তাহা দেখিতে পাই। আমাদের দেশের পুণ্যক্ষেত্র বা ধর্ম্মজীবনের সেরূপ প্রভাব যদি আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত না থাকি তাহা হইলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

'অনেক দিন পরে' পুরুষোত্তম হইতে ফেরার পথে

বিরূপাতীরে আমরা আবার শ্রীর সাক্ষাৎ পাই। যাওয়ার পথে বৈতরণীতীরে মরণাধিক যন্ত্রণায় অভিভূত ও অধীর শ্রী, আর ফেরার পথে বিরূপাতীরে শান্ত নির্দ্বন্দ্ব সংসারবিমুখী সন্ন্যাসিনী শ্রী—উভয়ের মধ্যে কি গভীর প্রভেদ! প্রকৃতির সঙ্গীতে অভ্যস্ত শ্রুতিপথে সীতারামের কণ্ঠস্বর আর মনে বাজে না।[১] সুখ-দুঃখে বা শুভাশুভ চিন্তায় হৃদয় আর আন্দোলিত হয় না, প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবার আশঙ্কাও আর নাই, নূতন যুক্তির সন্ধান মিলিয়াছে 'কে কাকে মারে বহিন্, মারিবার কর্ত্তা একজন,' 'যিনি সর্ব্বকর্ত্তা তিনি যদি ঠিক করিয়া থাকেন যে আমারই হাতে তাঁহার সংসার-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি ঘটিবে, তবে কাহার সাধ্য তাহা অন্যথা করে'? আমি সাবধান হইয়া ধর্ম্মমত আচরণ করিব—তাহাতে তাঁহার বিপদ্ ঘটে, আমার তাহাতে সুখদুঃখ কিছুই নাই'।[২] স্বামিসন্দর্শনে যাইবার জন্যও পা বড় সরিতে চাহে না। কারণ জয়ন্তীর 'শিষ্যাকে নিয়া মহারাজাধিরাজ সীতারাম রায় সুখী হইবেন কি?' 'না' জয়ন্তী-'শিষ্যাই মহারাজাধিরাজ লইয়া সুখী হইবে?' 'রাজরাণীগিরি চাকরি' জয়ন্তী 'শিষ্যার যোগ্য নহে'।[৩] তবে যাওয়া কেন? ঠাকুরের (গঙ্গাধর স্বামীর) আদেশ—পরোপকারার্থ। জনৈক প্রখ্যাত সমালোচক বলিয়াছেন "শ্রী একটা প্রহেলিকা;

---

১ ২।৮।৬৪ পৃঃ।

২ ২।৮।৬৫ পৃঃ।

৩ ঐ

সন্ন্যাসিনী ভৈরবী বটে কিন্তু জগন্নাথের রথের দড়ির টানের মত তাহার হৃদয়ে স্বামীঘর করিবার সাধটুকু বেশ জাগিতেছে'।[১] সমালোচক মহাশয় যাহাই বলুন, সন্ন্যাসিনী শ্রী প্রহেলিকা নহে। সে কাহারও 'চরণে বাঁধিয়া প্রেমবাহু-ঘেরা অশ্রুকোমল শিকলি' দিতে আগ্রহী নহে। 'স্বামী-ঘর করিবার সাধটুকু বেশ জাগিতেছে' ইহাও সত্য নহে। সন্ন্যাসিনী শ্রী সে সাধ বা টান মুক্ত। জয়ন্তীশিষ্যা যে এখানে দো-ভাষী কথা বলিতেছে না বা আত্মপ্রতারণা করিতেছে না তাহা সীতারামের সহিত পুনঃ সাক্ষাতের প্রথম দিনেই যখন বলিল 'যে দিন তোমার মহিষী হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও হইতে চাহিতাম না, আমার সে দিন গিয়াছে', আর 'যে সব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে তাহার পতিসেবাও ধর্ম্ম নহে'[২] তখনই বুঝিতে পারি। চিত্তবিশ্রাম হইতে পলায়নের সঙ্কল্পেও তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইবে।

সে যাহা হোক একপক্ষের প্রগতির অভিমুখ সুস্পষ্ট—সংসার হইতে অসংসারিত্বে, অনুরাগ হইতে অনাসক্তিতে, কর্ম্ম হইতে কর্ম্ম-সন্ন্যাসে, দ্বন্দ্ব হইতে দ্বন্দ্বরাহিত্যে, ব্যথাবেদনা হইতে সুখ-দুঃখের অতীত সমত্বে।

অপর পক্ষের অধোগতির ধারাটি কেমন? শ্রী অপূর্ব্ব রূপদীপ্তি ও অপরূপ বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি দেখাইয়া অন্ধকারে

---

১ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' ('নারায়ণ'—বৈশাখ ১৩২২, ৫৪২ পৃঃ)।

২. ৩।৭।১০৩ পৃঃ।

অন্তর্হিত হইল—শত যোজন তফাতে, সুদূরে চলিয়া গেল। সীতারামের জন্য রাখিয়া গেল অনুধ্যানের ইষ্টমূর্ত্তি, চিরবাঞ্ছিতার স্বপ্ন। সীতারাম দেশবিদেশে নানাস্থানে লোক পাঠাইয়া অনুসন্ধান করিয়াও যখন শ্রীর সংবাদ পাইলেন না, তখন মহারাজ-উপাধি লাভের জন্য দিল্লীর সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সুযোগে হোক আর অছিলায় হোক, নিজেই নানাস্থানে শ্রীর অনুসন্ধান করিতে গেলেন। অনুসন্ধানে শ্রী লাভ হইল না, পক্ষান্তরে যে মহদুদ্দেশ্য সাধনে 'সিংহবাহিনী-রূপা' শ্রীর যোগ্যতা বুঝিয়া ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া সীতারাম শ্রী-লাভের জন্য সমুৎসুক হইয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য ক্রমশঃ মনের বাহিরে চলিয়া যাইতে লাগিল। শেষে তথাকথিত উপায় উদ্দেশ্যকে তিরোহিত করিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করিল। ইংরাজী মনোবিজ্ঞানে যাহাকে বলে transference of interest from end to means, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকৌশলে সম্পুর্ণরূপে তাহাই ঘটিল।

গ্রন্থকার কিন্তু শুধু ইহার বর্ণনা করেন নাই। সীতারাম চরিত্রের এই পরিণতি সীতারামের এই সময়কার এক উক্তিতেই পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। নগরপাল গঙ্গারামের সহিত ষড়যন্ত্রমূলে তোরাব খাঁর সৈন্যের একাংশ অলক্ষিতে নগরের অপর পারে মধুমতীতীরে উপস্থিত, নদী পার হইয়া রাজপুরী অধিকার করিতে উদ্যত। এমন সময়ে জয়ন্তী ও শ্রী মহম্মদপুরে উপনীত হইলেন। জয়ন্তী দেখিলেন রাজপুরী রক্ষার কোন

ব্যবস্থাই নাই। রাজপুরীর নদীর ঘাটে যে কামান স্থাপিত রহিয়াছে তাহা যদি দক্ষতার সহিত ব্যবহৃত হয় তবেই তোরাবের সৈন্যের নদী পার হইয়া রাজপুরী দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে। কামান চালাইতে সক্ষম একজন বীরপুরুষও সেখানে উপস্থিত। তিনি গুলী-বারুদ ও একজন সহকারী পাইলে কামান ছুড়িতে পারেন। জয়ন্তী গঙ্গারামের চিত্ত অভিভূত করিয়া গুলী-বারুদও আনিয়া দিলেন। কিন্তু বীরপুরুষটির অর্থাৎ সীতারামের তখন পুরী রক্ষা করিলে 'শ্রী' লাভ হইবে কিনা, পুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে কল্পিত জয়ন্তীর নিকট সেই বর বা প্রতিশ্রুতি আদায়ের চিন্তাই বেশী। যে পুরীর সহিত তাঁহার সমস্ত কীর্ত্তিকলাপ ও রাজসম্ভ্রম জড়িত, যাহার মধ্যে তাঁহার ধনসম্পদ্ ও প্রজাবর্গ শুধু নহে, তাঁহার দুই মহিষী ও সন্তান-সন্ততি অবস্থিত, সীতারামের কাছে তাহা রক্ষার প্রয়োজন বা মূল্য তবেই আছে যদি যুদ্ধের ফলে শ্রীকে পাওয়া যায়। তাই জয়ন্তী যখন তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি চাও'? উত্তর হইল 'যা চাই, পুরী রক্ষা করিলে তা পাইব?'[১] জয়ন্তীকে বলিতে হইল 'পাইবে'। তবে সীতারাম কামান চালাইতে ও শত্রুধ্বংস করিতে প্রস্তুত হইলেন। শত্রুর সম্মুখে বীরের কর্ত্তব্য, পৌরজন সম্বন্ধে রাজার কর্ত্তব্য, পুত্র-পত্নী-পরিজন সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কর্ত্তব্য, সবই

১ ২।১৩।৭৩ পৃঃ।

তখন বিস্মৃত,[১] অন্তরে জাগিতেছে শুধু শ্রীর চিন্তা ও শ্রীলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

এই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট কামাকুল সীতারামের অতিসন্নিধানে বঙ্কিম শ্রীকে ফিরাইয়া আনিলেন যেন শুধু চরিত্র দুইটির সে দিনকার বিপরীত গতি ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য। শ্রী ও সীতারাম পরস্পরের অতি-নিকটে আসিল, অথচ সেদিন উভয়ের অন্তরের কি গভীর ব্যবধান! একজন জ্ঞানের পথে, সাধনার পথে, উঠিয়াছে অনাসক্তির উর্দ্ধস্তরে, আর একজন মোহের পথে, কামনার পথে নামিয়াছে আসক্তির অধস্তম পঙ্কে। একজন সুসংযত ও সতর্ক, মুক্তিপথের যাত্রী—শঙ্কিত পাছে সে যাত্রাভঙ্গ ঘটে[২]। আর একজন অসংযত, বেপরোয়া, মৃত্যু-পথের পথিক—সব কিছু বলি দিতে প্রস্তুত কামনার বেদীমূলে। দিলও তাহাই, রাজার কর্ত্তব্য, রাজার সম্পদ্, রাজার সুখ্যাতি, চাঁদশাহের মত বন্ধু, চন্দ্রচূড়ের মত গুরু। আরও বিসর্জ্জন দিল, মানুষের আত্মসম্ভ্রম, নারীর মর্য্যাদাবোধ, প্রকাশ্য নারী-নির্য্যাতনে দ্বিধাটুকু পর্য্যন্ত। জয়ন্তীকে বেত্রাঘাত করিবার আদেশ যে সীতারাম দিতেছে তাহাকে Thaisএর

১ "Experience, manhood, honour, ne'er before
Did violate so itself." Shakespeare : 'Anthony and
Cleopatra' (Act III, Sc. X, Ll. 23-24)

২ "শ্রী। তাতে পুরাণ কথা মনে আসে, আবার কি ভালবাসার ফাঁদে পড়িব? তাই আগেই বলিয়াছিলাম, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করাই ভাল। শত্রু রাজা লইয়া বারজন।" ৩।১৬।১২৫ পৃঃ।

Albinaর উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া কে না বলিবে 'wretch', আর শ্রীর প্রতি বলপ্রয়োগের সঙ্কল্প যে সীতারাম করিল Paphnutiusএর মত 'vampire' বলিয়া সেই বা অভিহিত না হইবে কেন ?

কিন্তু কেমন করিয়া একই বিচ্ছেদের আঘাতে এমন পৃথক্ ফল ফলিল ? Thaisএর নায়ক-নায়িকার জীবন-ধারার সূচনা বিভিন্ন, যে যে সঙ্কটে উভয় স্রোত উজান বহিল তাহাও বিভিন্ন, পরিণতি ত বিপরীতই বটে। কিন্তু একই সঙ্কট বা crisisএর ফলে সীতারাম ও শ্রীর ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত দুইটি জীবনের এমন বিসদৃশ গতি ও পরিণতি হইল কেমন করিয়া ? চরিত্র দুইটির পরিকল্পনায় বঙ্কিম এমন কি সৃষ্টি-কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন যাহাতে একই আঘাতের ফলে উভয় চরিত্রের এমন বিভিন্ন অভিব্যক্তি সুসম্ভব ও সুসঙ্গত হইল ? বাস্তবিক তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার বিষয়। শ্রী বিবাহিতা, কৈশোরে বিবাহের পর হইতেই পতিবিযুক্তা। হিন্দুর মেয়ের চিরকালের সংস্কার, সুসংযত জীবন, অতৃপ্ত প্রেম, সবগুলি একত্র হইয়া তাহার মনে এক আদর্শ ( ideal ) সীতারাম সৃষ্টি করিয়াছিল এবং আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি এই প্রেমদেবতাই তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তাহার উপরে আসিল 'প্রিয়প্রাণ-হন্ত্রী' হইবার আশঙ্কা, বিচ্ছেদের মরণাধিক যন্ত্রণা, মহাতীর্থে জয়ন্তীর নিত্যসঙ্গ ও সন্ন্যাসে দীক্ষা, এবং তাহার ফলে দুঃসহ ব্যথার জীবনের ক্রমবিলয়। প্রথম জীবনের সংযম ও

ঐকান্তিক নিষ্ঠার ক্ষেত্রেই পরবর্ত্তী জীবনের এমন বিকাশ সুসম্ভব হইয়াছিল—কেবল জয়ন্তীর সহিত সাক্ষাতে নহে।

সীতারামের পক্ষে শ্রীর বিচ্ছেদ যে ভাবান্তর সৃষ্টি করিল তাহার কারণও তেমনই সীতারামের উপন্যাস-জীবনেই অনুসন্ধান করিলে কি দেখিতে পাই? সীতারাম বিশিষ্ট ভূস্বামী, সুখে-সম্ভোগে আজীবন লালিত। শ্রীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীর কথা মন হইতে একপ্রকার মুছিয়াই গিয়াছিল। "শ্রী তখন বড় বালিকা। তারপর সীতারাম ক্রমশঃ দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। তপ্তকাঞ্চনশ্যামাঙ্গী নন্দাকে বিবাহ করিয়াও বুঝি শ্রীর খেদ মিটে নাই—তাই তাঁর পিতা আবার হিমরাশিপ্রতিফলিত-কৌমুদী রূপিণী রমার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।" কিন্তু নব নব ইন্ধনে উদ্দীপিত সম্ভোগ-তৃষ্ণার কি শেষ আছে? কাজেই যে দিন রাত্রে প্রোদ্ভিন্ন-যৌবনা শ্রী গঙ্গারামের জীবন রক্ষার আবেদন লইয়া দেখা দিল "সে দিন রাত্রিতে শ্রীর চাঁদপানা মুখখানা, ঢলঢল, ছলছল, জলভরা, বলহারা, চোখ দুটো বড় গোল" করিল। তবু সীতারামের পক্ষ হইয়া বঙ্কিম বলিতেছেন "রূপের মোহ? আ, ছি! ছি! তা' না! তবে তার রূপেতে, তার দুঃখেতে, আর সীতারামের স্বকৃত অপরাধে, এই তিনটায় মিশিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছিল। তা যা হউক—তার একটা বুঝা-পড়া হইতে পারিত; ধীরে, সুস্থে, সময় বুঝিয়া"। কিন্তু পরদিন গঙ্গারামের কবরক্ষেত্রে বৃক্ষারূঢ়া "সেই সিংবাহিনী মূর্ত্তি! আ, মরি মরি

এমন কি আর হয়!" কাজেই রাজসিক জীবনে তরঙ্গ উঠিল। যে প্রেমনিষ্ঠায় বা সংযম অভ্যাসে সে তরঙ্গ রোধিবার শক্তি লাভ হয় তাহার কোনটাই সীতারামের ছিল না, দীক্ষাও বাহির হইতে মিলিল না। অতএব সেই তরঙ্গ শ্রীর আবির্ভাবে ও অপসরণে, অদর্শনে ও নিয়তস্মরণে প্রবৃদ্ধ হইয়া যে প্লাবনের সৃষ্টি করিল তাহাতে মনুষ্যত্বের সকল চিহ্নই ভাসিয়া গেল।

কাজেই একথা ঠিক যে নায়ক-নায়িকা চরিত্র দুইটির বিপরীতমুখী বিকাশ ও সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিণতি দেখানই Anatole Franceএর মত বঙ্কিমের উদ্দেশ্য হইলে চিত্তবিশ্রাম হইতে শ্রীর পলায়ন ও জয়ন্তীর বেত্রাঘাতে হয়ত উপন্যাস সমাপ্ত হইতে পারিত। অথবা তাহার অব্যবহিত পরে সীতারামের পরাজয় ও ধ্বংসের কাহিনী জুড়িয়া দিলে 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে দুর্য্যোধনের রাজ্য গেল' এমন একটা সহজ সিদ্ধান্তে পাঠক উপনীত হইতে পারিত।[১] কিন্তু তাহাতে উপন্যাসখানির বৃহত্তর উদ্দেশ্য সফল হইত না, বীভৎস ও রুদ্ররসে গ্রন্থ সমাপ্ত হইত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মহতের আত্মবিস্মৃতি, ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাকামী বীরের অধোগতি ও আত্মহনন, দেখান ব্যতীত

---

১ যথা, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন তাহা হইলে উপন্যাস হিসাবে সীতারামের যথাযথ পরিণতি হইত। "সিংহাসনে বসিয়া জয়ন্তীকে বিবসনা করিয়া বেত্রাঘাত করুক; আমরা তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, সর্ব্বগুণসম্পন্ন সীতারাম কেন রাজ্যভ্রষ্ট হইল।" "সীতারাম সে পাপটি করিল না, অথচ রাজ্যভ্রষ্ট হইল। এইখানেই ঔপন্যাসিকত্ব বিনষ্ট হইয়াছে। বিনাশ কে করিল? ভাবময় বঙ্কিম।" ('বঙ্কিম জীবনী" ৩৭৮ পৃঃ।)

তাহার মহৎসঙ্কল্পের বিফলতার জন্য বেদনা জাগাইয়া পাঠকের অশ্রু আকর্ষণ করাও উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য ছিল। সীতারামকে পশুত্বে কায়েমী করিয়া চিরঘৃণার পাত্র করিয়া রাখিলে দার্শনিকেরা যাহাকে বলেন 'moral order of the universe' তাহারই প্রতিপাদন হইত, কিন্তু কবি বঙ্কিমের উল্লিখিত উদ্দেশ্য সফল হইত না। তাই বীভৎস রস অতিক্রম করিয়া বীর রসের বা উৎসাহের নব উদ্দীপনায় গ্রন্থকারকে পৌঁছিতে হইয়াছে। জয়ন্তীর বেত্রাঘাতের আদেশ কার্য্যে পরিণত হইতে না পারায় সীতারাম যে "সর্ব্বগুণসম্পন্ন" রহিয়া গিয়াছে, তাহার মনুষ্যত্বের এমন কোন অপচার হয় নাই যাহাতে তাহার রাজ্যনাশ হইতে পারে, শচীশচন্দ্রের এই উক্তি আখ্যায়িকাবিরোধী কথা, অতএব ঠিক নহে। আর, বিবস্ত্রা জয়ন্তীকে বেত্রাঘাতে বিক্ষত না দেখিলে সীতারামের রাজ্যভ্রষ্ট হইবার কারণটি সুস্পষ্ট হয় না ইহা সাধারণ পাঠকও স্বীকার করিবে না। বরং বঙ্কিমের লেখনী যে ততদূর অগ্রসর হয় নাই ইহা তাঁহার ভাবসংযমের দৃষ্টান্ত বলিয়াই গ্রহণ করিবে। জয়ন্তীর বেত্রাঘাত এবং তাহার পরেই মুসলমান আক্রমণ, সীতারামের শিরশ্ছেদ ও রাজ্যধ্বংস হইলে বেশ নাটকোচিত ব্যাপার হইত বটে, কিন্তু তাহা হইলে জয়ন্তী-চরিত্রের পূর্ণ-বিকাশ দেখিবার সুযোগও আমাদের মিলিত না, আর যে ভুলগুলির সমষ্টি লইয়া গল্পের শোচনীয় পরিণতি তাহার উপলব্ধির অনুতাপে প্রধান চরিত্র দুইটির—একটির ম্রিয়মাণ,

অপরটির অবহেলিত—মানবতার সঞ্জীবিত সৌন্দর্য্য ও নববিকশিত মাধুর্য্য সীতারামের শেষদৃশ্যগুলি অতি করুণ করিয়া তুলিত না। শত্রুর আক্রমণ, নির্য্যাতিতের অভিশাপ ও সর্ব্বব্যাপী বিশৃঙ্খলার মধ্যে সমাগত সর্ব্বনাশের দিনে নিঃসহায় সীতারাম তাহার জীবনের হিসাব-নিকাশ করিতে গিয়া, অনুতাপের অনলে যে অনেকটা বিশুদ্ধ হইয়া দেখা দিল, জয়ন্তীর ক্ষমায় অভিষিক্ত হইয়া 'অগতির গতিকে' স্মরণ করিল, নবোৎসাহে দুর্জ্জয় বিপদ্ বরণ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইল, ইহাতেই ত পাঠক আমরা আমাদের করুণার পাত্র খুঁজিয়া পাই। পক্ষান্তরে যে শ্রী উড়িষ্যা হইতে যাত্রাকালে সন্ন্যাসগর্ব্বে 'রাজরাণীগিরি চাক্‌রি জয়ন্তীশিষ্যার যোগ্য নহে' বলিয়াছিল, এবং দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরেও প্রথম সাক্ষাতে স্বামীর মিলনাহ্বান উপেক্ষা করিয়া 'যে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়াছে তাহার পতিসেবাও ধর্ম্ম নহে' উক্তি করিতে পারিয়াছিল, তাহাকে যখন অবশেষে চরমদুর্দ্দিনে সীতারামের পায়ে হাত দিয়া বলিতে দেখি 'আমি আর সন্ন্যাসিনী নই' 'আমায় ক্ষমা কর, আমায় আবার গ্রহণ কর,' তখন মনে হয় শুধু জয়ন্তীর উপদেশ নহে, মোহমুক্ত সীতারামের প্রায়শ্চিত্ত-সঙ্কল্প ও আত্মাহুতির পণ কাব্যের দিক্ দিয়া এক অভাবনীয় সার্থকতা লাভ করিয়াছে।[১] আর, মহম্মদপুর রক্ষার বিনিময়ে চরম লাঞ্ছনা

১ যদিও আমাদের মনে হয় শ্রীর এই ক্ষমা প্রার্থনা সমাপ্তিতে সীতারামের সঙ্গত্যাগ করিয়া জয়ন্তীর সহিত অন্তর্দ্ধানে অনেকাংশে মূল্যহীন হইয়া গিয়াছে।

সহিয়াই বা জয়ন্তী-চরিত্রের সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ হয় কেমন করিয়া? সে ত সহিষ্ণুতার জয়, 'স্থিতধী'র পরিচয় মাত্র। কিন্তু যে 'জগদীশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করিতে শিখিয়াছে' তাহাকে ত শুধু 'অদ্বেষ্টা' হইলে চলিবে না, 'মৈত্রঃ করুণ এব চ' হইতে হইবে, 'নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ' হইলেও চলিবে না, 'ক্ষমী' হইতে হইবে। আবার, সীতারামকে শুধু ক্ষমা করিয়া ছাড়িয়া দিলেও চলিবে না। 'তাহার যে মতিগতি তাহাতে সে ত উৎসন্ন যায় আর বিলম্ব নাই'। অতএব এ দুর্দ্দিনে পতিত সীতারামকে পতিতপাবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। 'অনন্ত দয়ার আধারে তাহার জন্য কি একটু দয়া নাই?' 'আমি জানি ডাকিলে তিনি অবশ্য শুনেন। সীতারাম ডাকে না ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে—নহিলে এমন করিয়া ডুবিবে কেন?' 'তা সে না ডাকুক আমি তার হইয়া জগদীশ্বরকে ডাকিব, তিনি কি শুনিবেন না? আমি যদি বাপের কাছে আবদার করি যে এই পাপিষ্ঠ সীতারামকে পাপ হইতে মোচন কর, তবে কি তিনি শুনিবেন না? জয় জগন্নাথ! তোমার নামের জয়! সীতারামকে উদ্ধার করিতে হইবে।'[১] —ক্ষমাময়ী জয়ন্তীর এই আবেদনের পরে সীতারামের ভগবৎ-স্মরণ ও বন্দনা যেন গল্পধারার সহজ প্রবাহই হইয়া উঠিয়াছে, যদিও অত্যাসন্ন সর্ব্বনাশের বজ্রনিঃস্বনে জাগ্রত সীতারামকে

১ ৩।২০।১৩৮ পৃঃ

তাহার পল্বলপঙ্কের পূতিগন্ধে তৎপূর্ব্বেই শিহরিয়া উঠিতে দেখি—কিন্তু বড় বিলম্বে।

ফল, পতিত সীতারামের অন্তিম পুনরুত্থানে ও অনিবার্য্য পরাজয়ে ক্ষুব্ধ পাঠকের যে অশ্রুকণা বা দীর্ঘশ্বাস ফুটিয়া উঠে সীতারামের শোকাবহ কাহিনীর (tragedyর) সার্থকতার তাহাই পরিমাপ।[১] উপদেষ্টা হিসাবে নহে, রসস্রষ্টা হিসাবে পাঠকের অন্তরে করুণরস উদ্রেক করিয়া বঙ্কিম যেন বলিতে চাহিয়াছেন, যদি সময় থাকিতে সীতারাম বুঝিত যত বড় উদ্দেশ্য তত বড় সংযত সাধনার (discipline-এর) প্রয়োজন, যদি বুঝিত ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠায় ভগবানের 'নিমিত্ত' কর্ত্তব্যপরায়ণ নরোত্তমই হইতে পারে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট নরপশু নহে, যদি শ্রী জীবনের কর্ত্তব্য ভুলিয়া কর্ম্মবিমুখ সন্ন্যাসে শান্তি বা তৃপ্তি না খুঁজিত, যদি দেবী বা শান্তির মত তাহার আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োগক্ষেত্র যথাসময়ে খুঁজিয়া পাইত, তাহা হইলে সীতারামের মহান্ উদ্দেশ্য বিরাট ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইত না। তত্ত্বের দিক্ দিয়া এই tragedy এক দিকে অর্থাৎ সীতারামের পক্ষে যেমন

'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে'

ইত্যাদি বাক্যের দৃষ্টান্ত, অপর দিকে তেমনই—

'তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে'

ভুলিয়া পরিণীতা শ্রীর 'ভয়াবহ পরধর্ম্ম' চর্চ্চার শোকাবহ

১ পরে দেখিব বঙ্কিম নন্দার মুখে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

কাহিনী। 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়', এযুগে রসাত্মক বাক্যে, শ্রীর চিত্রে, বঙ্কিমই তাহা প্রথম প্রচার করেন, কিন্তু মানুষের পক্ষে আরও বড় কথা সমস্বরে প্রচার করিয়া, অর্থাৎ 'সুখানুশয়ী রাগ'* যে কোন মুক্তিরই সাধন নয় সীতারামের কাহিনীতে তাহার বিশদ বর্ণনা করিয়া। আবার যে প্রেম প্রকৃতি পরবশতার উর্দ্ধে উঠিতে পারে, জীবনের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালনে উন্মুখ, সানন্দে সকল দুঃখ-দুর্ভাগ্য বরণ করে, সম্মিলিত জীবনধারার একই পরিণাম ( destiny ) অঙ্গীকার করে, বঙ্কিম পরাজয়ের কাহিনীতেও তাহার কণ্ঠে বরমাল্য দোলাইয়া দিবার অবকাশ করিয়া লইয়াছেন।

তাই মহানিশার ঘনীভূত অন্ধকারে সকল চরিত্রই যখন মেঘমুক্ত জ্যোতিষ্কের মত স্ব স্ব কিরণে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখন দুর্গতির দিনেও সীতারামের পাশে প্রায় অদৃশ্য থাকিয়া যে নন্দা কোন সময়ে আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয় নাই বরং নিদারুণ অকর্ত্তব্যের ও দুষ্কৃতির হাত হইতে পুনঃ পুনঃ সীতারামকে রক্ষা করিয়াছে—মুমূর্ষু রমার পাশে সীতারামকে পাঠাইয়াই হোক, আর জয়ন্তীর বেত্রাঘাতে বাধা জন্মাইয়াই হোক,—দেখি শেষ মুহূর্ত্তে বঙ্কিম তাহাকে ভুলেন নাই; সীতরাম পাঠের সম্পূর্ণতার জন্য আমাদেরও তাহাকে ভুলিলে চলিবে না। শত্রু যখন গড় ঘেরিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রায়

---

* যোগসূত্র ২।৭

**সকলেই যখন রাজভবন ছাড়িয়া পলাতক, তখন পরিত্যক্ত অন্ধকার রাজপ্রাসাদে অপ্রমত্ত সীতারাম—**

"নন্দার ভবনে গিয়া দেখিলেন নন্দা ধূলায় পড়িয়া শুইয়া আছে, চারি পাশে তাহার পুত্রকন্যা এবং রমার পুত্র বসিয়া কাঁদিতেছে। রাজাকে দেখিয়া নন্দা বলিল, 'হায় মহারাজ! এ কি করিলে!'

রাজা বলিলেন, 'যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহাই করিয়াছি'।

* * * *

নন্দা। মহারাজ! শরীর ধারণে মৃত্যু আছেই। সেজন্য দুঃখ করি না। তবে তুমি লক্ষ যোদ্ধার নায়ক হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মরিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব—তাহা অদৃষ্টে ঘটিল না কেন?

রাজা। লক্ষ যোদ্ধা আমার নাই, একশত যোদ্ধাও আমার নাই। কিন্তু আমি যুদ্ধে মরিব * * তোমাকে বলিতে ও হাতিয়ার লইতে আসিয়াছি।

নন্দার চক্ষুতে বড় ভারি বেগে স্রোত বহিতে লাগিল; কিন্তু নন্দা তাহা মুছিল। বলিল 'মহারাজ! আমি যদি ইহাতে নিষেধ করি, তবে আমি তোমার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তুমি যে প্রকৃতিস্থ হইয়াছ, ইহাই আমার বহু ভাগ্য—আর যদি দুদিন আগে হইতে। তুমিও মরিবে মহারাজ! আমিও মরিব—তোমার অনুগমন করিব। কিন্তু ভাবিতেছি—এই অপোগণ্ডগুলির কি হইবে! ইহারা যে মুসলমনের হাতে পড়িবে।'

এবার নন্দা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

রাজা বলিলেন, 'তাই তোমার মরা হইবে না। ইহাদিগের জন্য তোমাকে থাকিতে হইবে।'

নন্দা। আমি থাকিলেই বা উহারা বাঁচিবে কি প্রকারে?

রাজা। নন্দা! এত লোক পলাইল—তুমি পলাইলে না কেন? তাহা হইলে ইহারা রক্ষা পাইত।

নন্দা। তোমার মহিষী হইয়া আমি কার সঙ্গে পলাইব মহারাজ? তোমার পুত্রকন্যা আমি তোমাকে না বলিয়া কাহার হাতে দিব? পুত্র বল, কন্যা বল, সকলই ধর্ম্মের জন্য। আমার ধর্ম্ম তুমি। আমি তোমাকে ফেলিয়া পুত্রকন্যা লইয়া কোথায় যাইব?

রাজা। কিন্তু এখন উপায়?

নন্দা। এখন আর উপায় নাই।"

* * * *

তাহার পরে দেখি সূচীব্যূহ মধ্যে শিবিকায় পুত্রকন্যা সহ নন্দা যুগ্ম তারার মত সীতারামের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গিনী। নন্দার অশ্রু, বাৎসল্য, ও পতিপ্রেম যেমন একদিকে তাহার নারী-চরিত্রে বাস্তবতা আনিয়া দিয়াছে, তেমনই মৃত্যুমুখে তাহার নির্ভয় ও সাগ্রহ অনুগমন তাহাকে রাজমহিষীরই উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। নন্দার নিকট হইতে 'মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা' 'সকলই' পাইয়াও[১] দূরস্থিত 'নূতনের' মোহে, 'হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী'র সন্ধানে সীতারাম আত্মহত্যার পথে প্রায় শেষসীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন; নিকটের, পরিচিতের দিকে ভাল করিয়া চাহিবারও বুঝি অবকাশ পান নাই। কিন্তু যে তাঁহার, আত্মরক্ষার উপদেশ

১ ১।১০ পঃ।

না শুনিয়া, জয়ন্তীর মত কাহারও উপদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া, স্বপ্রণোদিত হইয়া, তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের অংশভাগিনী, দুর্দ্দিনের সঙ্গী, মহাযাত্রার পথে অবিচ্ছিন্না সহযাত্রী—গ্রন্থশেষে দেখি সে নন্দা।

গঙ্গারামের পরিচালিত শত্রুপক্ষের কামানের মুখ হইতে সীতারামকে বাঁচাইয়া এবং গঙ্গারামের শিরশ্ছেদের সহায়তা করিয়া যে ভাইকে দুইবার বাঁচাইয়াছে অবশেষে অজ্ঞাতে শ্রী তাহারই প্রাণ-হন্ত্রী হইল বটে, কিন্তু সীতারামের প্রাণ অপেক্ষা মূল্যবান অনেক কিছুর হত্যাসাধন করিয়া। জ্যোতির্ব্বিদ গঙ্গাধরস্বামী গণনার ফলে শ্রী সীতারামকে বাঁচাইতে পারিবে হয়ত এমন একটা কিছু বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া তাহাকে মহম্মদপুর যাত্রার উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু "জীবনে মরণ করিয়া বহন" সীতারাম যদি গঙ্গারামের লক্ষ্য হইতে বাঁচিয়াও থাকে তবে মৃত্যুর পথেও অমৃতস্পর্শ আনিয়া দিয়াছিল, জয়ন্তী-সঙ্গিনী অসংসারী শ্রী নয়, মর্ত্ত্যবাহিনী অলকানন্দা, নন্দা। সন্ন্যাসিনী শ্রীর কর্ত্তব্য-বিমুখী বৈরাগ্য, কর্ত্তব্য-বিস্মৃত সীতারামের অতি-আসক্তি, উভয়কেই তিরস্কৃত করিয়া নন্দার সহধর্ম্মিনীর কর্ত্তব্য পালনের মনোজ্ঞ চিত্রে সীতারাম উপন্যাস যে higher humanism এর পথনির্দ্দেশ করিয়াছে তাহাই গ্রন্থখানির তথা বঙ্কিমসাহিত্যের ভারতীয় সংস্কৃতিসম্মত শাশ্বতী বাণী। 'সিংহবাহিনীরূপা' শ্রী ও কর্ত্তব্য-কুশলা নন্দার সম্মিলিত আনন্দরূপের, অবিচল সংযম ও

'স্বধর্ম্ম'নিষ্ঠার[১] পাথেয় অবলম্বনে স্বাধীনতা রক্ষার সফল প্রযত্নের সুবৃহৎ আলেখ্য, অর্থাৎ সীতারাম ব্যতিরেকে মুখে যে সিদ্ধান্ত যুগল প্রচার করিতে চাহিয়াছে অন্বয়মুখে তাহার প্রতিষ্ঠা ও চারুচিত্র, অতঃপর বঙ্কিমসাহিত্যেই দেখিবার আশায় আমরা সীতারামের আলোচনা এইখানে সমাপ্ত করিলাম।

১ 'স্বধর্ম্ম' শব্দটি ভগবদ্‌গীতায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এখানেও সেই অর্থে ব্যবহার করা হইল।

# ইন্দিরা

# ইন্দিরা

( ১৮৯৩ )

মনে হয় সীতারাম লিখিয়া বঙ্কিম তাঁহার ঔপন্যাসিক-জীবন সমাপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। সীতারামের পরে নূতন নামে তিনি আর কোন উপন্যাস লেখেন নাই। প্রচারে'র প্রবর্ত্তক হয়ত মনে করিয়াছিলেন জীবনসন্ধ্যা ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনায় ও হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য-ব্যাখ্যায় কাটাইয়া দিবেন। জীবনের সূর্য্য যে দ্রুত অস্তাচলে নামিতেছে পুনঃ পুনঃ অসুস্থতার মধ্যে তাহাও লক্ষ্য করিতেছিলেন, চাকরিতেও অরুচি আসিয়া যাইতেছিল। ১৮৮৮ সালে আলীপুরে বদলী হইয়া আসিলেন, 'ধর্ম্মতত্ত্ব'ও প্রকাশিত হইল। ১৮৯০ সালে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই অবসর পাইবার আবেদন করিলেন; ১৮৯১ সালে অবসরও মিলিল। আশা করিয়াছিলেন অবকাশ পাইলে, ভগ্নস্বাস্থ্যেও লেখার সুযোগ হইবে, * কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে অনেক ক্ষেত্রে জীবনে তাহা ঘটে না। কোন্ জীবনের বাঁশীতে কতদিন সুর ফুটিবে, আর কি সুরই বা ফুটিবে তাহা শুধু বংশীধরই জানেন। গভীর তত্ত্বালোচনার পরিশ্রম

---

* 'বঙ্কিম জীবনী'তে প্রকাশ ছোট লাট Sir Charles Elliot বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তুমি বই লিখিবার জন্য কি অবসর খুঁজিতেছ?" তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র নাকি উত্তর করিয়াছিলেন "কতকটা তাই বটে।"

বঙ্কিমের শরীরে আর কুলাইল না; কিন্তু যে ঝঙ্কার তুলিয়া তাঁহার জীবন-বাঁশী চিরদিনের মত নীরব হইয়া গেল তাহা উদাসীর পূরবী সুরে বাঁধা নয়—বাঁধা উৎসাহের হিন্দোলে। তাহাতে ক্লান্তি বা অন্ধকারের ছায়া নাই, আছে অফুরন্ত আনন্দ, আর অস্তরবির দীপ্তিমুখর বাণী।

এই বিদায়বেলার রচনা হইতেছে পরিবর্দ্ধিত ইন্দিরা, আর পুনঃপ্রণীত রাজসিংহ। সত্য বটে মূল ইন্দিরা বিষবৃক্ষের সমসাময়িক রচনা—প্রথম বৎসরের অর্থাৎ ১২৭৯ সালের বঙ্গদর্শনের চৈত্র সংখ্যায় বিষবৃক্ষের সমাপ্তির সহিত সেই ইন্দিরা প্রকাশিত হয়, কিন্তু সে আট পরিচ্ছেদের ক্ষীণাঙ্গী আখ্যায়িকা —ছোট গল্প মাত্র। পুস্তকাকারেও প্রথম সংস্করণ (১৮৭৩) হইতে চতুর্থ সংস্করণ পর্য্যন্ত সে ইন্দিরা ছোট গল্পই থাকিয়া যায়। ১৮৯৩ সালে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্ব বৎসরে (বাঙ্গলা হিসাবে মৃত্যুর বৎসরে) প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণে ইহা বাইশ পরিচ্ছেদের একখানি পূর্ণাবয়ব উপন্যাসে পরিণত হয় এবং এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম 'পুরাতন নামে এ একখানি নূতন গ্রন্থ' বলিয়া ইহার পরিচয় দেন। গ্রন্থকারের প্রদত্ত পরিচয় অনুসারে আমরা এই 'নূতন' গ্রন্থের বা রূপান্তরিত ইন্দিরারই আলোচনা করিব।

বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম কিন্তু ইহাও বলেন "ইন্দিরা বড় হইয়া ভাল করিয়াছে কি মন্দ করিয়াছে, সেটা খুব সংশয়স্থল। সেটার বিচার আবশ্যক বটে। ছোট ছোট থাকিলেই ভাল।"

অতএব পুষ্টির সহিত ইন্দিরার সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে ইন্দিরার স্রষ্টারই যদি সংশয় থাকে তাহা হইলে পাঠকেরও সংশয় উপস্থিত হইলে বিস্ময়ের কিছু থাকিতে পারে না। আমাদের কিন্তু মনে হয় ছোট ইন্দিরা ও বড় ইন্দিরা রচনার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বিভিন্ন। ছোট 'ইন্দিরা' ছোট গল্প—স্বামি-সন্দর্শনে প্রথম যাত্রাপথে যে অপ্রত্যাশিত বিপত্তি ও বাধার উদ্ভব হইল, নায়িকার তীব্র মিলনাকাঙ্খা তাহা অতিক্রম করিয়া কেমন করিয়া দৃষ্টিবহির্ভূত মিলনভূমিতে গিয়া উত্তীর্ণ হইল তাহারই সংক্ষিপ্ত ও দ্রুতবর্ণিত কাহিনী। বড় ইন্দিরা মূলে সেই কাহিনী হইলেও ইহাতে অপরাপর চরিত্র ও চিত্রের ভাঁজ পড়িয়াছে, নায়িকার নিজের কথাও বাড়িয়াছে; ফলে নায়িকার আকৃতি যত তীব্রতর ভাবে প্রকাশিত হোক, গল্পের গতি মন্থর হইয়া আখ্যায়িকাটি অনেকটা নক্সার রূপ লাভ করিয়াছে। সূচনায় কালাদীঘির তীরবর্ত্তী বটবৃক্ষশ্রেণী হইতে যত দস্যুই ঝরিয়া পড়ুক, মধ্যে কোথাও ছোটমেয়েরা মল বাজাইয়া গান গাহিয়া জল তুলিতে ঘাটে নামিতেছে, কোথাও বড় মানুষের মেয়ে হেমা ছড়া কাটিতেছে, অথবা দাসী হারাণী হাসিয়া কুটিপাটি হইতেছে। কোথাও বা যমুনাঠাকুরাণী বা পেয়ারী ঠান্‌দি কামিনীর কটাক্ষপাতে মুখর হইয়া, আর অনঙ্গমোহিনী বা ব্রজসুন্দরী আপন আপন ছদ্ম অভিনয়ে আসর জাঁকাইয়া, মেয়ে-মজলিস্‌ সরগরম রাখিতেছেন, আর কেন্দ্রস্থলে সুভাষিণী অফুরন্ত প্রীতি ও সহানুভূতির পারিজাত

মধু বিতরণ করিয়া গ্রন্থখানির নূতন তাৎপর্য্য ফুটাইয়া তুলিতেছে। সে কারণ বর্ণনার কালোচিত নানা চিত্র এবং চরিত্রাবলীর সমবায়ে বড় ইন্দিরার গৌরব বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু গল্প হিসাবে ছোট ইন্দিরা অধিকতর সুগ্রথিত মনে হয়।

অথচ ছোট ইন্দিরা-গল্পটির বুনানী যত ঘনই হোক, তাহার বয়নকার্য্যে এমন একটি গ্রন্থিপাত হইয়াছিল যাহার রূঢ়তা পাঠককে স্বতঃই আঘাত করিত। গ্রন্থকার গল্পশেষে তাহা খুলিয়া দিবার চেষ্টা যে করেন নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহাতেও ইন্দিরার ভাবদৈন্য ঘুচে নাই। অষ্টাহ পরীক্ষার পরে ইন্দিরা উপেন্দ্রের নিকট হইতে তাহার প্রণয়ের নিদর্শন-স্বরূপ যে দানপত্র আদায় করিয়াছিল তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা এই কথা বলিতেছি। বড় ইন্দিরায় এই পাটোয়ারী ব্যাপার না থাকায় ইন্দিরার চরিত্র উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

কিন্তু শুধু এই সংশোধন নহে। বড় ইন্দিরায় এমন কয়েকটি বৃত্তান্ত ও বর্ণনার সংযোগ করা হইয়াছে যাহাতে তেজস্বীতায় ও অনুরাগের গভীরতায় ইন্দিরা-চরিত্রের গৌরব আরও বাড়িয়াছে। যথা:—

(১) দস্যুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও পথশ্রমে ক্লান্ত ইন্দিরা সাময়িক নিদ্রাভঙ্গে দেখিল—

"একজন যুবা পুরুষ, দেখিয়া বোধ হইল, ইতর অন্ত্যজ জাতীয়, কুলীমজুরের মত, আমার হাত ধরিয়া টানিতেছে। সৌভাগ্যক্রমে একখানা কাঠ সেখানে পড়িয়াছিল। তাহা তুলিয়া লইয়া ঘুরাইয়া

সেই পাপিষ্ঠের মাথায় মারিলাম। কোথায় জোর পাইলাম জানিনা, সে ব্যক্তি মাথায় হাত দিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে পলাইল।"[১]

অভাবনীয় ভাগ্যবিপর্য্যয় ও অপ্রত্যাশিত বিপদের মধ্যে ইন্দিরা যখন নানাকষ্টে কাতর তখনও দেখি সে ইজ্জত রক্ষায় উদ্যত-ফণা, সৎসাহসের খনি।

(২) ইন্দিরার যখন দৃঢ় প্রতীতি হইল রমণ বাবুর মক্কেলটি তাহার স্বামী, তখন স্বামী উদ্ধারের পালার সূচনায় 'হাসি চাহনির ঘটা' পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু ছোট ইন্দিরার সপ্তম পরিচ্ছেদটি, বড় ইন্দিরার 'খুন করিয়া ফাঁসি গেলাম' নামক ষোড়শ পরিচ্ছেদে, যে ভাবে গ্রন্থকার পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন তাহাতে উল্লিখিত অভিনয়ের অতীত ইন্দিরার অন্তরের সংবাদ আমরা এইরূপ পাই—

ইন্দিরা বলিতেছে—

"এখন যুক্ত করে আপনাদের নিকট নিবেদন যে, আপনারা না মনে করেন যে এ সকলই কৃত্রিম। ইন্দিরার মনে এতটুকু গর্ব্ব আছে যে, কেবল ভরণ-পোষণের লোভে অথবা, স্বামীর ধনে ধনেশ্বরী হইব, এই লোভে, সে এই সকল করিতে পারে না। স্বামী পাইব এই লোভে, কৃত্রিম প্রণয় প্রকাশ করিতে পারিতাম না; ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী হইব, এমন লোভেও পারিতাম না। স্বামীকে মোহিত করিব বলিয়া হাসি চাহনির ঘটা ঘটাইতে পারি, কিন্তু স্বামীকে মোহিত করিব বলিয়া কৃত্রিম ভালবাসা ছড়াইতে পারি না। ভগবান্ সে মাটিতে ইন্দিরাকে গড়েন নাই।"

১ ৪। ১২ পৃঃ।

বাস্তবিক এ যে আমাদের দেশীয় নারীরই প্রতিকৃতি, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য বা জীবন হইতে নকল করা কোন নারী ত' নহে। ইন্দিরা বলিয়া যাইতেছে—

"ইনি আমার স্বামী—পতিসেবাতেই আমার আনন্দ—তাই—কৃত্রিম নহে—সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত আমি তাহা করিতেছিলাম। মনে মনে করিতেছিলাম যে, যদি আমাকে গ্রহণ নাই করেন, তবে আমার পৃথিবীর যে সার সুখ—যাহা আর কখনও ঘটে নাই, আর কখনও ঘটিতে নাও পারে, তাহা অন্ততঃ এই কয় দিনের জন্য প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিয়া লই। তাই প্রাণ ভরিয়া পতিসেবা করিতেছিলাম।"

ইন্দিরার আত্মসম্ভ্রমবোধ আত্মম্ভরিতার বা আত্মাদরের নামান্তর নহে। তাই ইন্দিরার ভালবাসা সেবায় সার্থকতা লাভ করিতে চাহে। আর ইন্দিরার সিদ্ধান্ত—

"আমাদের পতিভক্তি আমাদের গুণ; আমাদিগকে যে হাসি চাহনির কদর্য্য কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হয়, সে তোমাদের অর্থাৎ পুরুষদের দোষ।"

সেকালের বাংলার মেয়ে ইন্দিরা আরও বুঝিয়াছিল যে 'মানুষ ধ'রতে গেলে ম'রতে হয়'। শুধু বুঝিয়াছিল নহে, বুঝিয়া মরিয়াছিল। নিজে ধরা না দিয়া অপরকে শৃঙ্খলিত করার art বা প্রেমছল প্রতীচীর বস্তু। সে মর্ম্মরগঠিত হৃদয় ইন্দিরা কোথায় পাইবে? তাই ইন্দিরার উক্তি—

"আমি আপনার হাসি চাহনির ফাঁদে পরকে ধরিতে গিয়া পরকেও ধরিলাম, আপনিও ধরা পড়িলাম। আগুন ছড়াইতে গিয়া

পরকেও পোড়াইলাম, আপনিও পুড়িলাম। হোলির দিনে আবীর খেলার মত পরকে রাঙ্গা করিতে গিয়া, আপনি অনুরাগে রাঙ্গা হইয়া গেলাম। আমি খুন করিতে গিয়া আপনি ফাঁসি গেলাম।”

কিন্তু সে কেমন প্রণয় যাহার কাছে ইন্দিরা পরাভব স্বীকার করিল এবং মানিল যে ‘ইহাই পৃথিবীর ষোল আনা সুখ’? ইন্দিরা বলিতেছে—

“আমি যদি তাঁহার হাসিতে, তাঁহার চাহনিতে, তাঁহার চুম্বনাকাঙ্ক্ষায়, এতটুকু ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষার লক্ষণ দেখিতাম, তবে আমি জয়ী হইতাম। তাহা নহে। সে হাসি, সে চাহনি, সে অধরোষ্ঠ বিস্ফুরণে কেবল স্নেহ—অপরিমিত ভালবাসা। কাজেই আমি হারিলাম এবং হারিয়া স্বীকার করিলাম যে ইহাই পৃথিবীর ষোলআনা সুখ। যে দেবতা ইহার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে তাহার নিজের দেহ যে ছাই হইয়া গিয়াছে, খুব হইয়াছে।”

ইন্দিরা শুধু হার মানিল না, নবতর সিদ্ধান্তে পৌঁছিল।

আমি তাঁহার ভালবাসার এমনই অধীন হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে পরীক্ষার কাল অতীত হইলে তিনি আমাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেও যাইব না। ... ... ...

যদি আমাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ না করেন, গণিকার মত যদি তাঁহার কাছে থাকিতে হয়, তাহাও থাকিব, স্বামীকে পাইলে লোকলজ্জাকে ভয় করিব না। কিন্তু যদি কপালে তাও না ঘটে, এই ভয়ে অবসর পাইলেই কাঁদিতে বসিতাম।”

ধনীর মেয়ে ইন্দিরার সকল অহঙ্কার প্রণয়-প্লাবনে ডুবিয়া ভাসিয়া গেল। অপূর্ণ ইন্দিরা, কামনার ইন্দিরা, আপনাকে

নিবেদন করিয়া, অভিমান ভুলিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল এবং লুব্ধ উপেন্দ্রকে প্রেমময় উপেন্দ্র করিয়া তুলিল।

ইহার পরে মিলনের দৃশ্য ব্যতীত আর কোন পরিচ্ছেদের স্থান হইতে পারে না। ছোট ইন্দিরা এমন কথায় সমাপ্তিতেই পৌঁছিয়াছিল। বড় ইন্দিরার জীবন-নাটিকা ইহার পরে আরও ছয় অধ্যায়ব্যাপী একটি নূতন অঙ্কে বিস্তাব লাভ করিয়াছে। তাহাতে উপন্যাসখানির গৌরব বাড়িয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

'সে কালে যেমন ছিল' প্রভৃতি পরিচ্ছেদের, নক্‌সা হিসাবে হয়ত কিছু মূল্য থাকিলেও, উপন্যাসের প্রয়োজনের দিক্ দিয়া মূল্য নাই।

কিন্তু গ্রন্থশেষে আখ্যানের এই অনাবশ্যক স্থূলতা সত্ত্বেও বড় ইন্দিরার দ্বিতীয় অঙ্কের নবোদ্ভাবিত গার্হস্থ্যশ্রী একেবারে শতদলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দিরার কলিকাতায় আসা হইতে তাহার জীবন-কাহিনীর যে দ্বিতীয় অঙ্ক বা মধ্যমচরিত সুরু হইল, সুভাষিণী সে অঙ্কের দেবতা এবং হারাণী তাহার বাহন। মানুষের দুর্ভাগ্যের প্রতি সুভাষিণীর সহানুভূতির ও সহজ দয়ার যেমন অন্ত নাই, হারাণীর সকল দুঃখ-লাঘব-করা শুভ্রহাসিও তেমনই অফুরন্ত। আরও লক্ষ্য হয়, যে গার্হস্থ্যলীলার দৃশ্য-পরম্পরার মধ্য দিয়া ইন্দিরার গল্প-ধারা এই দ্বিতীয় অঙ্কে অগ্রসর হইয়াছে সে লীলার অপরাপর পাত্রপাত্রীগুলি রূপে ও রঙে যেমন বিভিন্ন ও বিচিত্র, উদ্দেশ্যের

অনুকূলতা-সাধনে তাহাদের তেমনই ঐক্য। ইন্দিরাকে গৃহে স্থান দিবার পক্ষে, তাহার শাশুড়ীর দ্বিধার মত কোন সংশয়ই সুভাষিণীর মনে উদিত হয় না—গৃহরাজ্যে তাহার প্রভাব ও সংস্থাপিত শান্তি এমনই অটুট। তেমনই ইন্দিরার প্রতি তাহার নিয়ত কোমল সহানুভূতি সকলের মধ্যে এমনই সংক্রামিত করিয়া তুলিয়াছে যে শুধু রমণবাবু ইন্দিরার আনুকূল্যে সদা সক্রিয় নহেন, মাতৃস্নেহে 'কালির বোতল' কর্ত্রীঠাকুরাণী পাচিকা ইন্দিরার বয়স ভুলিয়াও মাহিয়ানা বাড়াইয়া তাহাকে বহাল রাখিতে চাহেন। ইন্দিরার প্রতি বিদ্বিষ্ট বামুনঠাকুরাণীর বিরুদ্ধে সুভাষিণীর মেয়ে হেমা ছড়া কাটিতেছে, এমনকি অস্ফুটবাক্ ছোট ছেলেটি 'চাচুলীর' রক্ষাকল্পে কাঠের চালা প্রয়োগে তৎপর। রামরাম বাবুও রমণের হস্তে ডাল পড়িয়া গেল বলিয়া ব্রাহ্মণীর পরিবর্ত্তে ইন্দিরাকে পরিবেশনে আহ্বান করিতেছেন; আর, সুভাষিণীর সম্মার্জ্জনী-স্ফুরণে হারাণী রুদ্ধ হাসি আবার হাসিয়া অস্বীকৃত দৌত্যে ছুটিতেছে। বাঙ্গলার মেয়ে সুভাষিণী যে প্রেমমন্ত্রে এই ঐক্যতানের সৃষ্টি করিতেছে বাস্তবিক সে মন্ত্রের মোহিনী-শক্তির তুলনা নাই। সেই যে প্রেম যাহাতে রমণী হইয়া যায় রাণী, প্রেয়সী গৃহিণী ও জীবন-সঙ্গিনী, মনে হয় বঙ্কিমের মতে ইন্দিরা তাহার পূর্ব্বাভাস, সুভাষিণী পরিণতি। তিনি যেন বলিতে চাহিয়াছেন ইন্দিরার জিগীষা সুভাষিণীর জয়শ্রীতে সার্থকতা লাভ করে। তাই ছোট ইন্দিরা যেখানে ছিল বাঙ্গলার মেয়ের প্রশস্তি-গুঞ্জন, সুভাষিণীর

চিত্র-শোভিত বড় ইন্দিরা সেখানে উদাত্তস্বরে তাহারই মঙ্গলগান।

১৮৭২ সালে বিষবৃক্ষ রচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিম কমলের পরিচয় দিতে বলিয়াছিলেন 'কমলমণি রমণীরত্ন'। বিশ বৎসর পরে মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে বাঙ্গলা সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় শিল্পী স্ফুটতর কমল সুভাষিণীর চিত্র আঁকিয়া বলিয়া গেলেন "সুভাষিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম না"। সুভাষিণী যে 'কোন কাননের ফুল' বা 'কোন গগনের তারা' তাহা ভুল করিবার উপায় নাই, আর সে প্রিয়া ও মাতা, বধূ ও গৃহিণী, সবই বটে। আর, 'হীরা' দাসী আঁকার ক্ষোভ গ্রন্থকার বোধ হয় হাসির উৎস হারাণী আঁকিয়া ঘুচাইয়া গেলেন। 'সাম্য', 'বঙ্গদেশের কৃষক' ও 'দেবীচৌধুরাণী' লেখক বঙ্কিমের নাকি কেবল উচ্চশ্রেণীনিবদ্ধ (bourgeoisie) দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। তাই হারাণীর হাসি বন্ধ হইবার বিবরণ যে শুধু এক দীর্ঘ পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার কালাদীঘির দস্যুদলের সর্দ্দার ( ভবানীপাঠকের শিষ্য নহে ), তাহার দলস্থ যুবার কামলোলুপতার প্রতিবাদ করিয়া বলে কিনা 'এই লাঠির বাড়িতে এইখানেই তোর মাথা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইব ; ও সকল পাপ কি আমাদের সয়' ? আমরা—কাহারা ?

জাতীয় শীলতার প্রতি, আমাদের দেশীয় সমাজের নিম্নতম স্তরের জনগণের অন্তরের শুভসংস্কারের প্রতি, ইহা কতদূর শ্রদ্ধার পরিচয় তাহা চিন্তাশীল পাঠকগণের অনুধাবনযোগ্য।

# রাজসিংহ

# রাজসিংহ

( ১৮৯৩ )

১২৮৪-৮৫ সালের বঙ্গদর্শনে রাজসিংহ প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১২৮৮ সালে ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। এই অধুনালুপ্ত কাহিনী আমাদের আলোচ্য নহে। চতুর্থ সংস্করণে "পুনঃপ্রণীত" পূর্ণাবয়ব যে রাজসিংহ ইংরাজী ১৮৯৩ সালের অগাষ্ট মাসে প্রকাশিত হয় তাহাই প্রচলিত রাজসিংহ। ইহা যখন অনেকাংশে নূতন রচনা তখন ইহাকেই বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত শেষ উপন্যাস বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র যখন রাজসিংহকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তখন সীতারামের কথা মনে পড়া ছিল খুবই সম্ভব। সীতারামের কথা মনে পড়ায় হয়ত ভাবিয়াছিলেন মহদুদ্দেশ্য সাধনের অন্তরায়, মহৎ সঙ্কল্পের শোচনীয় ব্যর্থতার চিত্র, "আত্মৈবরিপুরাত্মনঃ" যে কেমন করিয়া ঘটে তাহা দেখান হইয়াছে; কিন্তু স্বধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বৃহত্তর জীবনের সফল সাধনার চিত্র আঁকা হয় নাই, "আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুঃ"র দৃষ্টান্ত দেখান হয় নাই। অতএব সেরূপ বৃহত্তর জীবনের ছন্দকে মূর্ত্তি দিয়া, মহতী প্রচেষ্টার বিস্তৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া, তাঁহার রসসাহিত্যসেবা সুসম্পূর্ণ করিবার আকাঙ্ক্ষা

হওয়া স্বাভাবিক। সীতারামে বীর্য্য ও শ্রী, মহদুদ্দেশ্য ও সাধনা বিযুক্ত হইয়া গিয়াছিল, ফলে সিদ্ধি করায়ত্ত হওয়া দূরে থাক জীবনে হইয়াছিল নিদারুণ অনর্থপাত। অতএব উভয়ের শুভ-মিলনের অভাবনীয় সার্থকতা দেখাইবারও প্রয়োজন আছে মনে করিয়া অস্তগমনোন্মুখ বঙ্কিম বোধ হয় ছোট রাজসিংহকে মহাকাব্যে পরিণত করিবার কল্পনা করেন। আয়ুঃ শেষ হইতে তখন আর কয়েক মাস মাত্র বাকী, অথচ যে প্রতিভা ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালীকে অভূতপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও আনন্দ দান করিয়াছে, তাহার রবিরশ্মি, ম্লান হওয়া দূরের কথা, তখনও অসম্বৃত ও ভাস্বর। নূতন ধারায় নবরস বিতরণের ক্ষমতা তখনও এমন অটুট যে রাজসিংহ হইল সর্ব্বাপেক্ষা ওজস্বিনী ক্ষিপ্রগতি কাহিনী, আর, তাহার নায়ক ও তাঁহার পার্শ্বচরগুলি হইল যেমন বীর্য্যবান তেমনই কর্ম্মকুশল।

রাজসিংহ বঙ্কিমের শেষ উপন্যাস হইলেও তাঁহার মতে ইহাই তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার বলিতেছেন: "আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।"

কিন্তু তিনি তাহা বলিলে কি হইবে? আধুনিক সুপণ্ডিত সমালোচকেরা তাহা শুনিবেন কেন? ইতিহাসের ছোঁয়াচ-লাগা বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় উপন্যাসগুলি তাঁহারা 'ঐতিহাসিক'

শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এবং ইতিহাসের নিকষে সেগুলি পরীক্ষা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের "ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ব-জ্ঞানের চিহ্ন" কোথায় কতদূর আছে না আছে তাহার বিচার নিষ্পত্তি না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে অক্ষম। অতএব মন্তব্য প্রচার করা হইল "দুর্গেশনন্দিনীর ঐতিহাসিকতা ক্ষীণ বটে,"[১] "মৃণালিনীতে ঐতিহাসিক অংশ অতিশয় ক্ষীণ ও আনুমানিক বলিয়াই মনে হয়,"[২] আনন্দমঠে "ভাবপ্রাবল্য সত্যনিষ্ঠাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।" "দেবীচৌধুরাণীতে দার্শনিক তত্ত্বপ্রিয়তা * * * ইতিহাসকে নিঃসন্দেহে অভিভূত করিয়াছে।"[৩] "ইতিহাস" সীতারামের "অপ্রধান অংশ মাত্র।" "ইতিহাসের সহিত দৈনন্দিন জীবনের অন্তরঙ্গ যোগসাধন, যাহা ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি মূল লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা 'চন্দ্রশেখর'এ ও বঙ্কিমের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসেও মিলে না"[৪] ইত্যাদি। কবুল দিলেও নিষ্কৃতি নাই। স্বীকৃত বিষয়ও বহু আড়ম্বর সহকারে সপ্রমাণ করা প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বঙ্কিমের যে সুস্পষ্ট

---

১ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ৪৭ পৃ।

২ ঐ ৪৪ পৃঃ।

৩ ঐ ৪৪ পৃঃ। দেবীচৌধুরাণীর বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম নিজেই বলিয়াছেন "দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প।" "পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আনন্দমঠ বা দেবীচৌধুরাণীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।"

৪ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ৪৫ পৃঃ।

ধারণাই ছিল তাহা তাঁহার অপরাপর তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি হইতে রাজসিংহের বিভিন্নতা নির্দ্দেশেই বুঝা যায়। রাজসিংহের সে বিশিষ্টতার লক্ষণগুলি কি ?

প্রথমতঃ, দেখিতে পাই, রাজসিংহে ইতিহাস শুধু উপকরণ যোগায় নাই, ইতিহাস ইহার প্রধান উপজীব্য বা আশ্রয়। উপন্যাসখানিতে বর্ণিত প্রধান বিষয় হইতেছে রাজপুতদিগের বা মেবারের সহিত মোগল সম্রাটের ইতিহাসপ্রথিত সংগ্রাম। দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাস এখানে শুধু দৃশ্যপট বা রঙ্গভূমি রচনা করিয়া দিয়া দূরে সরিয়া যায় নাই, ইতিহাস অভিনেতা ও অভিনেত্রীও যোগাইয়াছে। বর্ণিত যুদ্ধের উভয় পক্ষের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নায়ক-যুগল গ্রন্থের নায়ক ও প্রতিনায়ক ত বটেই, অধিকন্তু মুখ্য চরিত্রগুলির মধ্যে নায়িকা ( নামে চঞ্চল-কুমারী হোক আর চারুমতী হোক ), জেব্-উন্নিসা, উদিপুরী বেগম প্রভৃতি অনেকেই ঐতিহাসিক চরিত্র। তৃতীয়তঃ, উভয় পক্ষের নায়কের কার্য্যকলাপ ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক কারণে যেমন নিয়ন্ত্রিত, তেমনই গ্রন্থোক্ত অপরাপর উল্লেখ-যোগ্য চরিত্রগুলি উভয় পক্ষের নায়ক-যুগলকে ইতিহাসে বর্ণিত দ্বন্দ্বে অগ্রসর করিয়া দিতেছে এবং সে দ্বন্দ্বে তাহারা স্ব স্ব অংশ অভিনয় করা ব্যতীত তাহাদের মনোভাবের দ্বারা উভয় পক্ষের শক্তিবৃদ্ধির বা দুর্ব্বলতা-সম্পাদনের কারণও হইতেছে। চতুর্থতঃ, উপন্যাস-বর্ণিত যুদ্ধের ফল বা ঘটনাধারার পরিণাম অনেকটা ইতিহাসের বর্ণনার অনুরূপ।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে গ্রন্থের উপর ইতিহাসের প্রভাব বা অধিকার যদি এতই বেশী তাহা হইলে উপন্যাস রহিল কোথায়? গ্রন্থকারের সৃষ্টিশক্তি বা সৃজন-কুশলতার পরিচয় বা কি? উপন্যাস অংশের পরিচয় যাহা সমগ্র গ্রন্থে আহরণীয় তাহা স্বল্প কথায় দেওয়া কঠিন, তবুও মোটামুটি এই ভাবে দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, যুদ্ধের কারণ ইতিহাসে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ত আছেই কিন্তু রসস্রষ্টার লেখনীমুখে আদি ও মুখ্য কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীর বীরানুরাগ ও দুঃসাহসিকতার কার্য্য। ফলে যুদ্ধটা হইয়া দাঁড়াইয়াছে অনেকটা ঔরঙ্গজীব ও রাজসিংহের মধ্যে চঞ্চল-লাভের দ্বন্দ্ব—রাজসিংহের পক্ষে শরণাগত স্বয়ম্বরার ইজ্জত রক্ষার ও স্বধর্ম্ম-পালনের বিপুল ও সার্থক প্রচেষ্টা, ঔরঙ্গজীবের পক্ষে ক্ষুদ্র ও উদ্ধত রাজন্যশক্তিদলনের ও দর্পিতা রাজপুত-কুমারী-হরণের বিফল চেষ্টার বিরাট প্রায়শ্চিত্ত। আর চঞ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছে সমগ্র অগ্নিকাণ্ডের "তৃষিতা চাতকী", বিরাট যজ্ঞের শুভপ্রেরণাদাত্রী ও যজ্ঞান্তে শান্তিবারির অধিকারিণী।

দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিক ঘটনার এই অভিনব তাৎপর্য্য ফুটাইয়া তোলা ব্যতীত নায়ক-নায়িকার ভাবজীবন উপন্যাস-কার এমন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন যে তাহাদের নিকট শুধু "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য" নহে, পরন্তু ব্যক্তিগত মিলন ও মিলনাভাব অতি তুচ্ছই হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এবং তাহাদের

পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ স্বধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার আনন্দের মধ্যে বৃহত্তর সার্থকতা খুঁজিয়া আদর্শানুগত, ত্যাগপূত, লোকোত্তর প্রেমে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, মন্দিরের দেবতার মাহাত্ম্য প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিতে শিল্পী মন্দিরগাত্রে এমন জগতের ছবি উৎকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন যেখানে কামনা যত ক্রন্দনও তত, বিলাস যত বিড়ম্বনাও তত এবং পাপ অপেক্ষা প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা ন্যূন নহে।

চতুর্থতঃ, নায়ক-প্রতিনায়কের সহিত উভয় পক্ষের অনুচর ও সহকারী পাত্র-পাত্রীগণের বিশেষ বিশেষ ভাবজীবনও উপন্যাসকারকে গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। ফলে ইতিহাসের প্রবল ধারা সপার্ষদ নায়ক-নায়িকার বিচিত্র ভাবধারায় অনুরঞ্জিত হইয়া উভয় ধারা এমনই বিমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে ইতিহাস ও কবিকল্পনাকে বিচ্ছিন্ন করা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে এবং সে কারণ রাজসিংহ যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যুত, সাহিত্য-শিল্পী এখানে ইতিহাসের কাঠামে কাব্যপ্রতিমা গঠন করিতে চাহিয়াছেন। কাব্যপ্রতিমা গঠন করা, ইতিহাসকে রসাত্মক বাক্যে পরিণত করা, কাব্যশাস্ত্রের রীতি অনুসারে ইতিহাসের ব্যাখ্যানই (interpretation) এখানে উদ্দেশ্য। "ঐতিহাসিক রস" সিঞ্চিত করিয়া উপন্যাসটিকে একটু বিশিষ্ট আস্বাদ (flavour) মাত্র দিতে গ্রন্থকার এখানে চাহেন নাই।

কিন্তু বঙ্কিম রাজসিংহকে খাঁটী ঐতিহাসিক উপন্যাস আখ্যা দিলেই বা কি হইবে ? "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" প্রদর্শক মহাশয় বলেন, "অবশ্য ইতিহাসের বিশাল ঘটনার সহিত সাধারণ জীবনের যে অন্তরঙ্গযোগ আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসেই প্রকাশিত হয় নাই।"[১] বঙ্কিমের যাবতীয় উপন্যাস সম্বন্ধে এত বড় ব্যাপক ও নেতিবাচক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা যখন অত্যন্ত অভরসায় জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হই—রাজসিংহেও নহে কি ? তখন উক্ত গ্রন্থের পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে দেখি "রাজসিংহে ঐতিহাসিক অংশেরই প্রাধান্য, ইতিহাস এখানে পারিবারিক জীবনের সহিত নিতান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত, অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত হইয়াছে"।[২] মনে হয়, তবু ভাল, ইহাতেও যদি রাজসিংহ-উপন্যাসের জাতি রক্ষা পায়। আরও নাকি এক্ষেত্রে "ইতিহাসের গ্রাস হইতে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে তিনি (বঙ্কিম) বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন এবং আংশিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন"।[৩] সম্পূর্ণ "কৃতকার্য্যতা লাভ" যে করিতে পারেন নাই সেটাও বঙ্কিমচন্দ্রের বহু ভাগ্যের কথা, নতুবা হয়ত আবার আধুনিক মতে "ঐতিহাসিক সত্য-নিষ্ঠার" ব্যতিক্রম ঘটিত।

---

১ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ৪৮ পৃঃ।

২ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ১৪৬ পৃঃ।

৩ ঐ ১৪৯ পৃঃ।

আসল কথা এই যে উপন্যাস-রচয়িতার নিকট ষোল আনা 'ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা' দাবী করা যেমন অন্যায়, উপন্যাসে বর্ণিত ইতিহাসপ্রথিত চরিত্রগুলির ইতিহাস-নিরপেক্ষ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষিত হইবার দাবী করাও তেমনই অসঙ্গত। ঐতিহাসিক উপন্যাসলেখক প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্রের বিকৃতি ঘটাইবেন না বা সর্ব্বজনবিদিত ঐতিহাসিক তথ্যের বিরোধিতা করিবেন না—অবিরোধিতার এই একরার পর্য্যন্ত দিতে পারেন। দিতে পারেন, কেননা বহুজনবিদিত তথ্যের সহিত উৎকট অসঙ্গতি-দোষে পাছে রসাভাস সৃষ্টি হয়। নতুবা, রসাত্মক কথায় ইতিহাসের নবকলেবর-গঠনে, গৌণ ঐতিহাসিক বিষয়ে তিনি নিরঙ্কুশ অর্থাৎ তেমন বিষয়ে তিনি স্বচ্ছন্দগতিরই দাবী করিবেন এবং সে দাবীর ন্যায্যতা অতিনিষ্ঠাবান ঐতিহাসিক ব্যতীত সকল কাব্য-রসিকই উপচিত রসানুভূতির আনন্দে স্বীকার করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইবেন না।[১] ঐতিহাসিকেরাও বা স্বীকার করিবেন না কেন বুঝি না। যেহেতু অদ্যকার জ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্য যে সর্ব্বাংশে বা অবিসংবাদিত সত্য, নবাবিষ্কৃত প্রমাণে তাহার কোন অংশের যে অন্যথা হইতে পারে না, এত বড় দাবী ঐতিহাসিকের দিক্ দিয়াও করা চলে না। বঙ্কিম যেদিন রাজসিংহ

---

১ Goethe ত প্রশংসা করিয়াই বলিয়াছেন "The Greeks were so great that they regarded fidelity to historical facts less than the treatment of them by the poet" (Conversation of Goethe with Eckermann—Everyman's Library Edition. P. 166).

লিখিয়াছিলেন সেদিন প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্বন্ধে Tavernier, Todd, Orme, Catrouর লিখিত বিবরণই ছিল ঐতিহাসিকদিগেরও অবলম্বন। পরে যদি Manuciiর লেখা সমগ্র Storia-do Mogor প্রকাশিত হইয়া থাকে, 'বীর বিনোদ' বা 'মাসির-ই-আলমগীরী' প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকদিগের আলোচ্য বিষয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে অধুনা-পরিজ্ঞাত ঐতিহাসিক উপকরণে রাজসিংহের পাত্রস্থ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা বঙ্কিমের উচিত ছিল বলা যেমন কালক্রমের ধারণাহীন বাতুলতা হইবে, তেমনই সমস্ত প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাদের পরস্পর বিরোধিতা বা অনৈক্য মীমাংসা করিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখাই সঙ্গত, এইরূপ সাধু মন্তব্য কাব্যসমালোচকের শুচিবায়ুগ্রস্ততাই প্রমাণ করিবে।

ঐতিহাসিক উপাদান এযাবৎ যতই আবিষ্কৃত হোক, রাজসিংহে বর্ণিত কোন কোন স্থূল ঘটনা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে এখনও যে কিরূপ মতান্তর দেখা যায় তাহার একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে, রাণার সৈন্যকর্ত্তৃক শৈলমালার রন্ধ্রপথে ঔরঙ্গজীবের অবরুদ্ধ হইবার ও একদিন খাদ্যাভাবে কাটাইবার বিবরণ। স্যর যদুনাথ সরকার বলেন "টডের এই বিবরণ সত্য নহে।"[১] কিন্তু Irvine অনূদিত Manuciiর Storia-do-Mogorএর দ্বিতীয় খণ্ডের 'The Campaign in Udipur' শীর্ষক ২৪১ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দেখা যায়—

১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-প্রকাশিত বঙ্কিম শত বার্ষিক সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

"With this design the Rana barred the roads in such a way that the Moguls, being now surrounded by mountains, could find no exit, nor knew they where to pass ; for the roads are provided with labyrinths and none but the natives knew the right road. Aurangzeb was amazed at finding himself by one stroke thus encircled, unable to move either forward or backward. He knew likewise that if the Rana up to that time had made no movement against his person, it was not because he could not, but because he would not. Still more was he alarmed when he found that his beloved Udepuri put in no appearance ; nor was there the slightest news of her. Neither was there word of any supplies. The Rana, to shew that he did not want to fight, sent him supplies from his own country. He allowed him to suffer hunger for one day, so that hunger may inspire him with good sense. Thus Aurangzeb as well as his army had to content himself with a little *kichri*, that is, rice and lentils cooked with a little butter."

যিনি নিজে বাদ্‌শাহজাদা শাহ্‌ আলমের সৈন্যদলভুক্ত থাকিয়া মেবার-অভিযানে যোগ দিয়াছিলেন বলেন, সেই Manuciir লিখিত এই বিবরণ যে অসত্য অন্ততঃ অনুবাদক Irvine (যাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ পাদটীকার ভূয়সী প্রশংসা সরকার মহাশয়

করিয়াছেন ) এমন কোন মত প্রকাশ করেন নাই। কাজেই বঙ্কিম অর্দ্ধের অনুসরণ করিয়া গতশতাব্দীর শেষদশকের প্রথম ভাগে যাহা লিখিয়াছিলেন Manuciir Storia সম্পূর্ণ অনূদিত ও প্রচারিত হইবার পরেও তিনি বর্ত্তমান থাকিলে তাহাই যে লিখিতেন না ইহারই বা স্থিরতা কি? আর লিখিলেও, ঐতিহাসিক উপাদানের এমন অনৈক্য ক্ষেত্রে, কাব্যসমালোচক বা ঐতিহাসিক কাহারও কটাক্ষভাজন হইতে হইবে কেন তাহাও দুর্ব্বোধ্য।

বাস্তবিক ঐতিহাসিক উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ ইহাই দ্রষ্টব্য যে ঐতিহাসিক তথ্য উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্র গুলির ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, মোহ বা মহত্ত্বের সহিত গ্রথিত হইয়া নবজীবন ও নববাণী লাভ করিয়াছে কিনা, আর, কাহিনী সত্যোপেত হইয়া অধিকতর শক্তি ও সবলতা প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা। যে কবিপ্রতিভায় ইতিহাস ও কাব্যের এমন শুভ পরিণয় ঘটে তাহাই প্রশংসার যোগ্য।

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা ব্যতীত রাজসিংহ রচনায় বঙ্কিমের যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল তিনি ভূমিকায় তাহা নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত করিয়াছিলেন।—

> "ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবল আমার প্রতিপাদ্য। উহার উদাহরণ স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি * * * যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।"

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে এই উদ্দেশ্য বুঝিবার পক্ষে কাহারও

বিশেষ কোন বাধা হয় নাই। কিন্তু আধুনিক সমালোচক বলেন "বঙ্কিমের এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করা একটু দুরূহ"[১]। 'প্রতিপাদ্য' শব্দের অর্থ যে কেবল জ্যামিতির পরিভাষা অনুসারে প্রমাণিত করার বিষয় নহে, পরন্তু 'বর্ণনার বিষয়'ও[২] যে হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিলে বঙ্কিমের সরল উক্তির তাৎপর্য্য গ্রহণ করা 'একটু' বা বেশী কোনরূপেই দুরূহ হইতে পারে না বা "উপন্যাস কেন ইতিহাসের উদ্দেশ্য সাধনক্ষম", "ইতিহাসের পক্ষে যাহা দুঃসাধ্য তাহা উপন্যাসের পক্ষে কেন সহজসাধ্য হইবে"[৩] ইত্যাদি প্রশ্নের অবকাশও হইতে পারে না। যেহেতু বাহুবলের প্রমাণ যখন ইতিহাসে রহিয়াছে তখন তাহার উপরে রঙ ফলাইয়া উপন্যাস লেখা যাইতে পারে।

সে যাহা হোক, বঙ্কিম তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনে কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছেন এক্ষণে রাজসিংহে বর্ণিত বিষয় আলোচনা করিয়া তাহা দেখা যাক।

রাজসিংহ উপন্যাসের ঘটনাসংস্থান বা plot হইতেছে—

রাজস্থানের পার্ব্বত্য অঞ্চলের রূপনগর নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের দুঃসাহসিকা রাজকুমারী এক তস্বীরওয়ালীর নিকট হইতে ছবি কিনিবার প্রসঙ্গে সমাদরে রাজসিংহর ছবি খরিদ

১ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ১৪২ পৃঃ।

২ শিবনারায়ণ শিরোমণি প্রণীত 'শব্দার্থ মঞ্জরী' বা পূর্ব্বকালীন ঐরূপ অভিধান দ্রষ্টব্য।

৩ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ১৪২ পৃঃ।

করে এবং রহস্য করিয়া দিল্লীর বাদ্‌শাহ ঔরঙ্গজীবের প্রতিচ্ছবি পদাঘাতে ভাঙিয়া ফেলে। তস্‌বীরওয়ালীর পুত্র খিজির সেখ দিল্লীতে ছবি আঁকিত এবং বাদ্‌শাহের দরবারে সংবাদ বিক্রয় করিয়াও অর্থসংগ্রহ করিত। তাহার প্রতিবেশিনী দরিয়া বিবিও বাদ্‌শাহের অন্তঃপুরে সুর্‌মা ও সংবাদ বেচিত। সে খিজির সেখের কথামত রূপনগরের সংবাদ সম্রাটদুহিতা জেব্‌-উন্নিসার নিকট বিক্রয় করিয়া আসিল এবং এ সংবাদও দিয়া আসিল যে জেব্‌-উন্নিসার বিলাসকুঞ্জের লুব্ধ মধুপ মোবারক তাহার (অর্থাৎ দরিয়ার) বিবাহিত স্বামী। জেব্‌-উন্নিসার কথামত উদিপুরী বেগম রূপনগরের 'খোশখবর' সম্রাটের কর্ণগোচর করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন রূপনগরের রাজকুমারী আসিয়া তাঁহার তামাকু সাজিবে। সম্রাট উদ্দীপিত ক্রোধ গোপন করিয়া রূপনগরের রাজাকে তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া রাজভক্তি পুরস্কৃত করিবেন জানাইয়া রাজকুমারীকে দিল্লীতে পাঠাইতে আদেশ দিলেন এবং রাজকুমারীকে আনার জন্য দুই হাজার সৈন্যও পাঠাইলেন। রাজকুমারী সম্রাটপত্নী হইবে বলিয়া রূপনগর আনন্দে উৎফুল্ল হইল, কিন্তু চঞ্চল তাহার পিতাকে রক্ষা করার জন্য দিল্লী যাইতে মুখে রাজী হইলেও, মহারাণা রাজসিংহকে পত্র ও রাখী পাঠাইয়া জানাইল যে তিনি যদি তাহাকে পথিমধ্যে মোগলের কবল হইতে উদ্ধার করেন তাহা হইলে সে তাঁহার পত্নী হইতে প্রস্তুত, নতুবা দিল্লীর পথে বিষপানে প্রাণ ত্যাগ করিবে। রাজসিংহ

মৃগয়াক্ষেত্রে ঐ পত্র পাইবামাত্র অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া রাজকুমারীর সহযাত্রী মোগল সৈন্যদিগকে এক রন্ধ্রপথে আক্রমণ করিলেন এবং প্রাক্তন দস্যু ও পরবর্ত্তী রাজসৈনিক মাণিকলালের কৌশলে মোগল সৈন্য পরাজিত করিয়া ও রাজকুমারীকে উদ্ধার করিয়া উদয়পুরে লইয়া গেলেন। চঞ্চল-কুমারী রাণার সহিত উদয়পুর রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের মিলনের এক অপ্রত্যাশিত অন্তরায় উপস্থিত হইল। চঞ্চলের পিতা বিবাহে সম্মতি দিলেন না বরং জানাইলেন তাঁহার বিনা অনুমতিতে বিবাহ হইলে "কন্যা বিধবা, সহমরণে বঞ্চিতা, মৃতপ্রজা এবং চিরদুঃখিনী হইবে" এবং রাজসিংহের "রাজধানী শৃগাল-কুক্কুরের বাসভূমি হইবে"; তবে ইহাও লিখিলেন "যদি আপনাকে ( অর্থাৎ রাণাকে ) কখনও উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবার কারণ পাই, তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমি আপনাকে কন্যাদান করিব।" রাজকুমারী ও রাণার মিলনের পথে আরও এক নূতন অন্তরায় উপস্থিত হইল। এক জ্যোতিষী গণিয়া বলিল যদি কখনও সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী আসিয়া চঞ্চলের পরিচর্য্যা করে তবেই বিবাহ হইবে নতুবা নহে। কাজেই উল্লিখিত মিলনের বাধা হইল যেমন দুর্জ্জয়, মিলনের সম্ভাবনা তেমনই অনিশ্চিত। চঞ্চল ও রাজসিংহ কিন্তু সেই সকল বাধা জয় করিতে, অসম্ভবকে সম্ভব করিতে, প্রস্তুত হইলেন।

ওদিকে, মহারাণা রাজকুমারীকে বাদ্‌শাহী সৈন্যের কবল

হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছেন শুনিয়া ঔরঙ্গজীব অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন। রূপনগরে প্রেরিত সৈন্যাধ্যক্ষদিগের মধ্যে মোবারক প্রথমে দণ্ডিত না হইলেও শেষে জেব্-উন্নিসা যখন দরিয়ার প্রীতিমুগ্ধ মোবারকের ত্রুটীর কথা বাদ্শাহকে জানাইলেন তখন মোবারককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া সর্পাঘাতে প্রাণ দিতে হইল। প্রজ্জ্বলিত ক্রোধে বাদ্শাহ হিন্দুদিগের উপর জেজেয়া কর স্থাপনপূর্ব্বক রাণার রাজ্যে গোহত্যা ও মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্জিদ করিতে দিতে হইবে বলিয়া দাবী করিলেন এবং রাজসিংহ তাহাতে সম্মত না হইলে সংগ্রামে মেবাররাজ্য ধ্বংস করা হইবে জানাইয়া দিলেন। তাহার পরে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের সকল অংশ হইতে বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করিয়া নানাদিক্ হইতে ক্ষুদ্র মেবার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজসিংহ সমতলক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া এবং রাজপুত সৈন্য নিজের ও পুত্রদিগের নেতৃত্বে বিভক্ত করিয়া পর্ব্বতের নানাস্থানে এবং রন্ধ্রপথে সন্নিবেশ করিলেন এবং বাদ্শাহ যখন তাঁহার অগ্রগামী পুত্র আক্বরের সৈন্য সহ মিলিত হইতে মেবারের গিরিপ্রাচীরের রন্ধ্রপথে যাত্রা করিলেন তখন রাজসিংহ আপন সৈন্যসহ সম্রাটবাহিনীর মধ্যভাগে আক্রমণ করিয়া বেগম উদিপুরী ও বিরহকাতরা জেব্-উন্নিসাকে বন্দী করিয়া উদয়পুরের রাজ-প্রাসাদে পাঠাইয়া দিলেন, আর, সম্রাটবাহিনীকে রন্ধ্রপথে আবদ্ধ রাখিয়া রসদশূন্য ক্ষুধার্ত্ত সম্রাটকে সন্ধি করিতে বাধ্য করিলেন। সন্ধির পরে উদিপুরী ও জেব্-উন্নিসা মুক্তি

পাইলেন এবং উদিপুরী চঞ্চলের তামাকু সাজিয়া দিয়া এবং জেব্-উন্নিসা পুনর্জ্জীবিত মোবারকের সহিত বিবাহিত হইয়া বাদ্শাহের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। সম্রাট কিন্তু অচিরেই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বাদ্শাহজাদা আক্বরের সাহায্যে সেনাপতি দিলীর খাঁকে রাণার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন এবং মোবারকের মৃত্যুসাধন জন্য দিলীর খাঁর সহিত তাহাকে যুদ্ধে যাইবার আদেশ দিলেন। মোবারক এই যুদ্ধে উন্মাদিনী দরিয়ার বন্দুকের গুলীতে নিহত হইল এবং শোকাকুলা জেব্-উন্নিসা ধূলায় লুটাইল। পক্ষান্তরে চঞ্চলকুমারীর পিতা বিক্রম সোলাঙ্কী রাণার সাহায্যে আসিয়া দিলীর খাঁর পরাজয়ে সহযোগিতা করিলেন এবং বিজয়ী রাণাকে কন্যাদান করিয়া ধন্য হইলেন।

রাজসিংহ উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার এই মূলধারা যদি আমরা স্মরণ রাখি তাহা হইলে আমাদের মুখবন্ধের এই কথা সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে ইতিহাসে যাহা কেবলমাত্র ঔরঙ্গজেবের বিধর্ম্মী-বিদ্বেষ-মূলক অভিযান বা আক্রমণ হইতে রাজপুত স্বাধীনতা রক্ষার মহাসমর, উপন্যাসে তাহা মুখ্যতঃ নারীর মর্য্যাদা-রক্ষার এবং চঞ্চলের মত বীরাঙ্গনা-লাভের বিপুল পণে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আর, গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিম যত ছোট করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য বিবৃত করুন, তিনি রচনায় যাহা সম্পাদন করিয়াছেন তাহা তাঁহার বিবৃত উদ্দেশ্য অনেক দূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি অপেক্ষা তাঁহার দান অনেকাংশেই মহত্তর।

কেন? যে অষ্টাদশবর্ষীয়া রাজপুতকন্যা লীলাচ্ছলে রাজসিংহের কাহিনী-সূচনায় বিদ্যুৎগতি সঞ্চার করিয়া দিল, সে যে বীরত্বের গলায় বরমাল্য অর্পণ করিয়া তাহার তরুণ প্রেমের চিরন্তন সার্থকতা অনুভব করিল তাহা কি কেবলমাত্র বাহুবল? সে বীরত্বই না বিপন্ননারীর আহ্বানে সর্ব্বস্বপণ করিয়া অসমশক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপ দিল? নারীর ধর্ম্মরক্ষার জন্যই হোক, আর নারীপ্রেমের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই হোক, যে নায়ক দিল্লীর সম্রাটের বিপুল শক্তির বিরোধিতা করিতে বদ্ধপরিকর হইল, রাজধানী, রাজ্যসুখ ত্যাগ করিতে, সকল দুঃখ ও বিপদ বরণ করিতে দ্বিধা করিল না, বঙ্কিম কি তাহাকে শুধু বাহুবলের প্রতীক করিয়া গড়িয়াছেন? বরং রাজসিংহের প্রতিপক্ষে বিপুল বাদ্‌শাহী বাহিনীর অপর্য্যাপ্ত বাহুবলের অভিযানই দেখা যায় না কি? যে শক্তি দুর্জ্জয় সাহস ও রণ-কৌশলে সে অভিযান ব্যর্থ, বিড়ম্বিত করিল সে শক্তি কি বঙ্কিমের আখ্যান অনুসারেই বাহুবলের অতীত অপরাজেয় শক্তি নয়? যে শক্তি অত্যাচারী বলবত্তর শত্রুকে পরাজিত ও অবরুদ্ধ করিয়াও অস্ত্রপ্রয়োগে বা উপবাসে না মারিয়া সন্ধি করিয়া ছাড়িয়া দিতে চায়, তাহার মহত্ব ও ঔদার্য্যের তুলনা কি সহজে মিলে? আবার, সে শক্তি কি রণাঙ্গনেই শুধু আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, গৃহাঙ্গনে নয়? জগতের কয়জন বীর বা নৃপতি স্বয়ম্বরাকে সমরক্ষেত্রে লাভ করিয়াও বলিত 'আমি তোমাকে হরণ করি নাই। তোমার জাতিকুল রক্ষার্থে তোমাকে

মুসলমানের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে তোমার পিতার নিকট প্রতিপ্রেরণ করাই রাজধর্ম্ম।' 'তাঁহার অমতে আমি বিবাহ করিতে চাহি না।' অথবা বিক্রম সোলাঙ্কী যখন বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন তখনও বলিত 'তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ ব্যতীত তোমাকে বিবাহ করিব না,' এমন কি, 'যতদিন না তোমার সঙ্গে আমার যথাশাস্ত্র বিবাহ হয়, ততদিন আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না'?[১] বাস্তবিক বঙ্কিম রাজসিংহকে বাহুবল ব্যতীত যে অপরাজেয় মনোবল ও অনন্যসাধারণ চরিত্র-বলের অধিকারী করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে নায়কের গুণে অর্থাৎ বঙ্কিমের মহতী পরিকল্পনার বা "over-informing power"[২] এর ফলে রাজসিংহ-উপন্যাস ইতিহাস অতিক্রম করিয়া মহাকাব্যের বিশিষ্ট পদবীই লাভ করিয়াছে।

এ দিক্ দিয়া দেখিলে রাজসিংহ মাত্র ঐতিহাসিক অংশের নহে, পরন্তু সমগ্র উপন্যাসেরনায়ক। তিনি শুধু ঘটনাপরম্পরার যোগসূত্র নহেন, প্রধান নিয়ামক। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এবং তাঁহারই মহানুভবতা, রণকৌশল ও উদার কার্য্যকলাপে, উপন্যাসের বাণী উদ্গীত। রবীন্দ্রনাথ যে বিধাতাপুরুষকে

---

১ ৫।৩।১০২ পৃঃ।

২ Hazlit যাহাকে 'over-informing power' বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধে 'সত্য রক্ষাপূর্ব্বক বড় করিয়া তুলিবার ক্ষমতা' বলিয়াছেন মনে হয়।

রাজসিংহের ইতিহাস অংশের নায়ক বলিয়াছেন তাহাত সত্যই বটে, তবে ইতিহাসের "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা" কবিকল্পিত যে "চিরসারথীর রথচক্রে" নিত্য মুখরিত তিনি যে সকল কুরুক্ষেত্রেই যোগ্যপাত্রকে "নিমিত্ত" নির্ব্বাচন এবং জয়শ্রীমণ্ডিত করেন ইহাও স্বীকার্য্য। আরও, "ভগবান আমাদের দিতেই পারেন কিন্তু নিতে হয় নিজের গুণে" রবীন্দ্রনাথের এই কথা স্মরণে রাখিয়াই আমরা রাজসিংহকে ইতিহাস ও কাব্য উভয় অংশেরই নায়ক না বলিয়া পারি না।

আর, উপন্যাসের নায়ক যদি হন রাজসিংহ তাহা হইলে তাহার নায়িকা হইবে সেই যে মৃত্যু বা মুক্তিপণে রাজসিংহের বীরত্ব ও মহত্ত্বকে উপত্যকা হইতে অধিত্যকা, সানু হইতে শিখরে উঠিবার প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে, যে চিতোরের রাণার স্বধর্ম্মপালন-প্রবৃত্তিকে পার্ব্বতীর আত্মদানে 'লোক-সংগ্রহার্থ' উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। গ্রন্থের মুখবন্ধে চঞ্চলকে আবির্ভূত করিয়া, তাহার বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যের প্রতি তস্‌বীরওয়ালীর প্রণতি-জ্ঞাপনে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া, সঙ্কল্পে ও সংগ্রামে তাহার বীরাঙ্গনার ভাববৈশিষ্ট্য স্ফুরিত করিয়া, রাজাবরোধেও তাহাকে সুদুর্লভা করিয়া গ্রন্থকার তাহার ভূমিকা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রাখেন নাই। রাজসিংহ উপন্যাসের সূচনায় চঞ্চলের দুঃসাহসিক কার্য্য গল্পে যে গতি সঞ্চার করিয়াছে তাহারই ক্রমবিবর্দ্ধিত বেগে সমস্ত গ্রন্থের ঘটনাধারাই ত উচ্ছ্বসিত হইয়া চলিয়াছে। এমন কি মোগলের কবল হইতে উদ্ধার

পাইলেও, রাজসিংহের অন্তঃপুরবাসিনী হইবার পরেও, রাণার সহিত তাহার মিলন অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া থাকায় এবং পরবর্ত্তী মহাযুদ্ধের ফলাফলের উপর তাহার 'ইষ্টলাভের' সম্ভাবনা অনিশ্চয়তার দোলায় দুলিতে থাকায়, পাঠককে রুদ্ধশ্বাসে গ্রন্থের পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ, খণ্ডের পর খণ্ড দ্রুত অতিক্রম করিতে হয়। কাজেই তাহাকে কাব্যাংশের নায়িকা না বলিয়াও উপায় নাই। আর সীতারামের বড় আক্ষেপ ছিল "যে অঞ্চল সঙ্কেতে সৈন্য সঞ্চালন করিয়া রণজয় করিয়াছিল যদি সেই শ্রী সহায় হয় তবে সীতারাম কি না করিতে পারেন ?" যে চঞ্চল রাজসিংহের নায়কের সেরূপ আক্ষেপের অবকাশ রাখে নাই নায়িকার গৌরব ত সেই শুভ প্রেরণাদাত্রী বীরাঙ্গনারই প্রাপ্য। অথচ কেহ কেহ বলিয়াছেন রাজসিংহের কাব্যাংশের নায়িকা জেব্-উন্নিসা।

কিন্তু রাজসিংহের ঐতিহাসিক অংশের কেন্দ্র বিধাতাপুরুষ বা রাজসিংহ, আর কাব্যাংশের কেন্দ্র জেব্-উন্নিসা, এমন ভাবে উপন্যাসখানির ঐতিহাসিক অংশ ও কাব্যাংশকে বিচ্ছিন্ন করা যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে আখ্যায়িকাটি ঐক্যহীন এবং রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে সার্থক হয় নাই। বুঝিতে হইবে একদিকে বাদ্শাহী শক্তির অন্তঃসারশূন্যতা দেখাইবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে যে জেব্-উন্নিসা-সংবাদ উপন্যাসখানিতে বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়াছে গ্রন্থবর্ণিত মূল ঘটনাধারার অর্থাৎ রাজপুত ও মোগলের শক্তি-সংঘর্ষের

আখ্যানের সহিত তাহার অন্তরঙ্গ যোগ নাই। অথবা যে অভয়ের সাধনা ও সিদ্ধি বর্ণনায় রাজসিংহ মহাকাব্যোচিত গৌরব লাভ করিয়াছে তাহার সহিত রাজসিংহের তথাকথিত কাব্যাংশ সম্বন্ধহীন। মানিতে হইবে উপন্যাসহিসাবেও নির্ম্মম নিষাদ লক্ষিত হরিণীর ন্যায় চঞ্চলের অদৃষ্ট পাঠকের তত উৎকণ্ঠা জাগ্রত করে না, সম্রাটের অবরোধের পঙ্কিল পল্বলস্থিত করিণী জেব্-উন্নিসার ভবিষ্যৎ পাঠকের যত ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে। তাহা অঙ্গীকার করিলে উপন্যাস হিসাবে রাজসিংহ প্রধানতঃ এমন একটি বিলাস-বিকৃত প্রণয়কাহিনীর আকার ধারণ করে কুণ্ঠাহীন কামনায় যাহার সূত্রপাত, খুনের না হোক দুষ্প্রাপ্যের অনুশোচনায় যাহা পূর্ণ এবং যাহার আদ্যন্ত দরিয়ার অভিশাপ সমভাবেই বহন করিতেছে। সমগ্র রাজসিংহ পাঠ করিলে পাঠকের মনে চঞ্চলের বীরানুরাগ, দুর্জ্জয় পণ ও মহিমময়ী নারীশক্তি, রাজসিংহের শৌর্য্য, সংযম ও মহানুভবতা, রাজপুত ও মোগলের মহাহবের গতিপরিণতি—সকলই গৌণ হইয়া যায়, শুধু জেব্-উন্নিসার বিলাস বাসনাময় জীবনের বিবর্ত্তন এবং অপ্রত্যাশিত রূপান্তরই উপভোগের মুখ্যবিষয় (piece-de resistance) হইয়া দাঁড়ায় এমন কথার যাথার্থ্য প্রতি-পাঠকের মনোনিকষে পরীক্ষার যোগ্য।

অবশ্য উপন্যাসখানিতে জেব্-উন্নিসা চরিত্রের যে গুরুত্ব বা গৌরব নাই ইহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। উপন্যাসে অঙ্কিত জেব্-উন্নিসা চরিত্রের কোন ন্যায্য মূল্যই আমরা

অস্বীকার করি না। প্লট বা পরিকল্পনার দিক্ দিয়া তাহার যথেষ্ট মূল্যই আছে। জেব্-উন্নিসা না হইলে রূপনগরের রাজকন্যার হঠকারিতার সংবাদ সম্রাটের নিকট পুষ্পিত হইয়া পৌঁছিত না। সম্রাটের প্রাসাদারূঢ় ধর্ম্মধ্বজার ছায়াতলে অন্তঃপুরের প্রমোদহ্রদে মকরকেতনের নিশান উড়াইয়া যে গোপন ব্যভিচার ও বিলাসব্যসন তাঁহার ব্যক্তিগত সংযম ও মিতাচারকে উপহসিত এবং মোগলরাজশক্তিকে হীনবীর্য্য করিয়াছে এবং Tavernier, Manucci[1] প্রভৃতি যাহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন, জেব্উন্নিসা তাহাকে নাম এবং রূপ দিয়াছে। হিন্দুস্থানের পূর্ব্বতন উর্দ্দু কাহিনীলেখকগণও একদিন যে নামরূপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, বঙ্কিমও সেই নামরূপই অবলম্বন করিয়াছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে যদি ইহাই মাত্র প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, যে নামটি জেব্-উন্নিসা না হইয়া ফক্র-উন্নিসা হইলে ইতিহাসের দিক্ দিয়া প্রতিবাদ করিবার আর কিছু থাকে না, তাহা হইলে আজিকার পাঠক না হয় রাজসিংহে একটি স্বল্পাক্ষর শুদ্ধিপত্র সংযুক্ত করিয়া লইবে[2], তবু আসল বর্ণনীয় বিষয়ে বঙ্কিমের ভুল হইয়াছে মানিবে না।

(জেব্-উন্নিসা চরিত্রের কাব্যগত মূল্য আরও অধিক। এতবড় একটি মদোদ্ধতা বিলাসিনী,—যে তাহার আভিজাত্য-গর্ব্বের

১ Manucci: Storia-do-Mogor (Irvine's translation), Vol. II, Pp. 189-90, 335-342.

২ এই শুদ্ধিপত্রও অনাবশ্যক; রাজসিংহের ২৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

প্রাচুর্য্যে প্রেমকে শুধু অনুগ্রহ-বিতরণের বস্তু বলিয়াই মনে করে এবং কামনার সিরাজী ও ক্রোধের বিষ তুল্য নির্ম্মমতায় বিলাইতে পারে,—কেমন করিয়া সে যে বিরহের অশ্রুভারে একদিন বুঝিল জ্ঞাতসারে প্রেমকে উপেক্ষা করিতে গিয়া অজ্ঞাতে আপনাকে বিকাইয়াছে, মোবারক শুধু হেলায় পরিত্যজ্য নর্ম্মসখা নহে, পরন্তু তাহার অন্তরের অধিপতি, জীবনের স্বামী, যাহার অভাবে জগৎ হইল শূন্য, জীবন দুর্ব্বহ, বিভব তুচ্ছ, বিলাস বিষময়—কেমন করিয়া সে যে তাহার প্রেমক্ষত অন্তরের সন্ধান পাইয়া অকস্মাৎ কুসুমাস্তৃত পালঙ্ক ত্যাগ করিয়া ধূলিশয্যা গ্রহণ করিল, এবং সুখের দিনে কোনদিন যাহা অনুভব করে নাই

"দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নাম্‌ল"

তখনই তাহা উপলব্ধি করিয়া উপচিত প্রেমে অবশেষে অশ্রুময় ক্ষমা ভিক্ষাই করিল, তাহার বিস্ময়কর চিত্রে গ্রন্থের যে ঐশ্বর্য্য বাড়িয়াছে তাহা সত্যই সমাদরের যোগ্য। বিলাসের বিনিময়ে এরূপ বিরহ-বরণ, দর্পের বিলয়ে এমন দীনতার উন্মেষ, আত্ম-সুখান্বেষণ ভুলিয়া আত্মনিবেদনের আকৃতি, যেমন মাধুর্য্য-ঘন তেমনই অভিনব। অথচ জেব্‌-উন্নিসা চরিত্রের পত্তনে বঙ্কিম যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে উহার পরিণতি যত অভাবনীয় হোক না কেন, উহাতে কোন অস্বাভাবিকতা বা আকস্মিকতা আসিয়া যায় নাই। জেব্‌-উন্নিসার প্রণয়লীলার সুরুতে তাহার স্পর্দ্ধিত স্বৈরাচার যত বড় হইয়া ফুটিয়া উঠুক, তাহার মধ্যেও আমরা দেখিতে

পাই মোবারক তাহার অনেকখানি চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, অবকাশে জেব্-উন্নিসা তাহার মূর্ত্তি গড়ে, অদর্শনে অত্যন্ত কাতর হয়, এবং দরিয়া তাহাকে বিবাহিত স্বামী বলিয়া দাবী করিলে সে ফুলের তোড়া ছুড়িয়া তাহার কানও ছিঁড়িয়া দেয়, এমনকি সে-বিবাহের মোল্লাকে পর্য্যন্ত শূলে দিতে চায়।[১] তবে যে মোবারকের বিবাহ-প্রস্তাবে সে বিরক্ত হয়, তাহা বন্ধনে অপ্রীতির জন্য। বিবাহ না করিয়া কামনা চরিতার্থের বাধা তাহার পক্ষে কিছুই থাকিতে পারে না, কারণ পাপপুণ্যের বিধান, তাহার ধারণায়, 'আল্লা ছোট লোকের জন্য', 'কাফেরের জন্য' 'করিয়াছেন'। 'আল্লা যদি আমার জন্য সেই বিধি করিতেন তবে আমাকে কখনও বাদ্শাহজাদী করিতেন না।' আর, দুইশতী মনসবদারকে বিবাহ করিয়া সে বাদ্শাহজাদীর অপমান করিবেই বা কেমন করিয়া? কিন্তু তাহারই প্ররোচিত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত মোবারকের অপমৃত্যুর প্রবল আঘাতে মানুষটার প্রণয়ক্ষত অন্তর যে দিন মর্ম্মভেদী বেদনায় শিহরিয়া উঠিল সে দিন বাদ্শাহজাদীর নির্ম্মোক একেবারেই খসিয়া পড়িল—সে দিন সত্যই খুন করিয়া নিজেই ফাঁসী গেল। ফলে, তাহার মধ্যে শুধু সে কালের রতিবিলাপের কাতরোক্তি

'ত্বমনঙ্গঃ কথমক্ষতারতিঃ'[২]

যে ফুটিয়া উঠিতে দেখি তাহা নহে, পরন্তু দেখিতে পাই

---

১ ২।৪।৩১ পৃঃ। Shakespeare : 'Anthony and Cleopatra', Act II, Sc. V, তুলনীয়।

২ কালিদাস: 'কুমারসম্ভবম্' ৪স।৯ শ্লোক।

একালের কবিকল্পনায়

'ব্যাকুলতর বেদনারাশি বাতাসে উঠে নিঃশ্বাসি
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে'[১]

রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। আর, বঙ্কিম অপূর্ব্ব কৌশলে যেন এক অবজ্ঞাত সহমরণের[২] চিতাভস্মে গ্রন্থের বাতাস পরিণামের দিকে মন্থর করিয়া তুলিয়া নবজাত জেব্-উন্নিসার প্রতি বিস্মিত পাঠকের অনুকম্পা ও সহানুভূতি আদায় করিয়া লয়েন।

তাহা হইলেও উপন্যাসের ক্রোড়স্থিত জেব্-উন্নিসার খণ্ড-কাব্য যে রাজসিংহ উপন্যাসের সমগ্র পরিকল্পনা অভিভূত করিয়াছে, পরভৃতের ন্যায় তাহা যে আশ্রয়-বৃক্ষকে উনমূল্য করিয়া তুলিয়াছে ইহা গ্রন্থের বর্ণনাসম্মত মন্তব্য নহে। যে "ঊর্দ্ধ-প্রবাহিনী ভাবধারা" চঞ্চলকুমারীতে রাজসিংহের শক্তি-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহারই আনন্দ ঝঙ্কার পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে জেব্-উন্নিসার গর্ব্বিত প্রলাপ ও অশ্রুকাতর বাণী। আর, জেব্-উন্নিসার দৃপ্ত-ব্যভিচার-বিলয়োত্তর প্রেমদৈন্যের মাধুর্য্য যতই কেন কবিকল্পিত ভস্মীভূত কামনাকে রসরূপ দিয়া থাকুক তাহা চঞ্চলের সৌন্দর্য্যবলয়িত শক্তি, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শৌর্য্য-মুগ্ধ আত্মসংযত অনুরাগ, এবং তাহার আত্মনিবেদনের প্রেরণার ব্যাপক সার্থকতা প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। পার্ব্বতীর

১ রবীন্দ্রনাথ: 'মদনভস্মের পরে' (কল্পনা)।

২ "আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে না রাজপুতের মেয়ে যে একস্বামী করিয়া চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষে আগুনে পুড়িয়া মরিব?" ২।৩।২৬—২৭ পৃঃ।

তপস্যা রতিবিলাপে চাপা পড়ে নাই, এবং চাপা পড়ে নাই বলিয়া রাজসিংহের মহাকাব্যশ্রী অক্ষুণ্ণ রহিয়াই গিয়াছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতে গিয়া বঙ্কিমের প্রবল কল্পনা-শক্তিকে অনেক নিগড় অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু রাজপুতপক্ষে যে দুইটি চরিত্র সৃজনে তাঁহার কবিকল্পনা ইতিহাসের কোন পিছুটান অনুভব না করিয়া স্বচ্ছন্দ গতিলাভ করিয়াছে তাহা হইতেছে নির্ম্মল ও মাণিকলাল।

নির্ম্মল বঙ্কিমসাহিত্যের আদর্শ সখী, নায়িকার সমপ্রাণ, তাহার সমানধর্ম্মী ও তাহার কর্ম্মে আত্মোৎসৃষ্ট। বিমলা বিমাতা হইয়াও সখী বটে, কিন্তু তিলোত্তমার প্রতি বীরেন্দ্রের স্নেহের অংশভাগিনী বলিয়া স্নেহাধিক্যে সে তাহার দোসর। তিলোত্তমা ও বিমলার বয়স শুধু বিভিন্ন নহে, প্রকৃতিও বিসদৃশ। গিরিজায়া দরদী ও দূতী উভয়ই বটে কিন্তু মৃণালিনীর সহচারিণী হইলেও সমানধর্ম্মী নহে। গিরিজায়া ভিখারিণী, মৃণালিনী ধনী শ্রেষ্ঠীর কন্যা। সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে তাহারা উদ্ভূত। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণায় উভয়ের মধ্যে কত যে পার্থক্য তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু সখী পর্য্যায়ে নির্ম্মলের বৈশিষ্ট্য হইতেছে সে নায়িকার ছায়া বা প্রতিচ্ছবি। চঞ্চলের মত নির্ম্মলের সহিত আমাদের পরিচয় এক প্রকার গ্রন্থারম্ভ হইতে—বুড়ী তস্‌বীরওয়ালীর পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে আশ্‌রফি দিয়া অনুরোধ করিতেছে সে যেন চঞ্চলকর্ত্তৃক বাদ্‌শাহের চিত্রদলনের কথা

কোথাও প্রকাশ না করে—চঞ্চলকে বিপন্মুক্ত রাখিতে এমনই তাহার আগ্রহ। তাহার পরে বাদ্‌শাহী পরোয়ানা যখন আসিল তখন ( তৃতীয় খণ্ডের আরম্ভে ) দেখি নির্ম্মল কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া যাইতেছে—চঞ্চল বলিয়াছে দিল্লীর পথে রাজসিংহ তাহাকে উদ্ধার না করিলে সে বিষ খাইবে। চঞ্চল যে পত্র লিখিয়া রাণার শরণ লইল তাহা শুধু নির্ম্মলের পরামর্শে লিখিত হয় নাই, তাহার আত্মনিবেদনের পুনশ্চটুকু, চঞ্চল লিখিতে লজ্জিত হইলেও, নির্ম্মলের লেখা—এমনই তাহারা অন্তরঙ্গ। কাঁদিয়া ও কাঁদাইয়া চঞ্চল মোগল সৈন্যসহ দিল্লী যাত্রা করিল, নির্ম্মল বলিয়া দিল "তুমি যেখানে থাক, আমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে। আমাকে না দেখিলে তোমার মরা হইবে না, তোমাকে না দেখিলে আমার মরা হইবে না।" চঞ্চল চলিয়া গেল, নিরাকুল নির্ম্মল 'অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপ' দিয়া তাহার অনুবর্ত্তিনী হইল। রাণার যে ভক্ত অনুচর চঞ্চলের সহিত তাহার যোগসূত্র পুনরায় স্থাপন করিয়া দিল সে হইল তাহার স্বামী। জ্যোতিষী বলিল সসাগরা ধরণীর অধিশ্বরী যদি কখনও আসিয়া চঞ্চলের তামাকু সাজে তবেই রাণার সহিত তাহার বিবাহ হইবে। কাজেই তাহার স্বামী যখন রাণার দূত হইয়া সম্রাটের নিকট চলিল, তখন নির্ম্মলই বা সম্রাটপত্নীর নিকট চঞ্চলের তামাকু সাজার আহ্বান পত্র লইয়া না যাইবে কেন? মাণিকলাল যত চতুরই হোক না কেন, নির্ম্মলের ধারণায়, যখন তাহার অপেক্ষা অল্পবুদ্ধি এবং

তাহারই চালিত, তখন মাণিকলাল দিল্লী হইতে মাথা বাঁচাইয়া আসিতে পারিলে সেই বা বাদ্‌শাহের অন্তঃপুরে ultimatum দিয়া আসিতে পারিবে না কেন? অদৃষ্টক্রমে কৌশল ব্যর্থ হইয়া যখন সম্রাটের অন্তঃপুরে আবদ্ধ হইল তখনই তাহার স্বরূপ শতদলে বিকশিত হইয়া উঠিতে দেখি। সে আর শুধু চঞ্চলের সখী নহে—সে অভয়া, আত্মস্থা, তীক্ষ্ণধী, শার্দ্দূলসম্মোহিনী বীরাঙ্গনা।

আর মাণিকলাল? সে ত ছিল দস্যু, রাণার ক্ষমা লাভ করিয়া হইল প্রভুভক্ত বীর। প্রভুভক্তির অগ্রিম নিদর্শন দিল স্বেচ্ছায় অঙ্গুলিচ্ছেদন করিয়া, আর অঙ্গুলীর ক্ষত উপেক্ষা করিয়া রাণার অনুসরণে। যেমন বীরত্বে দুঃসাহসিক, তেমনই ভক্তিতে দৃঢ় ও কর্ম্মে চতুর। চঞ্চলের পত্র ঘটনাক্রমে সেই দিয়াছিল রাণাকে, আবার সচঞ্চল রাণাকে প্রথম রন্ধ্রযুদ্ধে তাহারই কৌশলে করিল জয়ী। তীক্ষ্ণদৃষ্টি মাণিকলালের মাণিক চিনিতে বিলম্ব হয় না, অতএব তাহার নবজীবনের যাত্রাপথে সে নির্ম্মলকে পথ হইতে কুড়াইয়া তাহার জীবন-সঙ্গিনী করিয়া লইল। ইতিহাস রাণার পক্ষে যে বিপজ্জনক গুরুদৌত্যের ভার দিয়াছিল তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জয়সিংহকে, বঙ্কিম সর্ব্বভারবহনক্ষম মাণিকলাল সৃষ্টি করিয়া সে ভার তাহাকেই দিয়াছেন। আর, যে মাণিকলাল বাদ্‌শাহের অন্যায় দাবীর প্রত্যাখ্যানপত্র মুক্ততরবারীসহ সম্রাটসমীপে পৌঁছিয়া দিয়া মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিল, নির্ম্মলের কাছে

বাদ্‌শাহের কাতর প্রার্থনায় সেই মাণিকলালই সর্ব্বাগ্রে সাড়া দিল। মাণিকলালের সন্ধি-প্রস্তাবের মধ্যে বঙ্কিম দস্যু মাণিকলালের চরম পরিণতি যে ভাবে দেখাইয়াছেন তাহা অত্যন্ত উপভোগ্য।

"মহারাণার সাক্ষাৎ পাইয়া, প্রণাম করিয়া, মাণিকলাল যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, 'যদি এ দাসকে অন্য কোন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান মহারাজের অভিপ্রেত হয় তবে বড় অনুগৃহীত হইব।'

রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, এখানে কি হইয়াছে'?

মাণিকলাল উত্তর করিল, 'এখানে ত কোন কাজ নাই। কাজের মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত মোগলদিগের শুষ্কমুখ দেখা ও আর্ত্তনাদ শুনা। * * * আমি ভাবিতেছি কি যে এতগুলা মানুষ, হাতী, ঘোড়া, উট্ এই রন্ধ্রে পচিয়া মরিয়া থাকিবে—দুর্গন্ধে উদয়পুরেও কেহ বাঁচিবে না, বড় মড়ক উপস্থিত হইবে।'

রাণা বলিলেন, 'অতএব তোমার, বিবেচনা এই, মোগল সেনাকে অনাহারে মারিয়া ফেলা অকর্ত্তব্য।'

মাণিক। বোধ হয়। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ জনকে মারিলেও দেখিয়া দুঃখ হয় না। বসিয়া বসিয়া অনাহারে একজন লোকও মরিলে দুঃখ হয়।

রাণা। তবে উহাদের সম্বন্ধে কি করা যায়?

মাণিক। মহারাজ! * * * * আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সন্ধি-স্থাপনের এই উত্তম সময়। * *

রাজসিংহ এই প্রস্তাবে সম্মত ও স্বীকৃত হইলেন। উপবাসে এত মানুষ মারাও তাঁহার ইচ্ছা নহে। হিন্দু, অন্নযোগান পরম ধর্ম্ম

বলিয়া জানে। অতএব হিন্দু, শত্রুকেও সহজে উপবাসে মারিতে চাহে না"*।

অতএব গ্রন্থমধ্যে দস্যু মাণিকলাল শুধু প্রভুভক্ত বীর মাণিক-লালে উত্তীর্ণ হয় নাই, গ্রন্থশেষে বিজিত শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ-হীন মাণিকলালে পরিণত হইয়াছে। অনাহারে একজন লোক মরিলেও তাহার দুঃখ হয়, শত্রুর অনশনক্লেশ দেখিতেও অনিচ্ছুক। ইহা যদি কেবল নির্ম্মলের কথার প্রতি-ধ্বনি না হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যাঁহার প্রভাবে কাঁচ মাণিকলাল হীরায় পরিণত হইয়াছে মাণিকলাল তাঁহারই যোগ্য অনুচর বটে। "যস্য দেবস্য যদ্রূপং তথা ভূষণ-বাহনং।"

অনৈতিহাসিক চরিত্রাবলীর মধ্যে মোগলপক্ষের যে দুইটি চরিত্র বাদ্‌শাহী রথচক্রে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল সে দুইটি চরিত্র সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। মোবারক গানে মুগ্ধ হইয়া দরিয়াকে বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু গানের চেয়ে ঢের বেশী টানে সে বাদ্‌শাহজাদীর প্রতি আকৃষ্ট—তাহার 'রূপরাশিতে বিক্রীত'। তাহার উপরে সম্রাটকন্যা তাহাকে যে সুখে সুখী করিতে, যে সফলতায় তাহার জীবন পৌঁছিয়া দিতে পারিবে দুঃখিনী দরিয়া তাহাতে কেমন করিয়া সক্ষম হইবে? সম্রাট-দুহিতার অনুগ্রহে তাহার আশা অপরিমিত, বামন হইয়া তাহার চাঁদে লোভ। সে জেব্‌-উন্নিসার পাণিপ্রার্থী। কাজেই অভাগিনী

* ৮।৮।১৭১-১৭২ পৃঃ

দরিয়ার পক্ষে তাহার লাগাল পাওয়া ভার হইয়া উঠিল। তবু সে মোবারকের অনুসরণ করে, মোবারক যত দূরেই যা'ক। সেনাদলের মধ্যে তাহার নিকটে থাকিতে পারিবে বলিয়া সে সৈনিকের পোষাকও সংগ্রহ করিয়া পরে, ছায়ার মত পিছনে থাকিয়া চলে। চঞ্চলকুমারীকে লইয়া দিল্লী যাত্রার পথে রন্ধ্রযুদ্ধে পলায়নপর মোগলসেনার মধ্যে মোবারক কূপে পড়িয়া গেল, দরিয়া একা অশেষ কষ্টে, উদ্গত-অশ্রুভারে, তাহাকে তুলিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিল। নারীহত্যার আশঙ্কায় চঞ্চলকে ছাড়িয়া, সম্রাটের ক্রোধের সমস্ত সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া 'রণপণ্ডিত' ও সহৃদয় মোবারক দিল্লী ফিরিল—ফিরিল দরিয়ার সহিত মিলিত হইয়া এবং আর কখনও তাহাকে ত্যাগ করিবে না প্রতিশ্রুতি দিয়া। প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা বীরের মতই রক্ষা করিল। "গুণাহ্‌গারী" আর সে করিতে প্রস্তুত নহে। সর্পাঘাতে মৃত্যুদণ্ড? তাহাও ভাল। জেব্‌-উন্নিসার ইচ্ছা বুঝিয়া, জগদীশ্বরের দয়া প্রার্থনা করিয়া, তাহাও অঙ্গীকার করিল। তাহার পরে দরিয়া উন্মাদিনী, আর দুঃখীর প্রেমে জেব্‌-উন্নিসা শোকাতুরা।

রাজসিংহ-রচনায় সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল গ্রন্থি হইতেছে মোবারকের নবজীবন-লাভ। ইহা যেমন অতিপ্রাকৃত ঘটনা তেমনই নিরর্থক। মোবারকের চরিত্রের দুর্ব্বলতা যে প্রেম-নিষ্ঠার অভাব—যাহা বঙ্কিম তাঁহার কাব্য-সৃষ্টিতে কোনদিন সহজে মার্জ্জনা করেন নাই—তাহা ফুটাইয়া তোলা ব্যতীত,

মোবারকের নবজীবনের কার্য্যাবলীর অপর কোন সার্থকতা দেখা যায় না। সে বীর, সে উদারহৃদয়, ধর্ম্মবোধসম্পন্ন যদিও নৈতিক দৃঢ়তাহীন। ফল মোটের উপর সে ভাবপ্রধান চরিত্র। যে দিন সে তাহার প্রাণ রক্ষা করার জন্য দরিয়াকে আর কখনও ত্যাগ করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, সে দিন বাদ্‌শাহজাদী প্রকৃতই ভালবাসে না বুঝিয়া সে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু পাষাণের বুকে যে দিন অশ্রুঝর্ণা বহিতে দেখিল, সে দিন সে আর অভিভূত না হইয়া পারিল না। সহজে ভুলিয়া গেল, সম্রাট-দুহিতার নির্ম্মমতা, এমন কি সর্পাঘাতে মৃত্যুর যন্ত্রণা। আবার উন্মাদিনী দরিয়াকে যেদিন তাঁবুর মধ্যে লুকাইতে, লুটাইতে, দেখিল সেদিন তাহার মনে হইল দরিয়ার দেওয়া জীবন সে জেব্-উন্নিসার নিকট বাঁধা রাখিবে কেমন করিয়া? অতএব মৃত্যুই ত শ্রেয়ঃ। সে মৃত্যু-সঙ্কল্প উন্মাদিনী দরিয়ার দ্বারা পূর্ণ করাইয়া, গ্রন্থকার তাহাকে মৃত্যুদণ্ডের আকার দিয়াছেন একথাও যেমন অস্বীকার করিবার নহে, তেমনই দরিয়াকে উন্মাদিনী করিয়া, তাহার চরিত্রের মাধুর্য্য-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন ইহাও ঠিক। আর সম্রাটপুত্রীর প্রায়শ্চিত্তের অনুকল্পব্যবস্থা করিবেন না বলিয়াই জেব্-উন্নিসার বিবাহে বাদ্‌শাহজাদীকে ভস্মীভূত করিয়াও অচিরে মোবা-রকের বিয়োগবিধুর জেব্-উন্নিসাকে বসুধালিঙ্গনধূসরা রূপেই রাখিয়া গিয়াছেন।

দরিয়ার ব্যথা ফুটাইয়া, এবং সম্রাটকন্যাকে ধূলায় লুটাইয়া

যিনি মোবারকের উপাখ্যান শেষ করিয়াছেন, যাঁহার মতে "খোদা বাদশাহজাদীকে ও চাষার মেয়েকে এক ছাঁচে ঢালিয়াছেন", তাঁহার লেখা নাকি অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিতে ভরপুর!

ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে হিন্দুর বাহুবলের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া বঙ্কিম রাজপুত ও মোগলের ইতিহাস-বিশ্রুত দ্বন্দ্বের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে উপন্যাসের প্রতিনায়ক হইয়াছেন দিল্লীর সম্রাট ঔরঙ্গজেব। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে ঔরঙ্গজেব হয়ত "Crowned Saint of Islam" বা "St Augustine on the throne" বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার যোগ্য, কিন্তু তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা,—তাঁহার পরধর্ম্মবিদ্বেষ, তাঁহার স্বধর্ম্মীর কল্যাণ-চেষ্টা—ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার, তাঁহার আপন মিতাচার—তাঁহার রঙমহলের বিলাস-ব্যভিচার, তাঁহার শক্তিমত্ত্বা—তাঁহার নিষ্ঠুরতা, বা বুদ্ধিমত্ত্বা—তাঁহার শঠতা ও ক্রূরতা, ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। মেবার অভিযানে তাঁহার অপকার্য্য—যাহা মানুসীর লেখায় ও মা'সির-ই আলমগীরীতেও তুল্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে—বঙ্কিম ইচ্ছা করিলে প্রসঙ্গক্রমে গাঢ় মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়া পাঠককে উপহার দিতে পারিতেন। কিন্তু সেরূপ কিছু করা দূরের কথা, প্রতিনায়ক হিসাবে আঁকিতে গিয়াও বঙ্কিম যে ঔরঙ্গজেবের চিত্র অযথা মসীলিপ্ত করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ

অথচ পক্ষপাতশূন্য তাঁহারা নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক উপাদানের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়াও তাহা বলেন না*। বরং বঙ্কিম যেখানে কল্পনার সাহায্য লইতে পারিয়াছেন সেখানে ঔরঙ্গজেবকে স্নেহার্দ্র করিয়া আঁকিয়াছেন, "মনুষ্য কখন পাষাণ হয় না" এমনও বলিয়াছেন। আর, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রদায়গত কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করাও যে গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে, উপসংহারে তাহাও স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছেন—

"গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে হিন্দু-মুসলমানে কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক দিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে সকল মুসলমান রাজা সকল হিন্দু রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।" "অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্ম্মিক এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত ও পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।"[১]

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-প্রকাশিত বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণে স্যার যদুনাথ সরকার লিখিত রাজসিংহের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১ ঐ 'রাজসিংহ' ১৯১ পৃঃ।

বঙ্কিম 'ধর্ম্ম' শব্দ এখানে 'মনুষ্যত্ব' বা মনুষ্যত্বের অঙ্গ 'সর্ব্বভূতে প্রীতি' অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে[১]। উদ্ধৃত উক্তি বিস্মৃত হইয়া, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবশে, কেহ বঙ্কিমের প্রতি অযথা দোষারোপ করিতে পারেন, কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় না লইলে বঙ্কিমসাহিত্য-সেবীর ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে—

"The charge against Bankimchandra, i.e. spite for Mussalmans, may be set aside almost summarily on the ground that some really fine Muslim characters e.g. Mir Quasem, Dalani Begum, Chandshah Fakir and Osman, came into being through his pen, and that, in his 'Peasants of Bengal' and 'Socialism' he espoused the cause of the have-nots irrespective of race or community or creed."

তবে —

"There was *hauteur* of a sort ingrained in Bankimchandra—*hauteur* born of a sense of strength perhaps—which naturally enough hurled defiance at the *hauteur* of the foreigner, be he the medieval Muslim or the modern Englishman." "This seems to be the truth about his so-called spite."[২]

---

১ "ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন"। "সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই"। ('ধর্ম্মতত্ত্ব' ২৮ অ। ১৫০ পৃঃ)। আর, মৃত্যুশয্যায় শায়িত ঔরঙ্গজীব নিজের পত্রেই আপনাকে 'Sinner full of sins' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (V. Smith : 'Oxford History of India,' P. 448)।

২, K. A. Wadud : "Creative Bengal". Pp. 90-91.

পরিশেষে আমরা তরুণ রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত “ঐতিহাসিক সত্য” স্মরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের আলোচনার সমাপ্তিতে পৌঁছিতে চাই —

“তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাব-মন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ-কথা কোনো বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য”[১]।

এই ভাবমন্দাকিনী অবতারণ করা, এই পুণ্যস্রোত প্রবাহিত করা, এবং জাতির জড়ত্বশাপ মোচন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল কারণ তিনি ছিলেন দেশমাতৃকার এক-নিষ্ঠ সন্তান এবং তাঁহার ছিল সর্ব্বাত্মিকা দেশপ্রীতি। তিনি শুধু ভৌগলিক দেশ, তাহার জলস্থল, আকাশ-বাতাস, ভালবাসিতেন না—ভালবাসিতেন দেশের নরনারী ও নর-নারায়ণ, দেশীয় পরিবার ও সমাজ, জাতীয় ভাষা ও ভাবধারা, ইতিহাস এবং ঐতিহ্য এবং সর্ব্বোপরি দেশীয় নীতি ও আদর্শ। তিনি পরানুকরণ হেয় এবং “নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটী বাঙ্গালী” তথা ভারতবাসী “ভাল” মনে করিতেন বলিয়া জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে এবং জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া জাতীয় মুক্তির মন্ত্রদান করিতে পারিয়াছিলেন।

১ রবীন্দ্রনাথ ঃ ‘বঙ্কিমচন্দ্র’।

রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত বাণী আমরা "স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাঙ্গলা লেখকদিগের গুরু, বাঙ্গলা পাঠকদিগের সুহৃৎ এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্ব্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া" "গত শতাব্দীর বর্ষশেষে পশ্চিম দিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত"[১] হইয়াছিলেন।

১ রবীন্দ্রনাথ ঃ 'বঙ্কিমচন্দ্র'।